পৌরাণিকী

[বেহুলা, জড়ভরত, সতী, ফুল্লরা, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ]

দীনেশচন্দ্র সেন

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ
আগষ্ট ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
॥ জিজ্ঞাসা ॥
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা—২৯
জিজ্ঞাসা প্রকাশন বিভাগ : ১এ, কলেজ রো। কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর : মনীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ বিধান সরণী। কলিকাতা—৬

"তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে"

কালিদাসের এই উক্তি স্মরণ করিয়া—তরুণ বয়সে সর্ব্ববিষয়ে

প্রবীণতাপ্রাপ্ত—বর্ত্তমান বঙ্গীয় উচ্চ শিক্ষার

কাণ্ডারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কর-কমলে 'পৌরাণিকী'

উৎসর্গ করিলাম।

৬ই আগষ্ট

বেহালা

১৯৩৪

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বর্তমান সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-এর জন্ম-শতবর্ষপূর্তি-উৎসব সমাগত প্রায়। ইতিমধ্যে পৌরাণিকী বর্তমান সংস্করণ অনুরাগী পাঠকবৃন্দের আন্তরিক উৎসাহে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সন্নিবেশিত বেহুলা, জড়ভরত, ফুল্লরা, সতী, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ প্রভৃতি গ্রন্থও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণের প্রকাশন-ব্যবস্থায় যাঁহার উৎসাহ আমাকে সকল দিক হইতে প্রেরণা দিয়াছিল, সেই পিতৃপ্রতিম ৺রামেশ্বর দে-র কথা আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

পৌরাণিকী

বেহুলা	...	১
জড়ভরত	...	৮৩
সতী	...	১৪৭
ফুল্লরা	...	২০৩
ধরা-দ্রোণ ও কুশধ্বজ	...	২৬৫

বেহুলা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মনসার ভাসান-গান এক সময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণের এত প্রিয় ছিল যে, এতদ্দেশের প্রত্যেক জেলার লোকেরা ভাসান-গানের নায়ক চন্দ্রধরের নিবাসভূমি স্বীয় জন্মস্থানের অদূরবর্ত্তী কল্পনা করিয়া সুখানুভব করিত। বর্দ্ধমানের ষোল ক্রোশ পশ্চিমে একটি চম্পকনগর আছে এবং তন্নিকটে বেহুলা নদীও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মীন্দরের বাসর-গৃহের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে ত্রিপুরা জেলাতেও আর-একটি চম্পকনগর আছে। 'আসাম-ভ্রমণ'-প্রণেতা লিখিয়াছেন, ধুবড়ী অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থানেই চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল। বগুড়ার নিকট মহাস্থান বলিয়া একটা স্থান আছে ; অনেকে বলেন, চাঁদ-সদাগর তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে রণিৎ নদীর তীরে চাঁদ-সদাগরের নিবাস-ভূমি ছিল বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এদিকে দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্ত-নগরের নিকটবর্ত্তী সনকাগ্রামে চাঁদ-সদাগরের বাড়ীর ভগ্নস্তূপ এখনও বিদ্যমান বলিয়া অনেকের ধারণা। মালদহের চাঁপাইনগর ও নেতাধোপানীর ঘাট, বীরভূমে বিপুলার মেলা, চট্টগ্রামের 'চাঁদ-সদাগরের দীঘি' ও 'কালুকামারের ভিটা'র উল্লেখ আমরা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী -প্রণীত 'চন্দ্রধর' কাব্যের ভূমিকায় প্রাপ্ত হইয়াছি। শুধু বঙ্গদেশ নহে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও চাঁদ-সদাগর-সংক্রান্ত কাহিনী বহুস্থলে প্রচলিত আছে।

যে ঘটনাকে বঙ্গদেশ ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহের প্রত্যেক বিভাগের লোক আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে এরূপ উৎসুক, তাহার প্রভাব এতদ্দেশের লোকের হৃদয়ে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা

কঠিন নহে। বস্তুত, মনসার ভাসান-গান এ দেশের বহু সাধনার সামগ্রী ছিল। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, বহুলোক সেই সময়ে 'দম্ভ করিয়া' বিষহরীর পূজা দিত। বৃন্দাবন-দাসের সমসাময়িক কবি বিজয়গুপ্ত একখানি মনসার ভাসান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, কাণা হরিদত্তই মনসার গানের আদিকবি। বিজয়গুপ্ত আরও লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়েই উক্ত আদিকবির গান কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং কাণা হরিদত্ত বিজয়গুপ্তের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়। কাণা হরিদত্ত তাহা হইলে প্রায় ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে গান রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্প্রতি কাণা হরিদত্তের গানের কতকাংশ মৈমনসিংহ হইতে পাওয়া গিয়াছে।

এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ 'মনসা-মঙ্গল' বাঙ্গালার গৃহে গৃহে গীত হইয়া আসিয়াছে। ভাসান-গানে লোকবৃন্দ যে কিরূপ উৎসাহিত হয়, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনুমান করা কঠিন ব্যাপার। বরিশাল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রাবণ মাসে নরনারী এই গান শুনিয়া তন্ময় হইযা যায়—তাহাদের সেই উন্মত্ত আবেগ দর্শনে স্বতঃই মনে একটা আশ্চর্য্যের ভাব উদয় হয় যে, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এই যে একটা মহা-ভাবের আবর্ত্ত চলিয়া যায়—তাহার একটা লহরী পর্য্যন্ত আসিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে না। স্বদেশের এরূপ পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে যাঁহাদের কোনও সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কি প্রকারে এবং তাঁহারাই বা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় দিবেন কি ভরসায়?

ভূমিকা

যদি কোন বিষয় অগ্রাহ্যও করিতে হয়, তবে ধীরভাবে তাহার সকল দিক্ বিচার করিয়া দেখা উচিত। যাহা শত শত বৎসর এ দেশবাসীকে আনন্দ দিয়া অসিয়াছে, সেই উৎসব হঠাৎ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল কেন? পল্লীর মুসলমান কৃষকগণ পর্য্যন্ত মনসার ভাসান-গানের সমস্ত আখ্যায়িকা পরিজ্ঞাত, অথচ আমরা অনেকে তৎসম্বন্ধে কিছুই জানি না; ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান উপাখ্যানে আমি সেই প্রাচীন কথা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। একটা দ্রব্যের রস স্বয়ং আস্বাদন করা এক কথা এবং অপরকে তুল্যরূপ রস-ভাগ প্রদান করিতে পারা, আর-এক কথা। আমি প্রাচীন পুঁথিতে বেহুলার কাহিনী পড়িয়া সেই স্বামি-বিরহ-বিধুরা আশ্চর্য্য-সাধনা-তৎপরা, একান্তবিপন্না অথচ নির্ভীকহৃদয়া সাধ্বীর উদ্দেশে নির্জ্জনে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বাল্মীকির অঙ্কিত সীতা-চরিত্রের ন্যায় বেহুলার চিত্রও আমার ভক্তির অর্ঘ্যদ্বারা মানসপটে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু সেই প্রাচীন কবিগণের সরল উদ্দীপনা ও করুণরস উদ্রেক করিবার অসামান্য শক্তির কণিকাও আমার নাই, সুতরাং আমার তুলিতে সমস্ত উপহাস্যরূপে পরিণত না হইয়া থাকিলেই যথেষ্ট।

মনসার ভাসানে অনেক কথা আছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার সকল বিষয় অবতারিত হয় নাই। চাঁদ-সদাগরের বাণিজ্যসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অনেক পদ্মাপুরাণেই আছে। বেহুলার চিত্র চিত্রণে সেই সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করিলে বর্ণনীয় কাহিনী অযথা ভারাক্রান্ত হইত। এইভাবে শঙ্কুর গারুড়ীর মৃত্যু, গুয়াবাড়ী ধ্বংসের বিবরণ প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গই ছাড়িয়া দিয়াছি। শঙ্কুর গারুড়ীকে প্রাচীন পুঁথিতে

অনেক স্থলে 'ধন্বন্তরী' নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিজয়গুপ্ত ইঁহার নিবাস শঙ্কুর নগরী নির্দ্দেশ করিয়া বহুস্থানে ইঁহাকে শঙ্কুর গারুড়ী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমি প্রাচীন কবির অনুসরণ করিয়া, সেই নামই ব্যবহার করিয়াছি। চাঁদের ভৃত্য 'নেড়া'কে কোন কোন কবি 'তেড়া' নামে পরিচিত করিয়াছেন। আমি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। গল্পের মধ্যে আমার নিজের কল্পনা অতি সামান্যই প্রয়োগ করিয়াছি।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, শীতলা প্রভৃতি দেবী -সম্বন্ধীয় কাব্য পাঠ করিলে দৃষ্ট হয়, এই সকল কাব্যের মূল-ভিত্তি শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব। শৈবধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ-মূলক—জীব এই ধর্ম্মানুসারে পাশমুক্ত হইলেই শিবের সঙ্গে অভেদ হইয়া পড়েন। শিব নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, আনন্দময়; কিন্তু শক্তি-বাদীরা দ্বৈতভাব বিশ্বাস করিয়া জীব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—সগুণ, সক্রিয় প্রত্যক্ষ দেবতার আশ্রয় ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগুলিতে এই প্রভেদ অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শিব-ভক্তগণ স্বীয় উপাস্যের কোন সহায়তাই লাভ করেন নাই। কিন্তু শক্তি—চণ্ডী, মনসা, শীতলা বা অন্য যে আকারেই পূজিত হইয়াছেন—তিনি স্বীয় ভক্তের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টরূপে কল্পিত হইয়াছেন। অনেকটা অমার্জ্জিত ভাবে কথিত হইলেও পল্লীকবিগণের কাব্য হইতে এই ভাবটিই উদ্ধার করা যায়। দুঃখের বিষয়, চাঁদ-সদাগরের চরিত্রের বল প্রাচীন কবিগণ ততটা প্রশংসার ভাবে লক্ষ্য করেন নাই, অনেক স্থলেই তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি বিষয়টি অন্যভাবে দেখিয়াছি, কিন্তু মূলগল্পে যেরূপ পাইয়াছি, আখ্যানভাগে তাহার বিশেষ অন্যথাচরণ করি নাই।

ভূমিকা

দ্বিজ বংশীদাস মনসার ভাসান কাব্যে চণ্ডীকে মনসাদেবীর প্রতি-কূলতায় নিযুক্ত করিয়া উপাখ্যান যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, আমি প্রাচীনতর কবিগণের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সেই পন্থা অবলম্বন করি নাই। চাঁদের ডিঙ্গার নাম ও পুত্রগণের নাম আমি বংশীদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছি, এবং বেহুলার সাধনার কালে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাও কতকটা রূপান্তরিত করিয়া তাঁহারই কাব্যের আদর্শে রচনা করিয়াছি। অপরাপর বিষয়ে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দই আমার প্রধান আশ্রয় হইয়াছেন। স্থাননির্দ্দেশসম্বন্ধেও আমি এই কবিদ্বয়কেই অবলম্বন করিয়াছি। যখন বহু স্থানেই চাঁদ-সদাগরের আবাসভূমি কল্পিত হইয়াছে, তখন যে কোন প্রাচীন কবিকে অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে। এস্থলে সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা বিড়ম্বনা।

বেহুলার শাশুড়ীর নামটি প্রাচীন পুঁথিতে 'শুলকা'রূপে উল্লিখিত। এই 'শুলকা' শব্দ 'শুক্লা' শব্দের অপভ্রংশ কি না এবং সনকা সেই অপভ্রংশের রূপান্তর কি না এ সকল গূঢ়তত্ত্ব প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আলোচ্য। গ্রন্থভাগের অপরাপর নাম সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ আকার পুঁথিগুলিতে দৃষ্ট হয়,—যথা, কোন পুঁথিতে 'অমলা' কোনটিতে 'সুমিত্রা' ইত্যাদি।

হিন্দু গৃহিণীর প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানে যদি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেও সমর্থ হইয়া থাকি, তবেই আমার চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি লালগোলার স্বনামধন্য রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়ানুকূল্য করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন।

ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণের পুস্তকখানি আমূল পরিশোধিত হইল। সংশোধনের কার্য্যে আমি কলিকাতা হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. মহোদয়ের নিকট বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছি, এজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১৯শে শ্রাবণ, ১৩১৫
১৯ কাঁটাপুকুর লেন
বাগ্‌বাজার, কলিকাতা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এইবার এই পুস্তক আমূল পরিশোধিত হইল। আশা করি এই উপাখ্যান বঙ্গদেশে চিরকালই আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিবে; ইহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমি একটি সামান্য প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। আধুনিক রুচিতে স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ যেরূপ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রাচীন একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের এই অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তের প্রতি বঙ্গসাহিত্যে অবহেলার ভাব না আসিয়া পড়ে, ইহাই প্রার্থনীয়। বেহুলা প্রায় সাত শত বৎসর কাল বঙ্গীয় নারী-সমাজের আরাধ্য হইয়া আছেন, এবং আশা করি চিরকালই থাকিবেন।

১৭ই মাঘ, ১৩২৪
বেহালা। ২৪ পরগণা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বেহুলা

১

পরম শৈব চাঁদ-সদাগর চম্পক-নগরের অধিপতি ছিলেন। শিবের আদেশ ছিল যে, চাঁদ-সদাগর পূজা না করিলে, মর্ত্ত্যলোকে মনসাদেবীর পূজা প্রচারিত হইবে না।

মনসাদেবী চাঁদ-সদাগরের পূজা পাইবার বিবিধ চেষ্টা করেন; কিন্তু পূজা করা দূরে থাকুক, চাঁদ-সদাগর তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন।

যখন সদয় ব্যবহারে চন্দ্রধরের প্রীতি আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইলেন, তখন মনসাদেবী তাঁহার সঙ্গে বিষম শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। চাঁদ-সদাগরের 'মহাজ্ঞান' বলিয়া একটা শক্তি ছিল, এই শক্তির দ্বারা তিনি সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগকে আরোগ্য করিতে পারিতেন; মনসাদেবী যখনই সর্পদ্বারা চাঁদ-সদাগরের কোন পুত্রকে নিহত করিতে চেষ্টা পাইতেন, 'মহাজ্ঞান'-প্রভাবে পিতা তখনই তাহাকে রক্ষা করিতেন। সুতরাং প্রথম প্রথম মনসাদেবী বিরোধ করিয়া চাঁদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মনসাদেবী পরমা সুন্দরী রমণী সাজিয়া চাঁদ-সদাগরের মনোহরণ করিলেন; ছদ্মবেশিনীকে উদ্‌ভ্রান্ত বণিক্, মনসা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, কুহকিনীর বাক্য ও রূপচ্ছটায় চাঁদ 'মহাজ্ঞান' তাঁহাকে দান করিয়া ফেলিলেন। 'মহাজ্ঞান' গ্রহণ করিয়া মনসাদেবী একটি দীপ-শিখার ন্যায় আকাশে মিলাইয়া গেলেন,—চাঁদ-সদাগরের ভবিষ্যৎ গাঢ়-তিমিরাবৃত হইয়া পড়িল।

কিন্তু চাঁদের একটি বৈদ্য-বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম 'শঙ্কুর গারুড়ী'। গরুড় যেরূপ অহিকুলের শত্রু, ইনিও তদ্রূপ ছিলেন বলিয়া ইঁহার এই

উপাধি। এই সুহৃৎ তাঁহার প্রাণপ্রতিম। বৈদ্যরাজ সর্প-দংশনের অমোঘ ঔষধ জানিতেন; যেমন বিষধরই দংশন করুক না কেন, এই বৈদ্য রোগীকে রক্ষা করিতে পারিতেন। চাঁদের পুত্রগণকে সর্পে দংশন করা মাত্র, এই সুহৃদের সাহায্যে তাহাদের জীবন রক্ষা পাইত।

দেবী প্রথমতঃ বৈদ্যরাজকে হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু যখন তাঁহার শত চেষ্টায়ও অকৃত্রিম সুদৃঢ় বন্ধুত্ব ভগ্ন হইল না, তখন সুহৃদের জীবননাশের সংকল্প করিয়া, মনসা নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বহুবার ব্যর্থকাম হওয়ার পরে, শেষে মনসাদেবীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। বিচিত্র কৌশলে মনসা শঙ্কুর গারুড়ীর জীবন নষ্ট করিলেন।

এবার চাঁদ-সদাগর প্রকৃতই নিরাশ্রয়। 'যা করেন শিবশূলী' বলিয়া চন্দ্রধর স্বীয় সংকল্পে আরও দৃঢ় হইলেন।

বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতে, একটি একটি করিয়া চন্দ্রধরের ছয়টি পুত্র সর্প-দংশনে নষ্ট হইল।

চাঁদের শোকাতুরা স্ত্রী সনকা প্রতিদিন স্বামীর চরণতল নয়নজলে সিক্ত করিয়া দেবতার সঙ্গে এই বাদ পরিহার করিতে প্রার্থনা করিতেন,—তরুণবয়স্কা ছয়টি বিধবা রমণী, ক্রূরকর্ম্মা শ্বশুরের দিকে সজলনেত্রে তাকাইয়া, তাহাদের শোকার্ত্ত দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার চিত্ত কোমল করিতে চেষ্টা পাইত; বহুকালের প্রাচীন ভৃত্য 'নেড়া' এক হস্তে অশ্রু মুছিয়া অপর হস্তে গৃহের কাজ করিত ও প্রভুর পাদপদ্মে পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে ফুকারিয়া উঠিত। নানা দিগ্‌দেশ হইতে সুহৃদ্‌গণ মনসার সঙ্গে এই বাদ হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন—সেই বহুপুত্রের প্রিয়-কথোপকথন-স্নিগ্ধ, বাদানুবাদ-মুখর, লক্ষ্মীর প্রাসাদতুল্য বিশাল

প্রাসাদ, শ্মশানের নির্জ্জনতা পরিগ্রহ করিয়াছিল; কিছুতেই চাঁদের বজ্রকঠোর পণ শিথিল হইল না, তিনি শোকার্ত্ত-হৃদয়ে, ভ্রূকুটি করিয়া, স্বীয় বিপুল হিন্তাল কাষ্ঠের লাঠিদ্বারা মনসাদেবীর এই শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইয়া রহিলেন।

২

নিরানন্দ গৃহে কিছুতেই মন সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয় না; সে গৃহের অবিরল অশ্রুধারা ও হাহাকারে চাঁদ-সদাগরের চিত্ত ব্যথিত হইল, তিনি সুহৃদ্ ও অন্তরঙ্গ -সমাজ হইতে দূরে রহিলেন। তাঁহাদের অযাচিত উপদেশ ও নিন্দাবাদ ক্রমশঃ অসহ্য হইল। তিনি বিদেশ-ভ্রমণে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে মনন করিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

চট্টগ্রামের নাবিকগণ বিশাল সপ্তডিঙ্গা নানা বাণিজ্যের উপকরণে পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া আনিল। সদাগর বাণিজ্য-যাত্রায় যাইবেন, জয়ডঙ্কা বাজিতে লাগিল,—নফর ও নাবিকগণ চম্পক-নগরে এই সংবাদ রাষ্ট্র করিল; সাত ডিঙ্গার মধ্যে 'মধুকর' নৌকা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নানা কারুকার্য্যখচিত, তাহা একখানি ভাসমান রাজপ্রাসাদের ন্যায়; এই 'মধুকরে' সদাগর আরূঢ় হইলেন; তখন দলে দলে চম্পক-নগরবাসী লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া সুদর্শন 'মধুকরে'র বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিতে লাগিল। নৌকাগুলি উজান বাহিয়া চলিল। এই সময়ে অপর একটি দৃশ্য হৃদয়বিদারক,—চম্পক-নগরের প্রাসাদে অশ্রুপূর্ণ মুখে বধূগণ-বেষ্টিত সনকা শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন; এই দুঃখের

সংসারে পতি-সেবার জন্য তাঁহার যে বলটুকু অবশিষ্ট ছিল, আজ যেন তাহাও তাঁহার দেহে আর রহিল না।

কালীদহের বিপুল আবর্ত্তে পড়িয়া, সপ্ত ডিঙ্গা একান্ত বিপন্ন হইল। মনসাদেবীর আদেশে প্রবল ঝড় উত্থিত হইল। কালীদহের ভীষণ আবর্ত্ত কর্ণধারগণের প্রাণে আশঙ্কা উপস্থিত করিল,—দেখিতে দেখিতে সমস্ত জগৎ একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পরিপ্লাবিত হইল, মুষলধারে জল পড়িতে লাগিল ও ঝঞ্ঝাবাতে ডিঙ্গাগুলির ছৈ উড়িয়া গেল। সপ্ত ডিঙ্গা খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

চন্দ্রধর কালীদহের জলে ভাসিতে লাগিলেন; এই বিপদে তিনি 'শিব' 'শিব' বলিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

৩

কিন্তু চাঁদ-সদাগর মরিলে দেবীর পূজা জগতে প্রচারিত হইবে না। দেবী তাঁহার বসিবার সুবিস্তৃত পত্রসঙ্কুল শতদল চাঁদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, যেন সদাগর তাহা ধরিয়া ভাসিয়া থাকিতে পারেন। সম্মুখে ভাসমান পত্রসহ-পদ্মলতা দেখিয়া চন্দ্রধর আশ্রয়ের জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন,—কিন্তু মনসার একনাম 'পদ্মা' সহসা ইহা মনে পড়াতে নামের সংস্রবহেতু ঘৃণায় হস্ত আকুঞ্চিত করিয়া, অকূল জলরাশিতে ডুবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন।

কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া, চাঁদ তিন দিন পরে এক সমৃদ্ধ পল্লীর নিকটে উঠিলেন। নগ্নদেহ আবরণের জন্য শ্মশানের কাণি কুড়াইয়া কথঞ্চিৎ লজ্জানিবারণপূর্ব্বক বণিক্-রাজ সেই পল্লীতে প্রবেশ করিলেন।

সেই স্থানে সমৃদ্ধিসম্পন্ন চন্দ্রকেতু নামক বণিক্ বাস করিতেন; চন্দ্রকেতু চাঁদ-সদাগরের বাল্যসখা। এই দুঃসময়ে তিন দিন সম্পূর্ণ অনাহারে অতিবাহিত করিয়া চাঁদ চন্দ্রকেতুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

বাল্যসখার এই বিপদ্ দর্শনে চন্দ্রকেতু দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদরে আপ্যায়িত করিলেন; চাঁদের শরীর মার্জ্জিত হইল, ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিয়া তিনি তিন দিনের অনাহারের পর ভোজন করিতে গেলেন। ভোজনের নানা আয়োজন হইয়াছিল; লুব্ধ বণিকের নেত্র খাদ্যদ্রব্যের উপর পতিত হওয়াতে, তাঁহার রসনা সরস হইল, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু সখার প্রতি সৌহার্দ্দ্যবশতঃ তাঁহাকে মনসার সহিত কলহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন এবং এই প্রসঙ্গে উত্তেজিত চাঁদ-সদাগরের সঙ্গে তাঁহার যে বাদানুবাদ হইল, তাহাতে সদাগর জানিতে পারিলেন যে, চন্দ্রকেতু একজন মনসার পূজক, এমন কি তাঁহার বাড়ীতে মনসার ঘট পূজিত হইয়া থাকে।

ক্রোধে চাঁদের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; তখনও গণ্ডূষ করা হয় নাই, উপবাসী চাঁদ-সদাগর ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় আসন হইতে উত্থান করিয়া পরিত্যক্ত শ্মশানের কাণি পরিধানপূর্ব্বক সরোষে বন্ধুগৃহ ত্যাগ করিলেন; অনুনয়কারী বন্ধুর হস্ত দূরে সরাইয়া, একবারমাত্র সঘৃণনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, "বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কাণি"। বলা উচিত, চাঁদ মনসাদেবীকে 'কাণি', 'চেঙমুড়িকাণি' প্রভৃতি দুরক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন।

এই অবস্থায় চাঁদ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করিলেন, সেই তণ্ডুলগুলি এক স্থানে সযত্নে রাখিয়া, তিনি স্নান করিতে গেলেন; স্নানান্তে তাহা নিজে পাক করিয়া, জঠরানল-নিবৃত্তি করিবেন।

কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে মনসাদেবী গণদেবের মূষিক-দ্বারা সেই তণ্ডুলগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন ; ক্ষুধার্ত্ত চাঁদ আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কষ্ট-সঞ্চিত পুঁটুলীতে একটিমাত্র তণ্ডুলকণাও অবশিষ্ট নাই, তখন ক্রুদ্ধনেত্রে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ছয় পুত্রের শোকে যে প্রাণ নষ্ট হয় নাই, অনাহারে এত সহজে তাহা যাইবার নহে, কিংবা তাঁহার পণ ভঙ্গ হইবার নহে—ইহাই অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে উচ্চারণ করিয়া মনসাদেবীকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

বিবিধ রসপূর্ণ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যে যিনি আত্মীয়-স্বজনকে নিত্য পুষ্ট রাখিয়াছেন, সেই বণিক্‌কুলচক্রবর্ত্তী দেশপ্রসিদ্ধ চন্দ্রধর নদীতীরে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিলেন। কতকগুলি কাঠুরিয়া সেই পথে যাইতেছিল ; তাহারা চাঁদকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দরিদ্র মনে করিল এবং তাহাদের সঙ্গে বনে কাঠ কাটিলে তিনি লাভবান হইতে পারেন এই ভরসা দিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, সৌম্যকান্তি, শ্মশানের কাণি-পরিহিত, প্রায় দিগম্বর বণিক্‌রাজকে তাঁহার উপাস্যদেবতা চন্দ্রচূড়ের মতই দেখা যাইতে লাগিল।

চাঁদ, কাঠুরিয়াগণ অপেক্ষা কাষ্ঠ বেশী চিনিতেন। তিনি চন্দন কাষ্ঠের একটা প্রকাণ্ড বোঝা সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের অগ্রে অগ্রে নগরের হাটের দিকে যাত্রা করিলেন। মনসাদেবীর আদেশে অদৃশ্য-ভাবে বায়ুপুত্র সেই কাষ্ঠের বোঝার উপর পদাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তাহাতে বোঝা এত ভারী হইল যে, চাঁদ আর তাহা মাথায় বহন করিতে পারিলেন না।

এইরূপে পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া চাঁদ-সদাগর এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পরিচারকবৃত্তি অবলম্বন করিলেন ; প্রভুর আদেশে আশুধান্য নিড়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মনসাদেবীর কুহকে চাঁদ ধান্য এবং তৃণ উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া, তৃণের পরিবর্ত্তে কতকগুলি ধান্য উত্তোলন করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণগৃহ হইতে তাঁহার জবাব হইল। বিমর্ষচিত্তে চন্দ্রধর জঙ্গলে ঘুরিতে লাগিলেন ; একান্ত উন্মনা-ভাবে বিচরণ করিতে করিতে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে মনসাকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। সেইস্থানে কতকগুলি ব্যাধ পক্ষী ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছিল, —পক্ষীগুলি ফাঁদের নিকট আসিয়াছে, এমন সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত সদাগরের অসাবধান পাদক্ষেপে ও অর্দ্ধোক্তিতে চমকিত হইয়া তাহারা উড়িয়া গেল। তখন ব্যাধগণ ক্রুদ্ধ-চিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল—

"কেন তুই পক্ষী দিলি তেড়ে,
কোথা হইতে কাল তুই এলি ভেড়ের ভেড়ে।"

সদাগর তাহাদের নিন্দাবাদ ও কটূক্তি শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহারা তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের মনোরম স্নিগ্ধ আলোক বনান্তভূমির শীর্ষে কিরীটের শোভা দান করিয়াছিল : পল্লী হইতে চাষাদের মেঠো সুরে ভাটিয়াল রাগিণী গীত হইয়া বনান্তে লীন হইয়া যাইতেছিল ; নিবিড় বনরাজির ক্রোড় ত্যাগ করিয়া তমিস্রা সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছিল। শ্মশানের কালি-পরিহিত কাঞ্চনপ্রতিম প্রৌঢ় দিগম্বর-মূর্ত্তি সদাগর আকাশপানে তাকাইয়া যুক্তকরে বলিলেন, "ভগবান, তোমার সেবক আত্মপ্রসাদ ভিন্ন আর কিছু চাহে না ; এই অত্যাচারে যেন তোমার প্রতি নির্ভর না হারাইয়া ফেলি। তোমার সেবার পরিবর্ত্তে যে মণিময় হর্ম্ম্য ও রাজ্য-

সম্পদ্, প্রিয় পুত্রকলত্রলাভ—তাহা যেন কখনই বাঞ্ছনীয় মনে না করি।" সেই নিবিড় বনপ্রদেশে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় চন্দ্রধর-বণিক্ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া মহেশ্বরের শ্রীচরণোদ্দেশে কয়েক বিন্দু অশ্রু,—শুধু কয়েক বিন্দু অশ্রু--উপহার প্রদান করিলেন ; একটি বিল্বপত্র ও একটি ধুস্তুর পুষ্পের সন্ধানে সদাগরের চক্ষু ইতস্ততঃ ধাবিত হইল, কিন্তু তথায় তাহা জুটিল না।

৪

চাঁদবেণে এই অবস্থায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সনকা, স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সাত ডিঙ্গা ডুবিয়া গিয়াছে —তাঁহাদের বড় সাধের 'মধুকর' ডিঙ্গাখানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জলমগ্ন হইয়াছে, শুনিয়া সনকা শোকবিহ্বলা হইলেন। লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে উপর্য্যুপরি বিপৎপাত হয় ; নির্ব্বংশ সদাগরের গৃহে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পাদপদ্মের অলক্তকরাগ মুছিয়া যাইতেছে, 'মধুকর' ডিঙ্গার নাশে সনকা তাহারই আভাস পাইলেন, সনকা তাই কাঁদিয়া সদাগরের নিকট বিনাইয়া বিনাইয়া বারংবার শুধাইতে লাগিলেন—

"শুন সদাগর, কোথা মধুকর
কহ তব পায়ে পড়ি।"

সদাগর নিজে যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা সনকাকে বলেন নাই ; কিন্তু সাধ্বী স্বামীর উন্নত, দর্পণোপম ললাটের কালিমা দর্শনে সেই কষ্টের ইতিহাস বুঝিতে পারিলেন। রাত্রিদিন সনকার মন জ্বলিতে লাগিল। তিনিও অশ্রুসিক্ত নেত্র ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া মনসা

দেবীকে বলিলেন, "আমরা তোমার প্রতি ভক্তি সদাগরের প্রাণে সঞ্চার করিতে পারিলাম না, এমন কাহাকেও আমাদের গৃহে আনিয়া দাও, যাহার চেষ্টায় এই অসাধ্যসাধন হয়, তোমার ঘট তুমি স্থাপিত করিয়া যাও। আমাদিগকে আর কত পরীক্ষা করিবে! আমাদের হৃদয় বড় দৃঢ়, পাষাণ হইলেও বুঝি তাহা এরূপ কঠোরাঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইত।"

আবার সদাগরের বিশাল গৃহে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিয়াছে; প্রতিবাসিনীরা বলিয়া উঠিল, "ঐ যা, সনকা রাণীর আর-একটি পুত্র জন্মিল, উন্মাদ চন্দ্রধর মনসার সঙ্গে বাদ করিয়া এটিও হারাইবে।" "আহা! শিশুর কি চাঁদপানা মুখ।" সনকা সেই সূতিকাগৃহে শিশুর শরচ্চন্দ্রনিভ প্রফুল্ল মুখখানি দেখিলেন; পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, শোকার্ত্ত মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত নিরুদ্ধ স্নেহ সেই শিশুর মুখদর্শনে তেমনি উথলিয়া উঠিল। তিনি জানিতেন, এ পুত্রও মনসাদেবী রাখিবেন না। এক চক্ষের প্রান্তে আশঙ্কাজনিত অশ্রু পতনোন্মুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু মাতৃস্নেহ এমনই প্রবল যে, অপর চক্ষু শিশুর বদনচন্দ্রমা দর্শনে প্রীতিপ্রফুল্ল হইল, যেন বহুদিনের জ্বালা সহসা জুড়াইয়া গেল। গৃহ হইতে লক্ষ্মী পাছে অন্তর্হিতা হন, এই ভয়ে সনকা ভীতা ছিলেন, লক্ষ্মীকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার ফাঁদস্বরূপ পুত্রের নাম 'লক্ষ্মীন্দ্র' রাখিলেন, এই নাম আদরে আদরে শেষে 'লখাই' এবং আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া 'নখা'তে পরিণত হইয়াছিল।

চাঁদ-সদাগর পুত্রমুখদর্শনে প্রীত হইয়াছিলেন; পুত্রের অসামান্য রূপদর্শনে তিনি ভীত হইলেন, এ পুত্র মনসার কোপানলে আহুতিস্বরূপ

হইলে, তিনি কি করিয়া স্থির থাকিবেন? তিনি অহর্নিশ মহেশ্বরের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতেন; দৈবজ্ঞ তাঁহাকে নিভৃতে বলিয়া গেলেন, বাসরঘরে 'দুর্লভ লখীন্দরে'র সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। ইহা শুনিয়া সদাগরের সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল; তিনি সংসারের সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে যে শান্তিময় স্থান আছে, অন্ধকারে রত্নান্বেষী ব্যক্তির ন্যায় তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। অবিরাম তাঁহার মুখে 'হর' 'হর' শব্দ ধ্বনিত হইত—পুত্রের অশুভ কথা তিনি সনকাকে জানাইলেন না, নিজে সেই মহাপরীক্ষার দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীন্দর কৈশোর অতিক্রম করিল। সনকা মায়ার ফাঁদে পা দিয়াছেন, দিবারাত্রি 'লখা'র জন্য কত শত অনুষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু চাঁদ-সদাগর পুত্রকে ততটা আদর করেন না, সনকা তাহাতে দুঃখিত হন। কিন্তু চাঁদ যে কারণে লক্ষ্মীন্দরকে আদর করিতে যাইয়াও ফিরিয়া আসেন, তাঁহার পিপাসিত নেত্রদ্বয় যখন পুত্রমুখ-সুধা পান করিতে লালায়িত হয়, তখনও যে কারণে তিনি লোলুপ চক্ষুর্দ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করেন, তাহা সনকা জানিতেন না; সুতরাং তিনি ভাবিতেন, স্বামী শোকে-দুঃখে উন্মনা ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বের মত আর তাঁহার হৃদয় কোমল নাই, তিনি নির্ম্মম জড়বৎ হইয়া গিয়াছেন।

৫

নবযৌবনে লক্ষ্মীন্দর বণিক্-গৃহের দীপস্বরূপ হইল। একটিমাত্র দীপের জ্যোতিতে যেরূপ সমস্ত আঁধার ঘুচিয়া যায়, সেই বিশাল প্রাসাদ লক্ষ্মীন্দরের রূপ-গুণে তদ্রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীন্দরকে সেই গৃহের সকলে 'দুর্লভ নখা' বলিয়া ডাকিত; বড় দুঃখে, বড় কষ্টে ও বড় তপস্যায় 'নখা'কে পাওয়া গিয়াছে, এজন্য সে 'দুর্লভ'।

নখা এখন নবযৌবনে উপনীত, সে নিজের জাতি-ব্যবসায় শিখিয়াছে; কাব্য, নাটক, অলঙ্কার পাঠ করিয়াছে; সে শুধু চন্দ্রধরের গৃহের গৌরব নহে, সে সেই বিশাল চম্পক-নগরীর গৌরবস্থল; যেখানে 'নখা' পদার্পণ করে, সেই স্থানের সকলের মুখে আনন্দের রেখা অঙ্কিত হয়—তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেই লোকে কৃতার্থ বোধ করে। কেবল সদাগর সমস্ত ধর্ম্ম-বুদ্ধির শক্তি সবলে হৃদয়ে উদ্বোধিত করিয়া লখাই হইতে একটু দূরে থাকেন—আদরের ধনকে আদর করিতে সাহস পান না, যাহাকে বক্ষে রাখিবেন, তাহাকে স্বীয় কক্ষে আনিয়া কথা বলিবার সময় মুখ অবনত করিয়া শিব স্মরণ করেন।

ছয়টি বধূ বিধবা; রমণীবর্গের মধ্যে একমাত্র সনকা মৎস্যাহারী। ছয়টি বধূর জন্য নিরামিষ হাঁড়ি উননে স্থাপিত হয়, দেখিয়া সনকার অন্নব্যঞ্জন মুখে রুচে না। নিজে যখন দুঃখরেখাকুঞ্চিত ললাটে সিন্দূর পরিতেন, তখন বধূগণের শুভ্রচন্দ্রোজ্জ্বল ললাট শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। আর কাহাদের লইয়া সন্ধ্যাকালে কেশবিন্যাস করিবেন! আর কাহাদের কপালে সিন্দূরবিন্দু আঁকিয়া দিবেন! আর কাহাদের তাম্বুলরঞ্জিত প্রিয় ওষ্ঠাধর দেখিয়া পুলকিত হইবেন!

শাঁখারীকে বৎসরান্তে কাহাদের জন্য নানাপ্রকার কারুখচিত শাঁখার কথা বলিয়া দিবেন! যাহাদের লইয়া এই সকল আনন্দলীলায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাহারা সিন্দুরের কৌটাটি দেখিলে লুকাইয়া যে অশ্রুবিন্দুটি অঞ্চলাগ্রে মুছিয়া ফেলে, সনকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহা এড়ায় না; সনকা কিছু না বলিয়া তখন নিজের প্রকোষ্ঠে যাইয়া একা-একা কাঁদিতে থাকেন, হয়ত সেদিন তাঁহার কিছু খাওয়া হয় না। সুবর্ণ-চিরুণী দিয়া স্বীয় কেশ আঁচড়াইতে যাইয়া সনকার চক্ষু জলে ভরিয়া আইসে। হায় বিধাতঃ! প্রৌঢ়া যাহা কর্ত্তব্যের দায়ে করিয়া থাকেন, তাহা যে যৌবনের পক্ষেই শোভন;—সুন্দরী যুবতীরা গৃহে তপস্বিনীর ব্রত সাধন করিবেন, আর প্রৌঢ়া কি করিয়া তাম্বুল ও মৎস্য ভোগ করিবেন, স্বর্ণচিরুণীতে কেশ আঁচড়াইবেন! অথচ তাহা না করিলে নয়।

সনকা একদিন সন্ধ্যাকালে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমার দুর্ল্লভ নখার একটি বউ আনিয়া দেও, লক্ষ্মী বউ অলক্তক-রঞ্জিত নূপুর-মুখর ক্রীড়াশীল পদে এই গৃহে বিচরণ করিবে, আমি সেই প্রিয় শব্দ শুনিব এবং আঙ্গিনায় সেই অলক্তক-চিহ্ন দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, আমার স্বর্ণকৌটা-ভরা সিন্দুর আমি তাহার সুন্দর কপালে পরাইয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব।"

সহসা পথিক সর্পের দেহ স্পর্শ করিলে যেমন চমকিয়া উঠে, এই প্রস্তাবে চাঁদ-সদাগর তেমনই চমকিয়া উঠিলেন। বাসর-ঘরের আতঙ্ক তাঁহার মনে উপস্থিত হইল; তিনি সনকার প্রার্থনাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় সনকা দাঁড়াইয়া রহিলেন; তখন নদীনীর-সিক্ত পবন গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তলাগ্র যেন সস্নেহে স্পর্শ করিতেছিল, পশ্চিমাকাশের

নীলিমা ভেদ করিয়া 'শুকতারা' স্বামী-উপেক্ষিতার গণ্ড-প্রবাহিত অশ্রুধারাকে উজ্জ্বল করিতেছিল—তাহার এত সাধের 'লখা'কে এরূপ নির্ম্মমভাবে স্বামী উপেক্ষা করিলেন, সনকার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত দুঃখ আজ উথলিয়া উঠিল, তিনি দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লখাই পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যাকালের আহার্য্যের জন্য মাতাকে খুঁজিয়া চলিয়া গেল, সনকা তাঁহার 'মা' 'মা' আহ্বান শুনিতে পাইলেন না। এক প্রহর কাল এইভাবে অতিবাহিত হইল, সনকার হৃদয়ের ব্যথার হ্রাস হইল না। পুত্রশোকে যিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন, আজিকার দুঃখে তিনি নীরব রহিলেন।

এইরূপ দুঃখ সম্পূর্ণ অভিনব, ইহাতে তিনি অভ্যস্ত নহেন,—শুধু গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, আর নৈশনক্ষত্র গবাক্ষপথে সেই উপেক্ষাসম্ভূত অশ্রুবিন্দুকে স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিতেছিল; রোরুদ্যমানার বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

চাঁদ বাহিরের দরবার ছাড়িয়া যখন রাত্রিতে স্বপ্রকোষ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, নীরবে অশ্রুমুখী সনকা দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া সনকা তাঁহার আহার্য্য-সন্ধানে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন; চাঁদ তাঁহাকে আদরের সহিত সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, "তুমি কি সেই হ'তে এখানে দাঁড়াইয়া আছ?" স্বামীর আদরে সনকার চক্ষু হইতে দরদর-প্রবাহে জল পড়িতে লাগিল, তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

চাঁদ-সদাগর অভিমানিনীর মনের ব্যথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি দৈবজ্ঞের কথা সনকাকে বলিলে পুত্রবৎসলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া

যাইবে। দৈবজ্ঞের কথা যে ফলিবে, তাহার বিশ্বাস কি ? লখার বিবাহ দিবার কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর আশঙ্কা হইয়াছিল, তিনি কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না।

নিজের কোঁচার খুঁটে সনকার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, মনসা-দেবীর প্রতিকূলতা এখনও আছে ; ছয়টি বিধবা বধূ যে গৃহকে শ্মশান-সমান করিয়া রাখিয়াছে, সেই গৃহে অন্য একটি বধূ আনিতে তাঁহার সাহস হয় না, সেই সুখ যদি প্রতিবাদী দেবতার বুকে না সহে।

সনকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি নখাকে আদর কর না, এ কষ্ট আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আমার বড় দুঃখের ধন নখা, তুমি তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহ না, তুমি নির্ম্মম ; বাছাকে কি চিরকাল অবিবাহিত রাখিবে ? মনসাদেবী আর কষ্ট দিবেন না ; নখার বউ ঘরে না আসিলে, আমার এই শূন্য ঘর কে পূরণ করিবে ? আমার বড় সাধ, বধূর সহিত নখাকে লইয়া আবার সংসার পাতি—তুমি বাদী হইও না।" এই বলিয়া সনকা অশ্রুপূর্ণনেত্রে চাঁদ-সদাগরের পদতলে নিপতিত হইলেন।

চাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'দৈবজ্ঞের কথা যে নিশ্চয় ফলিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? আর বাসর-ঘরের ব্যবস্থা আমি এমন করিব যে, মনসা প্রতিকূল হইলেও কিছু না করিতে পারে। এই হতভাগিনী দুঃখিনীর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না।'

সযত্নে সনকাকে উঠাইয়া চাঁদ বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না, পুত্রবধূ ঘরে আনিব। কুলপুরোহিত জনার্দ্দনকে ডাকিয়া উপযুক্ত বধূর সন্ধান দেখ।"

৬

তখন নিছনি-গ্রামের বণিক্ সায়-সদাগরের কন্যা বেহুলা প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা হইয়া উঠিয়াছে; বেহুলার কণ্ঠস্বর কোকিলের মত, বেহুলার ন্যায় কোন নর্ত্তকীও নাচিতে পারিত না, বেহুলা রন্ধনকার্য্যে সিদ্ধহস্তা ও সুলেখিকা,—আর বেহুলার রূপ দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র মলিন হইয়া যাইত, নিতম্বলম্বিত কুন্তলরাজি দেখিয়া কাদম্বিনী আকাশের প্রান্তে লুকাইত। বেহুলাকে প্রতিবাসিগণ 'ক্ষেপা মেয়ে' বলিয়া ডাকিত; এই মেয়ে যেখানে যাইত সেখানে তাহার কথা লোকে শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লইত, তাহার সরল বুদ্ধির কথায় অনেক গৃহস্থের কূটদ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইত—যেখানে বেহুলা থাকিত, তাহার নৃত্যগীতে সে স্থানে আনন্দের উৎস ছুটিত, লোকে আদর করিয়া তাহাকে 'বেহুলা নাচুনি' বলিয়া ডাকিত।

বস্তুতঃ, বেহুলা অপরাপর বালিকার মত ছিল না। সে সংসারে থাকিয়া যেন কোন স্বর্গের কল্পনায় নিযুক্ত থাকিত; সমবয়স্কা বালিকাগণ যখন দেখিত, বেহুলা যোগিনীর ন্যায় কর্ণে কুণ্ডল[১] পরিয়া সন্ধ্যাকালে নদীতীরে ঊর্দ্ধ নেত্রে একা বসিয়া আছে—ঠিক একখানি নিশ্চল চিত্রের ন্যায়, তাহার একগাছি কেশও বায়ুহিল্লোলে দুলিতেছে না—তখন সেই পুণ্যবতী ধ্যানশীলার চিন্তাস্রোত ভঙ্গ করিয়া তাহারা কথা কহিতে সাহস পাইত না, স্থির হইয়া তাহার পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিত। কখনও কোন বিধবার শোক-লুণ্ঠিত শিরোদেশ নিজ অঙ্কে

১ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বত্রই কুণ্ডলধারণ যোগিনীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়।

রাখিয়া, বেহুলা তাঁহার আলুলায়িত কুন্তল মার্জ্জনা করিতে করিতে দুই-একটি অশ্রুবিন্দু পাত করিত, তখন তাহাকে ঠিক একটি দেবতার ন্যায় দেখাইত; শোকার্ত্তার বিহ্বল চক্ষু তাহার দিকে পড়িলে সে মনে ভাবিত, তাহার দুঃখ যেন স্বর্গের কোন করুণাময়ী দেবীর বুকে বাজিয়াছে; তিনি স্বর্গের সুখ ত্যাগপূর্ব্বক তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বেহুলা কথা বলিত না, কিন্তু তাহার স্নিগ্ধ করুণার ভাবে অপূর্ব্ব শান্তি বিতরণ করিত।

কখনও কোন জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ চক্ষে বেহুলা দেখিত,—সতী স্বীয় উজ্জ্বল ললাটদেশ সিন্দুর-রঞ্জিত করিয়া কোন স্বর্গলোক দেখিতে দেখিতে স্বামীর পার্শ্বে পুড়িয়া ছাই হইতেছেন, সেই দৃশ্য দেখিয়া বেহুলার গণ্ডদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, যে পুণ্যলোকে সতী চলিলেন তাহা বেহুলার চক্ষে যেন প্রত্যক্ষবৎ মনে হইত।

কখনও সীতার কষ্টের কথা পড়িতে পড়িতে শিশিরাপ্লুত পদ্মদলের ন্যায় তাহার চক্ষু ভারাক্রান্ত ও রক্তিম হইত; কিন্তু যখন সাবিত্রী কিরূপে মৃত স্বামীকে বক্ষে ধারণ করিয়া, মৃত্যুর নিকট হইতে তাঁহার জীবন পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন, বেহুলা সেই কাহিনী পাঠ করিত, তখন সেই পুণ্যময়ী সতীর ভাব তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিত, বালিকা একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে যখন বালিকা 'অরক্ষণীয়া' হইয়া উঠিয়াছে, তখন সায়-বেণে বর খুঁজিতে খুঁজিতে পাত্রীসন্ধানে-ভ্রমণশীল জনার্দ্দন শর্ম্মার মুখে চাঁদ-সদাগরের পুত্র লক্ষীন্দরের কথা জানিতে পারিলেন।

চাঁদ-বেণে স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলায় চাপিয়া নিছনি নগরে আসিলেন। কন্যাকে 'পাকা দেখা' হইবে—একশত ভারী তত্ত্ব লইয়া চলিল: সন্দেশ,

মুড়কি, চিপীটক, রসাল পানের বীড়া, ঝালের লাড়ু, চাঁপাকলা, প্রভৃতি নানা খাদ্যদ্রব্য, ঢাকাই ও বারাণসী শাড়ী, উড়িষ্যার বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার, বহুমূল্য হীরার হার. মণি-খচিত স্বর্ণচিরুণী প্রভৃতি লইয়া পরিচারকেরা আগে চলিয়া গেল।

চাঁদ সায়-বেণের গৃহে পরম আদরে আপ্যায়িত হইলেন। মেয়ে দেখিয়া চাঁদের চক্ষু জলপূর্ণ হইল; মেয়ে ত নয়, এ যেন পদ্মাসন ছাড়িয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণী ভূতলে দাঁড়াইয়াছেন,—পায়ের আল্‌তা নহে, উহা রক্তপদ্মের প্রভা। এই বধূকে পাইলে সনকার প্রাণ সত্য সত্যই জুড়াইবে; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে, আবার সংসারের মায়া-বন্ধনে ধৃত হইতেছেন ভাবিয়া, সদাগর নীরবে হৃদয় হইতে সাংসারিক সুখের আশা সরাইয়া ফেলিলেন। রক্তচন্দনের ফোঁটা ললাটে ছিল, রক্তপট্টবাস পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'শিবদুর্গা' স্মরণ করিয়া চন্দ্রধর মুহূর্ত্তের জন্য সংসারের ঊর্দ্ধে শান্ত সমাধিতে স্থিত হইলেন।

চাঁদ সায়-বেণেকে বলিলেন, মেয়ে তাঁহার মনোনীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের একটা কৌলিক প্রথা আছে, কন্যাকে তদনুসারে পরীক্ষা করিতে হইবে— লৌহনির্ম্মিত কলাই রন্ধন করিয়া কন্যা পরিবেশন করিবেন। কন্যা যদি লক্ষ্মী হন তবে লৌহের কলাই ডালের মত গলিয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া বেহুলার মাতা অমলা কাঁদিতে লাগিলেন; এমন কথা কে কোথা শুনিয়াছে? লৌহের কলাই অগ্নিজ্বালে কে কবে গলাইয়াছে? সায়-সদাগর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বেহুলা আসিয়া বলিল, "তোমরা ভয় পাইয়াছ কেন? আমি বারমাসে বার ব্রত করিয়া থাকি, প্রতি অমাবস্যায় উপবাসী থাকিয়া

মনসাপূজা করিয়া আসিয়াছি, দেব-প্রসাদে আমি লৌহের কলাই সিদ্ধ করিয়া ফেলিব।"

কাঁচা মাটির তিনটা ঝিক্ গড়িয়া নূতন উনন প্রস্তুত করা হইল; ছয় গণ্ডা লৌহের কলাই আনিয়া নূতন হাঁড়ীতে পুরিয়া সেই হাঁড়ী জলপূর্ণ করা হইল। বেহুলা মনসাদেবীকে স্মরণ করিয়া উননে আড়াই নুড়া জাল দিয়া আগুন জ্বালিলেন, দেখিতে দেখিতে লৌহ-কলাই সিদ্ধ হইয়া গেল। অমলা ও সায়-বেণে বিস্ময়ে ভাবিলেন, 'আমাদের গৃহে কন্যারূপিণী এ কে?' সহচরীরা ভাবিল, 'আমাদের সঙ্গে যিনি খেলা করেন, তিনি অসামান্যা, আমাদের মতন নহেন'; প্রতিবাসীরা বলাবলি করিল, "এ ক্ষেপা-মেয়ে কোন শাপভ্রষ্টা দেবী।" চাঁদ-সদাগর বুঝিলেন, এ কন্যা লক্ষ্মীন্দরের যোগ্য। গণক আসিয়া বর-কনের রাশি মিলাইয়াও তাহাই বলিয়া গেলেন।

৭

চাঁদ গৃহে আসিয়া বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অপরাপর উদ্যোগ অন্যহস্তে অর্পিত হইল; স্বয়ং চাঁদ, সাঁতালী-পর্ব্বতে লৌহের বাসর নির্ম্মাণ করিতে কামিলা নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই লৌহগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিলেন। প্রকাণ্ড লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ উত্থিত হইল। সাঁতালী-পর্ব্বতের প্রস্তর খুঁড়িয়া লৌহময় ভিত্তি নির্ম্মিত হইল,—তদুপরি লৌহের তোরণ মেঘ স্পর্শ করিয়া রহিল, এবং বিশাল লৌহগৃহ যমপুরীর কারাগৃহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই গৃহের বহির্দ্দেশে শত শত শাস্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত

রহিল। বহুসংখ্যক নেউল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সেই বিশাল লৌহপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; তাহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখাগ্র সর্পদেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উন্নত হইয়া রহিল। নেউলদিগের শ্রেণী হইতে ঈষৎ দূরে ইন্দ্রায়ুধতুল্য পুচ্ছ উন্মুক্ত করিয়া শিখিগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাদের পদাঙ্গুলী ও চঞ্চু সর্প ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া সাঁতালী-পর্ব্বতের গাত্রে তৃণশষ্প ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বৃক্ষমূল ও লতাগুল্ম বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের তীব্রগন্ধে সর্প-সমাজ সাঁতালী-পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া দূরদূরান্তরে প্রস্থান করিল।

মনসাদেবী আকাশ হইতে এই দৃঢ়রক্ষিত পর্ব্বতদুর্গ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন।

তিনি লৌহের বাসর-ঘর-নির্ম্মাতাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "একটি কেশ প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র লৌহের গৃহ-দেয়ালে রাখিতে হইবে।" কামিলা, দেবীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে সদাগর বেতন ও পুরস্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিয়াছেন, এখন যন্ত্র লইয়া কোন্ ছলে সেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিব।" দেবী তাহাকে ভয় দেখাইলেন,—এমন কে দৃঢ়চেতা পুরুষ আছে যে বিষহরী দেবীর ক্রোধকে ভয় না করে? কামিলা সম্মত হইয়া পুনরায় ভাল করিয়া গৃহ দেখিবার ছলে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রস্তুত করিল এবং তাহা কয়লার গুঁড়া দিয়া পূর্ণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

লক্ষ্মীন্দর বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের অভাব নাই; হস্তী, অশ্ব ও চতুর্দ্দোলে আরূঢ় শত শত আত্মীয় লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে যাত্রী হইলেন। বরযাত্রিগণের বিচিত্র স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ, উষ্ণীষের

মণি ও হীরার হারের জ্যোতিতে নিশাকালে যেন সৌরকিরণ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বহুমূল্য মুকুট মস্তকে পরিয়া, লক্ষীন্দর যেমনই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, চৌকাঠে তাঁহার মুকুট ঠেকিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল—চোপদার অমনি তাহা উঠাইয়া মাথায় পরাইয়া দিল। এই অশুভ ঘটনা সনকা প্রত্যক্ষ করেন নাই, চাঁদ-সদাগর দেখিয়াছিলেন, আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল।

তিন সহস্র গন্ধবণিক, তন্মধ্যে চৌদ্দ শত কুলীন্, বরযাত্রী হইয়া চলিলেন; তিন শত ভাট সেই বিবাহের গান রচনা করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিল; বহুসংখ্যক মালী, তের শত গাবর, পট্টবস্ত্র-পরিহিত সাত শত ধোপা, বহুসংখ্যক বাদ্যকর, নাপিত, তাঁতি, যোগী ও সপ্ত সহস্র বিদ্যুৎ-বাজিকর[১] নিছনি নগরের অভিমুখে চলিল; স্বর্ণ ও রৌপ্যের দোলা সাত শত এবং সত্তরখানি স্বর্ণপালঙ্ক এই মিছিলের মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল। গজমুক্তার ঝালরে শোভিত আস্তরণমণ্ডিত গজরাজে আসীন চন্দ্রধর সুহৃৎ ও অন্তরঙ্গ বেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিলেন; শত শত মশালচি সেই দলের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল,—মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদর্শন গন্ধর্ব্ব রাজকুমারের ন্যায় লক্ষীন্দর অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। তাঁহার মস্তকে মণিময় মুকুট, কণ্ঠে লবঙ্গ, রঙ্গন ও বকুল ফুলের মালা মুক্তাহারকে সুগন্ধ-বিশিষ্ট করিতেছে, হস্তে শুভবিবাহচিহ্ন দর্পণ, কাটারী ও তরুণ কদলীমঞ্জরী,—মুকুটশীর্ষে চণ্ডীর নির্ম্মাল্য ও স্বর্ণময় উত্তরীয়প্রান্তে মাতৃদত্ত একটি লেবু বাঁধা।

১ উৎসবকালে যে সকল বাজি পোড়ান হয়, তাহার নির্ম্মাতাদিগকে প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যুৎ-বাজিকর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ও লক্ষ্মীন্দর বেহুলাকে দেখিয়া মনে করিল, তাহারা হাতে চাঁদ পাইয়াছে। সেই শুভলগ্নের মুহূর্ত্তকালব্যাপী সুখ তাহারা দুর্লভ মনে করিল; একমুহূর্ত্তে যে সুখের আস্বাদন পাইল, তাহা ছাড়া জীবন মরু হইয়া যাইবে, অথচ মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সে আনন্দের কণাও তাহারা জানিত না। মুহূর্ত্তমধ্যে জীবনের একটা অধ্যায় আরম্ভ হইল, তাহা একেবারে নূতন।

অমলা জামাতাকে বরণ করিয়া লইলেন, সোণার প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া অমলা স্নেহপূর্ণ-দৃষ্টিতে জামাতার মুখখানি দেখিলেন। তাঁহার ছয়টি পুত্র ছিল, সেই দৃষ্টির সঙ্গে যেন লক্ষ্মীন্দর তাঁহার প্রিয়তম সপ্তম-পুত্রের স্থলে অভিষিক্ত হইল।

অমলার শয়নগৃহ অতি পরিপাটি, তাঁহার স্তম্ভের উর্দ্ধে ব্যাঘ্রমুখ—নৃত্যশীল শারিকাদের বিহারস্থান। গৃহের ছাদ আকাশস্পর্শী, গৃহটির নাম 'উদয়তারা'। উদয়তারাব ছাদের সঙ্গে সংলগ্ন, মণিমুক্তার ঝালর-বিশিষ্ট, মুক্তাশ্রেণীগ্রথিত শতদল ও বিবিধ পুষ্পপল্লবাঙ্কিত বিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; সেই চন্দ্রাতপের অধোভাগে হেমছত্র প্রসারিত ছিল,—তাহার নিম্নে রক্তপট্টবস্ত্রপরিহিত লক্ষ্মীন্দর পুষ্পমাল্য গলে পরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; বামভাগে বেহুলার স্বর্ণখচিত অঞ্চলাগ্র তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্তে আবদ্ধ ছিল। যখন লক্ষ্মীন্দর মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন্ সময় সহসা সেই হেমছত্র ভাঙ্গিয়া দম্পতির মাথায় পড়িল। বিবাহ-সভায় 'কি হইল?' 'কি হইল?' বলিয়া একটা পরিতাপ-সূচক কলরব উত্থিত হইল। অমলা বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সায়-বেণে সেই হেমছত্র পুনরায় সুদৃঢ় করিয়া উত্থিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিসাধু পুরললনাগণের কাতরোক্তি ও আক্ষেপ থামাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সভা হইতে একটু দূরে যাইয়া হিন্তালের যষ্টি হস্তে উন্নতদেহ তেজঃপুঞ্জ সদাগর দুইটি শঙ্কাপূর্ণ চক্ষু উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া মহেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। বিবাহান্তে চাঁদ-সদাগর সায়-বেণেকে বলিলেন, "আমি এখনই পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া চম্পকনগরে যাত্রা করিব।" বিবাহের রাত্রি কন্যার পিতৃগৃহে অতিবাহিত করাই বরের চিরাগত প্রথা। সায়-সদাগরের মাতুল বর্দ্ধমানের নীলাম্বর দাস ঘোর আপত্তি উত্থাপিত করিলেন; চাঁদ-সদাগরের খুল্লতাত লক্ষপতির জামাতা ধনপতিও চাঁদের এই প্রস্তাব বিধি-বিরুদ্ধ বলিয়া বাঁকিয়া বসিলেন! এদিকে অমলাপ্রমুখ নিছনি-নিবাসিনী রমণীকুল এই অনুচিত প্রস্তাবে বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

চাঁদ, বেহাইকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার করধারণপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ তাহার নয়ন হইতে অজস্র জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। সায়-বেণে তাঁহার এই ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন। চাঁদ বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "বেহাই! আমার দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু যে কষ্টে আমার চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইয়াছে তাহা সামান্য নহে। বিবাহের বাসরগৃহে আমার পুত্রের সর্পদংশনে জীবন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, দৈবজ্ঞেরা ইহাই গণিয়া বলিয়াছেন। আমার ছয়টি পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মনসার সঙ্গে আমার বাদবিসংবাদের কথা আপনারা অবগত আছেন। আমি চম্পকনগরের সীমান্তে সাঁতালী-পর্ব্বতে লৌহনির্ম্মিত সুদৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, অদ্য রজনী পুত্র ও

পুত্রবধূকে সেই গৃহে রাখিব। এই বিপদ কাটিয়া গেলে,' নখা বধূকে লইয়া এখানে আসিবে, এবং যত দিন আপনারা ইচ্ছা করিবেন, তত দিন থাকিয়া যাইবে, সে ত আপনাদের সন্তান হইল।"

সায়-বেণে দুঃখের সহিত বলিলেন—"আপনি এ সকল কথা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন কেন? এমন জানিলে কে এমন স্থলে তাহার দুহিতার সম্বন্ধ করিতে সম্মত হইত?"

৮

চাঁদ-সদাগর, পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সাঁতালী-পর্ব্বতে লৌহগৃহে রাখিলেন। স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় যষ্টি হস্তে সেই গৃহের শান্ত্রীদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া বিনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

সেই লৌহগৃহে প্রবেশ করিতে সহসা বেহুলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সহসা অসাবধান-হস্তক্ষেপে বেহুলা নিজের সীঁথির সিন্দূর মুছিয়া ফেলিলেন—আশঙ্কায় অশ্রুমুখী বেহুলা, জলভরা একখানি রৌদ্রদীপ্ত মেঘের ন্যায় রূপচ্ছটায় গৃহ আলোকিত করিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন। গৃহে আসিয়া কৌটা খুলিয়া নিজেই আবার সিন্দূর পরিলেন।

বেহুলা, দৈবজ্ঞের গণনার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, রঙ্গন-ফুলের মালাটি তাঁহার বক্ষের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া চন্দনদীপ্ত মূর্ত্তিকে বনদেবতার ন্যায় সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মালাটি যথাস্থলে বিন্যস্ত করিবার জন্য ভীরু বালিকা হস্ত প্রসারিত করিয়া যেমনই স্বামীদেহ স্পর্শ করিয়াছে, অমনই লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া

গেল—"আমার নয়নের তারা, প্রাণের প্রতিমা, একবার আমার বাহুবন্ধনে ধরা দাও," বলিয়া লক্ষ্মীন্দর তাহাকে নিকটে আসিতে বলিল। লজ্জাবতী দূরে সরিয়া গেল, সে ধরা দিল না; লক্ষ্মীন্দর পুনশ্চ ঘুমাইয়া পড়িল।

বিনিদ্রচক্ষে বসিয়া বেহুলা স্বামীর রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন; আবার লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিল; সে চাহিয়া দেখিল, একখানি স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছে। লক্ষ্মীন্দর বলিল, "দেখ, আমার বড় ক্ষুধাবোধ হইতেছে, আমায় যদি চারিটি ভাত রাঁধিয়া দিতে পার।"

এই বলিয়া লক্ষ্মীন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেহুলা এত রাত্রে সেই গৃহে কেমন করিয়া ভাত রাঁধিবেন! বরণ-ডালায় শুভঘট ছিল, তিনটা নারিকেল দিয়া উনন প্রস্তুত করিলেন, সেই শুভঘট নারিকেলের জলে পূর্ণ করিয়া, বরণডালার তণ্ডুল লইয়া তাহাতে পূরিলেন, স্বীয় স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্রের আঁচল ছিঁড়িয়া, উননে অগ্নি জ্বালিয়া বেহুলা ভাত রাঁধিতে লাগিলেন।

এদিকে, আকাশে এক নিবিড় মেঘগৃহে মনসাদেবী উপবিষ্ট হইয়া সর্পগণকে স্মরণ করিলেন। সেই গৃহের শীর্ষে একটা প্রকাণ্ড উল্কা-শিখা পতাকার ন্যায় ঊর্দ্ধে দুলিতেছিল। সর্পের অমূল্য মণিগুলি গৃহের সর্ব্বত্র ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মনসার আহ্বানে দিক্‌দিগন্ত হইতে সর্পসমূহ তথায় ছুটিয়া আসিল—তাহারা কেহ একশীর্ষ, কেহ বহুশীর্ষ, কাহারও দেহ চক্রাকৃতি বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত, কাহারও শরীর শুধু স্বর্ণরেখাময়। বিড়ঙ্গিণী, তক্ষক, বঙ্গদাড়া, শঙ্কর, তালভঙ্গ প্রভৃতি অসংখ্য সর্প তথায় উপস্থিত হইল, তাহাদের গতিতে মরুৎ মন্থর প্রতিপন্ন হইল, সংহারিকা শক্তি ও চাঞ্চল্যে বিদ্যুৎ পরাস্ত হইল।

লক্ষীন্দরকে দংশন করিতে কে যাইবে, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্পকুল মাথা হেঁট করিল। একটা কোপনস্বভাব রক্ত-চক্ষু সর্প বলিল, "সাঁতালী-পর্ব্বতে যে সকল তরুমূল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার গন্ধ দূর হইতে পাইয়া আমার হাঁপানি রোগ জন্মিয়াছে।" বিষদন্ত বিকাশ করিয়া ত্রিশীর্ষ মহিজঙ্গ বলিল, "ময়ূর ও নকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে কে? তাহাদের ভয়ে আমার মাতুল ভ্রাতারা বহুপুরুষের বাসস্থান সাঁতালী ছাড়িয়া নীলগিরিতে আশ্রয় লইয়াছে।" দংশক সর্প রোষাবিষ্ট চক্ষু আবর্ত্তন করিয়া বলিল, "চাঁদ-সদাগর জগতের যত রোঝা সাঁতালী-পর্ব্বতে জড় কারয়াছে, তাহারা যেখানে গর্ত্ত পায়, সেইখানেই মন্ত্র পড়ে ও তরুমূল নিক্ষেপ করে, অহিকুল গর্ত্তের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লৌহ-গৃহের একটা ছিদ্র আছে, কিন্তু যে-সকল শান্ত্রী পাহারা দিতেছে, তাহারা এক-এক জন চণ্ডু ও আফিম এক এক ভরি এক-এক বারে খাইয়া চক্ষু এমন রক্তবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাদিগকে দেখিলে আমাদেরই ভয় হয়, তাহাদের দাঁতে যে বিষ জন্মিয়াছে, তাহাতে আমাদেরই মৃত্যু হইতে পারে, অন্ততঃ আমাদের বিষে তাহাদের কিছু হইবার নয়। তাহারা মাথা নীচু করিয়া না কামড়াইলেও তাহাদের সঙ্গিনের খোঁচা খাইলে আমরা বাঁচিব না।"

মনসাদেবী পুনর্ব্বার বলিলেন—"আমি এ সকল ভীরুর বাক্য-কৌশল শুনিতে চাহি না, অহিকুলে কি এমন কেহ নাই, যে সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া লক্ষীন্দরের বাসর-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে দংশন করে? যে-সকল বিপদ পথে আছে, তাহা সকলেই অবগত, অশক্তগণের মুখে তাহা আমি শুনিতে চাহি না। যে বিপদে নির্ভীক, সেই অগ্রসর হউক।"

তখন ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজসর্প অগ্রসর হইল এবং

নীরবে দেবীর প্রসাদ-চিহ্ন পানে মাথা ঠেকাইয়া সাঁতালী-পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিল।

তখন বেহুলা-সতী অন্ন রন্ধন করিতেছিলেন; সেই কাল-রাত্রিতে চারিদিক হইতে কি একটা শব্দ শুনা যাইতেছিল, চাঁদ-বেণে গৃহের চারিদিক ঘুরিয়া মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, এ কি তাহারই প্রতিধ্বনি? সহসা বেহুলা দেখিলেন, লৌহের দেয়ালে একটা স্থানের লৌহপিণ্ড টুটিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে লৌহচূর্ণ খসিয়া পড়িতেছে; বলা বাহুল্য, সেগুলি কয়লার গুঁড়া। সেই ছিদ্র-পথে ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ প্রবেশ করিল। বেহুলা সোণার বাটীতে কাঁচা দুগ্ধ ও রামরম্ভা রাখিয়া সেই সর্পের সম্মুখে ধারণ করিলেন, আহারের লোভে বঙ্করাজ মাথা হেঁট করিয়া বাটীতে মুখ প্রবেশ করাইল—বেহুলা সোণার সাঁড়াশি দ্বারা তদবস্থায় সর্পকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে কালদন্ত সর্প এবং তৃতীয় প্রহর রাত্রে উদয়কাল সর্প সেই ভাবেই বন্দী হইল—শেষরাত্রে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ভাত খাইতে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীন্দর গভীর নিদ্রাভিভূত, কোন সাড়া দিল না।

সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তা ও শ্রমে উপবাসী বেহুলা ক্লান্ত হইয়াছিলেন। বন্দী সর্পত্রয়কে একটা বৃহৎ পাত্রদ্বারা চাপা রাখিয়া, বেহুলা স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষু দু'টি ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, এক একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি সেই রন্ধ্র-পথের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং ঘুমে হেলিয়া পড়িতেছেন; এমন সময় বায়ুগতি কালনাগিনী মনসাদেবীর তাড়া খাইয়া রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিল—সেই গৃহপ্রবেশ কালে হঠাৎ "কেও"—স্বরে কালনাগিনীর

অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—ক্ষণকাল সে নড়িল না। কে জানে কেন বিনিদ্র চাঁদ সেই সময়ে কোন গূঢ় অনিষ্টের আশঙ্কায় "কেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

কিছুকাল নিশ্চল থাকিয়া কালনাগিনী আবার চলিল, তখন বেহুলা ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়া স্বামীর পদ-পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নিদ্রিত ললাটে একটা দুশ্চিন্তার রেখা জাগিয়া আছে।

দ্রুত-গতিতে কালনাগিনী লক্ষ্মীন্দরের পদের সন্নিহিত হইল, এই সময়ে নিদ্রাবেশে-পাশ ফিরিতে যাইয়া, নখার পদ সর্পের দেহে আঘাত করিল, অমনই কালনাগিনী উদ্যত-ফণা হইয়া তাহাকে দংশন করিল, লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"জাগ ওহে বেহুলা সায়-বেণের ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি?"

বেহুলা শশব্যস্তে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন, কালনাগিনী দ্রুতগতিতে রন্ধ্র-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—অমনি কাটারি দ্বারা তাহার অষ্টাঙ্গুলি প্রমাণ পুচ্ছ কাটিয়া ফেলিলেন—পুচ্ছহীনা কালনাগিনী তড়িৎ-গতিতে পলাইয়া গেল।

তখন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে; সনকা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য সাঁতালী-পর্ব্বতে হৈমবতীর ন্যায় আশীষহস্তে দণ্ডায়মানা, ত্রিশূলধারী মহাদেবের ন্যায় সেই দ্বারদেশে হিন্তালের যষ্টি হস্তে ভানুকিরণোজ্জ্বল উন্নতকায় চন্দ্রধর চিত্রপটের ন্যায় স্থির। রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে :—চন্দ্রধর ভাবিতেছেন বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার বক্ষ কেন ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, নেত্রদ্বয় কেন ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে?

৯

এমন সময়ে সনকা সেই গৃহমধ্যে অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া ব্যাকুলা হইলেন, তাঁহার সঙ্গিনীগণ দ্বারে আঘাত করিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল—বেহুলা কালনাগিনীকে অনুসরণ করিয়া একবার দ্বার খুলিয়াছেন, তাহা আর বন্ধ করেন নাই।

বেহুলা কাঁদিতেছিলেন—

"অমৃত সমান প্রভুরে তোমার মুখের বাণী,
পুনরপি না শুনিলাম মুই অভাগিনী।
হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিব কঙ্কণ করিব চুর,
মুছিয়া ফেলিব আমি সীঁথির সিন্দুর।
এ হেন সুন্দর রূপ প্রভুরে প্রকাশিত রজনী,
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া রূপ প্রভু হরিল নাগিনী।
চাঁপার কলিকা সম প্রভুরে তোমার কোমল অঙ্গুলি,
তুমি আমার প্রভুরে
অভাগী বেহুলারে ডাক, চাহ চক্ষু মেলি।"

সকলে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামীর শব ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, আলুলায়িতকুন্তলে সিন্দুর-রঞ্জিত কপালে দেবীর ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছেন; তিনি যে অস্ফুটস্বরে রোদন করিতেছিলেন, তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করাতে সে রোদন থামিয়া গিয়াছে, কেবল সাক্ষীস্বরূপ একটি উজ্জ্বল অশ্রু গণ্ডের অর্দ্ধপথে লগ্ন হইয়াছে। সনকার সঙ্গিনীগণ বেহুলাকে গালি দিতে লাগিল। "খণ্ড-কপালিনী বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামীর জীবন নাশ করিলি। তোর সিঁথির প্রথম সিন্দুরবিন্দু ঘোচে নাই,

পট্টবস্ত্র মলিন হয় নাই, পদের আলতায় এখনও ধূলি পড়ে নাই, বাসর-রাত্রেই বংশের দীপ নিবাইলি।"

"খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরুণী দাঁতী
বিহাদিনে খালি পতি না পোহাইতে রাতি।"

সনকা পুত্রের বিবর্ণ বিষজর্জ্জরিত মুখমণ্ডল দেখিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় সেই স্থানে নিপতিত হইলেন। চাঁদ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

বেহুলা রমণীগুণের নিন্দা শোনেন নাই, তাঁহার মন সে দিকে ছিল না, জন্মের তরে স্বামী একটিবার তাহার অঙ্গস্পর্শ চাহিয়াছিলেন, জন্মের তরে একটিবার তাহার হাতের রাঁধা ভাত খাইতে চাহিয়াছিলেন, বেহুলা তাহাও দিতে পারেন নাই, সেই কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। রমণীগণ সত্যই বলিয়াছে, সে ত খণ্ডকপালিনী ও চিরুনদাঁতী, তাহা না হইলে এরূপ পোড়া-অদৃষ্ট কাহার হয়, বিবাহের রাত্রে স্বামীর মৃত্যু কাহার হইয়া থাকে! বেহুলার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে উদ্যত হইল, তিনি তাহা নিরোধ করিলেন।

একবার মাত্র চক্ষু তুলিয়া বেহুলা দেখিলেন, প্রৌঢ়া স্নেহ-বিহ্বলা মূর্চ্ছিতা সনকা দিবচ্যুতা কিন্নরীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া আছেন, এমন শাশুড়ীকে লইয়া তিনি আয়তি চিহ্ন ধারণ করিয়া একদিনও সংসার করিতে পারিলেন না!

"পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।
জ্ঞাতিগণ ধ'রে নিল গাঙ্গুড়ের কূল।"

বেহুলার আজ কোন লজ্জা নাই, তিনি স্বামীর শবের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। লখার জন্য পদ্ম-গন্ধি কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত হইল—বেহুলা সেই

চিতার পার্শ্বে যাইয়া বলিলেন, "যদি ইঁহাকে পোড়াইবে, তবে আমি ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে চিতায় প্রবেশ করিব। কিন্তু ইঁহাকে পোড়াইয়া কাজ নাই, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পোড়াইবার নিয়ম নাই, ইঁহাকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দাও, কি জানি যদি কোন রোঝার কৃপায় ইনি প্রাণ পান আর সেই ভেলায় আমি ইঁহার সঙ্গে যাব।"

সকলে বেহুলার কথা অনুমোদন করিল, বেহুলার সঙ্গে যাওয়ার কথাটা একটা কথার কথা মনে করিয়া, কেহ সে সম্বন্ধে কিছু বলিল না।

কিন্তু যখন ভেলা প্রস্তুত হইয়া গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিল, শব সেই ভেলায় রক্ষিত হইল, তখন পট্টাম্বর-ধারিণী সিন্দুরচন্দন-লিপ্ত-ললাট সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা সেই ভেলায় যাইয়া বসিলেন। সকলে দেখিয়া 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিল। যাহারা 'খণ্ডকপালিনী' 'চিরুন্‌দাঁতী' বলিয়া বেহুলাকে কত গালি দিয়াছিল, তাহারা আসিয়া হাতে ধরিয়া সাধিতে লাগিল। এমন বুদ্ধিশূন্যা বালিকা ত কেহ কখন দেখে নাই; বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা যাহারই স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহারাই ত বিধবা হইয়া গৃহে বাস করে; মৃত স্বামীকে বাঁচাইবে, এমন কথা কে শুনিয়াছে? তাহারা ধারাকুলনেত্রে বেহুলার মৃণালতুল্য কোমল কর ধরিয়া কত অনুনয় জানাইল—কিন্তু বেহুলা গাঙ্গুড়ের জলে নিশ্চল হইয়া ভেলায় বসিয়া রহিলেন। শোকে উন্মাদিনী ধূলিধূসরিতা সনকা কাঁদিতে কাঁদিতে গাঙ্গুড়ের কূলে আসিয়া বলিলেন—"হতভাগিনী শ্বশুরবাড়ীতে উপবাস করিয়া আসিয়াছিলে, সেখানে একবেলা একমুষ্টি ভাত খাইলে না, চল মা, আমার লখার শোক তোমার মুখ দেখিয়া জুড়াইতে চেষ্টা করিব।" কিন্তু বেহুলা সেই ভেলা হইতে নড়িলেন না।

তখন অপরাহ্ণ—চম্পক-নগরের লোক গাঙ্গুড়ের কূলে ধরে না, লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তাহাদের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত ও তাহারা গদগদকণ্ঠ ; তাহারা বলিতেছে, "বুদ্ধিহীনা তরুণী জননী, আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমার স্বামী নাই, কিন্তু চম্পকবাসী আমরা তোমার সন্তান, আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইও না।" সনকা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতেছেন, "আমার সাবিত্রী, ঘরে ফিরিয়া এস, আমি লখার শোক তোমাকে দেখিয়া ভুলিব।" গ্রামান্তর হইতে লোকেরা আসিয়া দেখিতেছে—স্বামীর শবের পার্শ্বে স্থিরসৌদামিনীর মত সাধ্বী বসিয়া আছেন, গাঙ্গুড়ের জলে ভেলা ভাসিয়া যাইতেছে, লোকে বলিতেছে, "আমরা সীতা সাবিত্রীর কথা পুরাণে শুনিয়াছি। ঐ দেখ, তাঁদের একজন চম্পক-নগরে প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।"

গাঙ্গুড়ের তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া ভাসিয়া ভেলাখানি যাইতেছে ; বেহুলা ভাবিতেছেন, যে দেশে মৃত্যু নাই, সেই দেশ হইতে তিনি স্বামীর জীবন আনয়ন করিবেন।

শোকোন্মত্তা মাতা সনকা কোনক্রমেই নদীতীর ছাড়েন না, ধূলায় পড়িয়া আছাড়ি পাছাড়ি খাইতে লাগিলেন। বেহুলা ডাকিয়া বলিলেন, "বাসর-ঘরে কড়ার তেলে দীপ জ্বলিতেছে, সেই কক্ষটি অর্গল-বদ্ধ করিয়া রাখিবেন। আমার স্বামীর প্রাণ উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিব, সে দীপ নিবে নাই। বাসর-ঘরে হেম থালায় যে ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছি, তাহা দাড়িম গাছের নীচে পুঁতিয়া রাখিবেন।" চারিদিক হইতে শত শত শোকার্ত্ত নর নারী বেহুলাকে ডাকিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "মা, তোমার মুখ দেখিয়া আমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, —অভাগিনী মা ফিরিয়া এস।" বেহুলা সজলনেত্রে যুক্তকরে এই মাত্র

বলিলেন, "তোমরা আশীর্ব্বাদ করিও যেন আমি স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারি।"

দেখিতে দেখিতে বেহুলা, শব ও ভেলা নদীর তরঙ্গে সুদূরে চলিয়া গেল।

এই মহাশোক-কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। একাকিনী অবোধ বালিকা মকর-কুম্ভীর-সঙ্কুল নদীতরঙ্গে স্বামীর শব লইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। যাহারা এ দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহারা এ কথা কাঁদিতে কাঁদিতে অপর সকলকে বলিল; যাহারা শুনিল, তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইল। চম্পক-নগরবাসীরা সেই গাঙ্গুড়-নদীর জল গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্র মনে করিল—এই নদী দিয়া সতীলক্ষ্মী ভাসিয়া গিয়াছেন, সেই নদীর তীরের মৃত্তিকা তাহারা পবিত্র-জ্ঞানে পুঁটুলিতে বাঁধিয়া দেব-বিগ্রহের সঙ্গে এক স্থানে রাখিয়া দিল।

সনকা লখা ও পুত্রবধূর কথা মনে করিয়া দিনরাত্রি মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সদাগরও গৃহে একটি বার পদার্পণ করেন না। সকলে বলিত, সদাগর পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে সনকা এ কথা শুনিলে আবার মূর্চ্ছিতা হইতেন।

১০

কিন্তু সদাগর পাগল হন নাই। রক্ত পট্টবস্ত্র পরিয়া রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিয়া, সদাগর সাঁতালী-পর্ব্বতের বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। সন্ধ্যাকালে যখন পর্ব্বতের বন্ধুর শীর্ষ ভেদ করিয়া ছিন্নভিন্ন মেঘপংক্তি

উড্ডীন হইত, তখন তিনি মনে করিতেন, উহা ত্র্যম্বকের বিশাল জটাজুট। গাঙ্গুড় নদীর তরঙ্গাভিহত গিরির পাদমূল দেখিয়া তাঁহার মনে হইত, বিরাট নগ্নকায় মহেশ্বরের জটা হইতে শুভ্র গঙ্গাধারা অবতরণ করিতেছে। কখনও বাপীনীরে ফুল্লারবিন্দ দর্শনে তিনি মনে করিতেন, হরের ত্রিনেত্র নির্ম্মল জলে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কখনও নিশাকালে পর্ব্বতের শীর্ষ হইতে শশিলেখা উদিত দেখিয়া তিনি জটাজুটমণ্ডিত চন্দ্রচূড়ভ্রমে সেই গিরিকে অসংখ্যবার প্রণিপাত করিতেন। নিশাশেষে ম্লান নক্ষত্রপংক্তি সেই গিরিশীর্ষ বেষ্টন করিয়া শোভা পাইত, কখনও তিনি তাহাদিগকে হরাঙ্গশোভী রুদ্রাক্ষ মনে করিতেন, কখনও-বা শিবদেহের শুভ্র ভস্মচিহ্ন ভাবিয়া, ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে শঙ্কর-স্তবমালা পাঠ করিতেন। কখনও গাঙ্গুড়ের অস্ফুটশব্দে চমৎকৃত হইয়া তিনি তন্মধ্যে হরমুখোচ্চারিত "ওঙ্কারে"র আভাস পাইতেন। দিবারাত্রি তিনি এইভাবে শিবধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন।

শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে হইত যেন "আমার নখা কোথায় ?" বলিয়া কেহ চীৎকার করিতেছে,—সেই তীব্র চীৎকার করিয়া যেন কাহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আর কথা না বলিতে পারিয়া শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রাণভেদী যাতনায় সে ছটফট করিতেছে। মুহ্যমান সদাগর সেই আর্ত্ত-স্বর ও নিশ্বাস-পতনশব্দ-কল্পনায় বিচলিত হইয়া স্বগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন,—তখন তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিত।

কখনও শিবমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিতেন, যেন কোন উন্মাদিনী রমণী প্রাণপ্রতিম কাহাকেও বক্ষে লইয়া অকূল নদীতরঙ্গে ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছে ; "ইহারা কে ?" সদাগরের তাহা নির্ণয়

করিতে মুহূর্ত্ত কাল চলিয়া যাইত, সেই মুহূর্ত্ত পরে আবার তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইত। পুনরায় আত্মস্থ হইয়া সদাগর শঙ্করস্তব পাঠ করিতেন, তখন উচ্চকণ্ঠোচ্চারিত 'হর' 'হর' শব্দে সেই পাহাড় কাঁপিয়া উঠিত।

১১

এদিকে নিছনিনগরে সংবাদ পৌঁছিল, গাঙ্গুড়-নদীতে বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছে। সায়-বেণের বাড়ীতে এ কথা কেহ বলিল না; কিন্তু অমলার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহে বসিয়া একটা কাক কর্কশকণ্ঠে ডাকিতে থাকে, অমলা মনে ভাবেন, কাক কি দুঃখের কথা বলিতেছে; বেহুলার কথা মনে হইলে দরবিগলিত ধারায় তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া যায়, "তবে কি আমার বেহুলার কোন অমঙ্গল হইল?"

কিন্তু একদিন কে বলিয়া গেল, বেহুলার সংবাদ ভাল নহে, তোমরা লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লও। এই কথায় অমলা উতলা হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিসাধু তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা সুবল ও শ্রীরাম সাধুকে লইয়া চম্পকনগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বিবিধ মিষ্টান্ন, বিচিত্র পরিচ্ছদ ও অপরাপর উপঢৌকন লইয়া গাঙ্গুড়ের তীরপথে যাইতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে শত শত লোক বলিতে লাগিল, "তোমাদের সাধের কাঞ্চন-প্রতিমা বেহুলা, মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে।"

শুনিয়া তিন ভ্রাতার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিতে পাইলেন, সজলনয়না বেহুলা কলার

মান্দাসে বসিয়া মৃত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ভেলা একবার জলে ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে; উপবাসশীর্ণা শোকময়ীর সেদিকে দৃক্‌পাত নাই; তাঁহার ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু—আর্দ্র বসনখানি বায়ু-হিল্লোলে উড়িতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে কত কুম্ভীর সেই মৃতদেহ গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, বেহুলার করসঞ্চালিত জলহিল্লোলে তাহারা দূরে সরিয়া যাইতেছে, অবিরল অশ্রুজলে বেহুলার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইতেছে।

হরিসাধু ডাকিয়া বলিলেন, "ভগিনি, তোমার এ দশা কেন? অপ্সরার ন্যায় এত সাজসজ্জা করিয়া দুই দিন হইল তোমাকে পতিগৃহে পাঠাইলাম, তোমার এ দশা কে করিল?" বলিতে বলিতে হরিসাধু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

বেহুলা কথা না কহিয়া শুধু কপালে হাত দিয়া দেখাইলেন: শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার দু'টি চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে হরিসাধু বলিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে, এখন লখাইকে লইয়া ভেলা এইখানে লাগাও, অগুরু ও চন্দনকাষ্ঠের চিতায় সযত্নে লখাই-এর সৎকার করিব। শব লইয়া জলে ভাসিবার তাৎপর্য্য কি? বুদ্ধিহীন চাঁদ-সদাগর মৃতের সঙ্গে জীবিতকেও জলে ভাসাইয়া দিয়াছে, চম্পকনগরের লোক কি নির্ম্মম! তোমাকে জীবন থাকিতে আর আমরা সেখানে যাইতে দিব না।"

বেহুলা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল, "এই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতে পারিলে দেশে ফিরিয়া আসিব, স্বামীর যে গতি, আমারও তাহাই।"

তীরের লোকেরা বেহুলার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিসাধু

পুনরায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "তুমি পিতৃগৃহে ফিরিয়া এস, ঘরের প্রধানা হইয়া থাকিবে। তুমি মাতার নয়ন-পুত্তলী,—সাত নহ, পাঁচ নহ, আমাদের বড় যত্নের একমাত্র ভগিনী, তোমাকে শাঁখা পরাইতে পারিব না, কিন্তু মূল্যবান্ সুবর্ণের চুড়ী পরাইব ; সিন্দুরের পরিবর্ত্তে কপালে ফাগের গুঁড়া পরিবে ; মৎস্য মাংস ছাড়িবে, কিন্তু অপর নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তোমাকে আনিয়া দিব,—ভেলায় অকূলে ঝাঁপ দিয়াছ, এখনই হাঙ্গর কুম্ভীর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে ; পথে দুষ্ট লোকে তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে,—তুমি নিরুপমা সুন্দরী।"

বেহুলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা! তোমরা ফিরিয়া যাও, —আমি নিরামিষ হাঁড়ি প্রতিদিন ফেলিবার জন্য তোমাদের গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। মাকে বলিও, যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার সঙ্গেই আছি, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না। চাঁপাগাছের নীচে ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য পুঁতিয়া রাখ, যদি স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাই, তবে আমরা আসিয়া খাইব। তীরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন?" বেহুলার চক্ষু দিয়া পুনরায় টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ভেলা সে স্থান অতিক্রম করিয়া গেল।

১২

ও কে যায়! গাঙ্গুড়ের জলে ভেলায় ভাসিয়া মৃত স্বামীকে অঙ্কে রাখিয়া কে যায়! জীবন-সঙ্গিনী অনেক দেখিয়াছ, মরণ-সঙ্গিনীকে একবার দেখ। সধবার মাথায় সিন্দুর অনেক দেখিয়াছ, বিধবার

মাথায় সিন্দুর দেখিয়া যাও। এই ঘোর নদী-জল—প্রভাতের তরুণ সূর্য্য সেই সিন্দুর-বিন্দু উজ্জ্বল করিতেছে ; এই ঘোর নদীজল—সন্ধ্যার আঁধারে নক্ষত্রের ম্লান জ্যোতিতে বেহুলার দেহ ঈষদ্ভাসিত হইতেছে।

বাঁঘের বাঁকে পোঁছিয়া শব পচিতে আরম্ভ করিল ; সেই সুন্দর দেহ গলিত হইয়া গেল—কৃমিকীটে তাহা বেড়িয়া ধরিল। বেহুলা এক মনে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই কৃমিকীট ছাড়াইতে থাকিতেন, এবং নদী-তীরে যেখানে মনসার মন্দির পাইতেন, সেইখানে পূজা দিয়া আসিতেন,—পূজার উপকরণ শুধু নয়নজল।

গোদার ঘাটে এক কৈবর্ত্ত মাছ ধরিত ; তাহার দুই পায়ে গোদ, দুই কানে রামকড়ি ও গলায় শঙ্খের মালা ; আশেপাশে জালের দড়ি ও বড়শী ; সে বেহুলার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল,—তাহার ঘরে চারি পত্নী, তাহারা খাসা গুয়া ও সাঁচিপান খাইয়া সুখে ঘর করিত। গোদা, বেহুলাকে প্রধানা পত্নী করিবে—এই ভরসা দিয়া আহ্বান করিল। বেহুলা মান্দাসে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। দেখিয়া গোদা তাহাকে ধরিবার জন্য নদীজলে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—কিন্তু বেহুলার দৃষ্টিমাত্র একটা প্রবল তরঙ্গ গোদাকে কোন্ দিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল!

নৌকা বাহিয়া ধনা মনা ভ্রাতৃদ্বয় যাইতেছিল। তাহারা উভয়ে বেহুলাকে দেখিয়া পাগল হইল ; কে বেহুলাকে লইবে, এই কথায় তর্ক করিয়া, দুই জনে ঘোর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। নৌকার উপর মারামারি করিয়া তাহারা নৌকা-সহ উল্‌টিয়া জলে পড়িয়া গেল।

এক বৈদ্য-রাজ লক্ষীন্দরের প্রাণ উদ্ধার করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা দিলেন ; বেহুলা তাহার অশিষ্ট চক্ষুভঙ্গী দেখিয়া, মান্দাসে ভাসিয়া চলিয়া গেলেন। এই অবস্থায়ও লোকের রহস্যের ইচ্ছা হয়, ভাবিয়া

তাঁহার দুই চক্ষে অবিরত জল পড়িতে লাগিল এবং সেই গলিত শব হইতে দিবারাত্রি মাছি তাড়াইয়া, বেহুলা ক্রমাগত দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শবে মাছিতা পড়িল; এক জায়গায় মাছিতা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, অপর জায়গায় মাছিতা পড়া আরম্ভ হয়, এবং মাংস ক্রমাগত পচিয়া জলে পড়িতে লাগিল।

এই পূতি-গন্ধ শব লইয়া বেহুলা কোথায় যাইতেছেন, তিনি তাহা জানিতেন না। যে তপস্যায় পুনর্জীবন দেওয়া যায়, তাঁহার হৃদয়ে সেই তপস্যার সঞ্চয় হইতেছিল। কে কি ভাবে কোথা হইতে তাঁহার স্বামীর জীবন দিবেন, তিনি জানিতেন না; কিন্তু যতই কষ্ট সহিতে লাগিলেন, ততই মনে হইতে লাগিল, কেহ অভয়-বাণী দিতে আসিতেছেন। তিনি যত দুঃখ সহ্য করিতেছেন, তাহা অন্তর্যামী দেবতা জানেন—তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না।

এই সময় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ভেলাখানি একেবারে পচিয়া গেল, বাঁশগুলি খুলিতে আরম্ভ করিল। জলের উপর কি করিয়া থাকিবেন? গলিত শব বক্ষে জড়াইয়া এই বিপদে বেহুলা বিষহরিদেবীকে স্মরণ করিলেন। আর এক জনের কথা মনে হওয়াতে তখন সহসা শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল—যে মূর্ত্তি একবার দেখিয়া বেহুলা ভুলিতে পারেন নাই, লক্ষীন্দরের চন্দ্রমুখের আভাস যাঁহার প্রৌঢ়-মুখে তিনি দেখিয়াছিলেন, আজ এই দুঃখের সময় কে জানে কেন, সেই সনকাকে মনে পড়িতে লাগিল। এই সময় কে যেন সহসা অদৃশ্যভাবে তাঁহার ভেলা নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়া গেল। বেহুলা ডুবিবেন, এমন সময় দেখিলেন, পদ্মগন্ধি কদলী-তরুখণ্ডে ভেলা নূতন হইয়া গিয়াছে।

তিন চার দিন পরে বেহুলার ভেলা আসিয়া কোনও ঘাটে লাগে ; তখন নানা খাদ্যদ্রব্য লইয়া গৃহস্থগণ আসিয়া তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করেন ; বেহুলা স্নানান্তে সামান্য কিছু ফল খাইয়া, দর্শকগণের নিকট যুক্তকরে কাঁদিয়া প্রার্থনা করেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীকে যেন বাঁচাইতে পারি।" স্বামী কোথায়? ঈষৎ গলিত-মাংসাবৃত কঙ্কাল দেখিয়া সকলে অশ্রুবিগলিত চক্ষে বলেন, "আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাইবে।" এই কথা বলিয়া তাঁহাদের গণ্ডও নয়ন-জলে ভাসিয়া যায়।

ইহার মধ্যে একদিন—

"ধরিয়া মড়ার গায়ে হানে এক জোঁক।
দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায় বড় শোক॥
ছাড়াইলে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥
অবিরত অশ্রুজল নিবারিতে নারি।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলাসুন্দরী॥"

সেইখানে—

"পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগতমোহিনী কেন মড়া লৈয়া কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে॥"

১৩

এই ভাবে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। লখাই-এর কয়েকখানি হাড়মাত্র অবশিষ্ট; বেহুলা উপবাসে ও অকথ্য কষ্টে শীর্ণা বিবর্ণা হইয়া পড়িয়াছেন; এ আর সে "চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা"—প্রফুল্লমুখী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের ডালি বেহুলা নহেন, তাঁহার মাতা অমলাও আর তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। ক্ষীণ-দেহ বাতাঘাতে-তরঙ্গাঘাতে সতত ক্লিষ্ট। সে মুখের মধুর হাসি—যাহা নিছনিনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুসুমতুল্য ছিল, তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, আছে শুধু জ্যোতিঃ—খর পুণ্যের জ্যোতিঃ—সাধুরা তাহা চিনিতে পারিতেন, সেই অতিক্ষীণ কান্তিতে একটা জ্বলন্ত সূর্য্যের প্রভা ছিল—তাহা স্বর্গীয়।

প্রায় ছয় মাস অতীত হইতে চলিল। একদিন সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়াছে। নিবিড় অন্ধকার নদীবক্ষে বিকট তরঙ্গ আশ্রয় করিয়া যেন পৈশাচিক গান গাহিতেছে। জলজন্তুরা ভেলার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। বেহুলা স্বামীর কঙ্কাল লইয়া চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া আছেন। বাতাস যেন কি উৎকট শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, বেহুলা জলে কি স্থলে আছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; আকাশ কোন্ দিকে, নদী কোন্‌দিকে, কোন্ দিক হইতে বাতাস বহিতেছে, আঁধার কোন্ দিক হইতে নামিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তারা নাই, চন্দ্র নাই, কোনও নৌকার দীপশিখাটি পর্য্যন্ত নাই, শুধু কে যেন ফণিরাজ্যের ন্যায় তাঁহাকে বহন করিয়া গর্জ্জন করিতেছে—এ কি নদী? এই নিবিড় রজনীতে বেহুলা শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে, "মৃতদেহ কি প্রাণ পায়?—বেহুলা! তুমি বাতুলতা ছাড়িয়া ঘরে যাও।"

এই কথার পর চারিদিক হইতে একটা বিকট অট্টহাস্য হইল; বেহুলা নির্ভীকভাবে স্বামীর কঙ্কালকে দৃঢ়তর আলিঙ্গনে বক্ষে ধারণ করিলেন—সেই বিকট ধ্বনি থামিয়া গেল। সহসা মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে এক নাট্যশালার দৃশ্য বেহুলার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল—অসংখ্য নরনারী একত্র হইয়া আনন্দোৎসব করিতেছে। তাহাদের মধ্যে গন্ধর্ব্বের মত সুপুরুষগণ বেহুলাকে ডাকিয়া বলিতেছে, "বেহুলা, ছিঃ! মৃতের কঙ্কালটা ফেলিয়া এস, সুবাসিত জলে স্নান করিয়া, অঙ্গ-মার্জ্জনা-পূর্ব্বক দিব্য পুষ্পমাল্য, নানা পরিচ্ছদ ও আভরণ পরিয়া এখানে এস; রমণীর যৌবন অস্থায়ী, তাহা একবার গেলে, নদীর স্রোতের ন্যায় আর ফিরিয়া আসিবে না। এস আমরা রসালাপে ও বিচিত্র সুখভোগে জীবন যাপন করি।" বেহুলা দেখিলেন—তাহারা প্রত্যক্ষ, ইহা স্বপ্ন নহে, গন্ধর্ব্বযুবকগণের স্বর সুস্পষ্টভাবে কর্ণে আসিতেছে, তাহাদের রূপ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সুস্পষ্ট—বেহুলা ঘৃণায় চক্ষু মুদিত করিয়া কর্ণকুহর বদ্ধ করিলেন, এবং লখাইয়ের কঙ্কালকে দৃঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, উহাই একমাত্র আশ্রয়ের ন্যায় বক্ষে গ্রহণ করিলেন। গন্ধর্ব্বপুরী দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল। তখন ভয়ানক শীত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, এবং রোমাঞ্চিত ও জর্জ্জরিত হইতেছে; পঞ্চপ্রাণ শীতাধিক্যে শিহরিয়া উঠিতেছে; বাতাস শাণিত ছুরির ন্যায় গাত্র বিদ্ধ করিতেছে। বেহুলা দেখিলেন, অতি সুকোমল উষ্ণ শয্যায় বসিয়া এক পরম রূপবান্ যুবক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। বেহুলা ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং শীতনিবারণার্থ শীতল লখাই-এর কঙ্কাল আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন—শীতের সঙ্গে সেই দৃশ্য তিরোহিত হইল। সহসা বেহুলা শুনিলেন, ফেরু ও ব্যাঘ্রদল চীৎকার করিয়া তাঁহাকে

বলিতেছে, "ঐ হাড় কয়খানি দাও, আমরা চিবাইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করি, উহা দ্বারা তোমার কোন কাজই হইবে না, তোমার দয়ার শরীর—আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না।" বেহুলা সভয়ে কঙ্কালগুলি বক্ষে রাখিয়া, স্বীয় জীর্ণ শরীর দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া, ভেলায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ব্যাঘ্র ও ফেরুপাল চলিয়া গেল।

তৃতীয় প্রহর রাত্রে বেহুলা তাঁহার মাতা অমলাকে দেখিতে পাইলেন। শরীর ক্ষীণ, ধূলিলুণ্ঠিত, চক্ষে দর দর বারিধারা, "আমার নয়ন-মণি বেহুলা, আয়—নিছনি গ্রামে তোর পিতা সায়-সদাগরের দশা দেখিয়া যা"—বলিয়া হতভাগিনী চীৎকার করিতেছে; গাঙ্গুড়ের জলে কোন ভেলা দেখিলে, পাগলিনীর ন্যায় অমলা তাহা ধরিতে যায়, চম্পক-নগরের কোন লোক আসিলে, তাহার পদতলে পড়িয়া মাথা কুটিতে থাকে। কদলীবৃক্ষ দেখিলে শিহরিত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়; কেবল বলে, "আমার বেহুলা, বক্ষে আয়।" অনশনে ও হা-হুতাশ করিয়া, তাঁহার সোনার অঙ্গ ম্লান হইয়া গিয়াছে, যাঁহার জন্য বিশ্বের লোক ঝুরিয়া মরিতেছে—তাঁহার হতভাগিনী মাতা কি করিয়া প্রাণধারণ করিবে?—"একবার আমার গৃহের রাণী গৃহে আয়" বলিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া, অমলা আসিয়া বেহুলার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত। "মৃতদেহে কে কবে জীবন দিয়াছে? আমার দেহে জীবন থাকে না—একবার জীবন দিয়া যাও," বলিয়া অমলা তাঁহাকে ধরিতে আসিলেন। মাতাকে দেখিয়া বেহুলার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, "মা! আমি যাব না, আমি যেতে পারিব না," বলিয়া বেহুলা সেই কঙ্কালগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অমলা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

তখন বেহুলা 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতেছেন—"কৈ মা কোথায় আছ,

অনাথিনীকে ধর, দেখ, আমার হাতে বল নাই, পায়ে বল নাই, দেহে বল নাই—আমার বড় কষ্টের ধন স্বামীর দেহাবশেষ আমি আর রাখিতে পারিতেছি না ; আমার দেহের ছিন্ন পট্টবস্ত্র উড়িয়া গলিয়া গেল, মা, আমি লজ্জা রক্ষা করিতে পারিলাম না, আমি বড় দুঃখ সহিয়াছি, মা—তুমি যদি দুঃখ দাও, কে তাহা ঘুচাইবে !—আমি সেই দুঃখকে মাথায় করিয়া লইলাম—আমার বল, সাহস কিছুই নাই—মা বিষহরি ! দীনা দুহিতাকে কোলে তুলিয়া লও।”

তখন অপূর্ব্বরূপচ্ছটায় আকাশের পূর্ব্বপ্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ; কে যেন বেহুলার হস্তে এক অমৃত ভাণ্ড আনিয়া দিল। সেই অমৃত ভাণ্ড হস্তে পাওয়ায় বেহুলার নষ্ট রূপ ফিরিয়া আসিল, তাঁহার ছিন্ন পট্টবস্ত্র নবশ্রী-শোভিত হইল, বেহুলার হৃদয়ে অপূর্ব্ব সাহস হইল। তিনি অন্তরের অন্তর হইতে বুঝিলেন, তাঁহার স্বামী বাঁচিয়া উঠিবে। কে বুঝাইল, কি ভাবে বুঝিলেন, বেহুলা তাহা জানিলেন না, কিন্তু তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন।

সহসা বেহুলার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে পড়িল। তিনি দেখিলেন, গত সাতজন্ম তিনি চিতানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, অরুণোজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিয়া দিব্য সিন্দূর-রাগ-দীপ্ত-ললাটে তিনি স্বামীর সঙ্গে সাতবার দগ্ধ হইয়াছেন। প্রতিবারেই তিনি বিবাহের রাত্রে স্বামীকে হারাইয়াছেন, সুখের সংসার পাতিবেন বলিয়া বিবাহের রাত্রে কত আনন্দ! সেই রাত্রেই বিধবা হইয়া পরদিন স্বামীর সঙ্গে চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছেন। সেই পুণ্যে এ জন্মে তিনি স্বামীকে ছাড়েন নাই, স্বামী লাভের জন্য সেই পুণ্যে তিনি মৃত্যুর দ্বারদেশে আসিতে সাহস করিয়াছেন। এবার তিনি স্বামীকে পাইবেন, প্রতিবাদী বিধাতা এবার তাঁহার সুকঠোর

তপস্যায় প্রীত হইয়াছেন ; বেহুলা যেন নখাগ্রে অতীত জন্মের দৃশ্যগুলি দেখিলেন।

১৪

উৎকট রজনী প্রভাত হইয়া গেল। বেহুলা দেখিলেন, নেতা-ধোপানী ঘাটে কাপড় কাচিতেছে। বেহুলার ভেলা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই ঘাটে লাগিল।

নেতা-ধোপানীকে দেখিয়া বেহুলার বোধ হইল, এ রমণী শরীরধারী হইলেও অশরীরী কোনও দেবী।

বেহুলা ভাবিলেন, যে দেশে মৃত্যু নাই, এ রমণী সেই সন্ধান জানে ; নতুবা ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় এরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে কেন ?

সমস্ত দিন বেহুলা ঘাটে ভেলা লাগাইয়া, নেতা-ধোপানীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নেতা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

প্রাতে নেতার একটা দুষ্ট বালক কাপড় কাচিবার সময় তাহাকে বিরক্ত করাতে, সে গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া কাপড় কাচিবার পাটের পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

সেদিকে আর সে দৃষ্টিপাতও করে নাই ; সমস্ত দিন কাপড় কাচিয়াছে, তাহার পিটুনিতে কাপড়গুলি অমল শশধরের ন্যায় ধবলউজ্জ্বল হইয়াছে ; বেহুলা তেমন শুভ্র যূথিকাতুল্য ধৌত বসন আর দেখেন নাই।

সন্ধ্যাবেলা সেই মৃত শিশুটির অঙ্গে কয়েক বিন্দু জল ছড়াইয়া নেতা তাহাকে বাঁচাইল ! বালক নিদ্রোত্থিতের ন্যায় মুখে এক রাশি হাসি লইয়া উঠিল।

তখন লীলাময়ী নেতা কাপড়ের স্তূপ মাথায় লইয়া, একহস্তে বালকের করধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে অপূর্ব্ব রূপের হিল্লোল তুলিয়া, নেতা বায়ু পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। তড়িৎ যেমন করিয়া চলিয়া যায়, নেতা-ধোপানী সেই ভাবে চলিয়া গেল।

বেহুলা সারারাত্রি ভেলায় বসিয়া ভাবিলেন—'এ কি স্বপ্ন দেখিলাম ?'

পরদিন ঘাটে আবার নেতা-ধোপানী উপস্থিত হইল। বালকটিকে পূর্ব্বদিনের মত সে মারিয়া শোয়াইয়া রাখিল, এবং সন্ধ্যাকালে কাপড় কাচা শেষ করিয়া, পূর্ব্ববৎ তাহাকে প্রাণদান করিল। কিন্তু যখন যূথিকা-শুভ্র বস্ত্র নিবিড় মেঘোপম কৃষ্ণকেশগুচ্ছের উপর স্থাপন করিয়া এক হস্তে বালকের করধারণপূর্ব্বক অপর হস্তে জানুনিম্নাবলম্বী পরিধেয় শাটীর অঞ্চল আকুঞ্চিত করিয়া রূপ-লতা আকাশে উত্থিত হইবে, সেই সময় বেহুলা একটা ছিন্নবৃন্ত ফুলের ন্যায় তাঁহার পদমূলে যাইয়া পড়িলেন।

নেতা সরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"এমন স্বামি-পাগ্‌লা মেয়ে ত কোথাও দেখি নাই। স্বামী বাঁচাইবে ত আমার সঙ্গে স্বর্গে চল, মহেশ্বর তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।"

এত শীঘ্র যে নেতা-ধোপানী এমন অমৃততুল্য কথা বলিবে, বেহুলা তাহা জানিতেন না। বেহুলার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। নেতা আদরে তাঁহার চক্ষুজল মোছাইয়া, নানা স্নেহ-মধুর কথা বলিলেন, যেন তিনি বেহুলার কত দিনের পরিচিত, কত অন্তরঙ্গ—সেই স্নেহ পাইয়া বেহুলার অশ্রু-গঙ্গা ছুটিল, তাঁহার প্রতি অশ্রুবিন্দুতে নেতা তাহার কষ্টের কথার ইতিহাস বুঝিতে পারিলেন।

স্বর্গে দেব-সভায় নেতা বেহুলাকে লইয়া গেলেন। সেখানে সূর্য্যতুল্য

এক উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া, অম্লান পারিজাত কুসুমের মাল্য-কণ্ঠে ইন্দ্র বসিয়াছিলেন—তাঁহার সহস্র চক্ষু নিস্পন্দ হইয়া বেহুলার উপর পতিত হইল। ইন্দ্রের সিংহাসন হইতে ঊর্দ্ধে রক্তবর্ণ পট্ট-বস্ত্র-পরিহিত, রক্তমাণিক্যের হার কণ্ঠে, রক্ত উত্তরীয়শোভিত, রক্ত-বর্ণ দেহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যোগিবরের ন্যায় হংস-রথে আরূঢ় ছিলেন; তাঁহার অষ্টচক্ষু কৌতূহল পরবশ হইয়া বেহুলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তদূর্দ্ধে কৈলাসের রত্নময় মণি-প্রাসাদ, তাহার কক্ষে কক্ষে বিশ্বের শ্রেষ্ঠরত্নভাণ্ডার রক্ষিত, কুবের সেই ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক, স্বয়ং অন্নপূর্ণা স্বর্ণপাত্রে বিশ্বের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য অমৃত-তুল্য খাদ্য পরিবেশনে নিযুক্তা। এত ধন, এত দৌলত, এরূপ মণিময় পুরী যাঁর—না জানি তাঁহার যান-বাহনের কি ঘটা! কিন্তু এ কি! গৃহ-স্বামী দিগম্বর, ভাঙ ধতুরা খান, শ্মশানের চিতায় শুইয়া থাকেন, ছাইভস্ম মাখেন ও ভিক্ষা করিয়া উদর তৃপ্তি করেন; এজন্য অপর দেবতারা যাঁহার কণিকা প্রসাদ পাইলেই তৃপ্ত, সেই ভগবান্ বিষ্ণু, হরের সহিত একাঙ্গ হইয়া আছেন, তাঁহার প্রদত্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য মহাদেব তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন, এজন্য হরি হরকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বন্ধু বলিয়া দেহে সম্মিলিত হইয়া আছেন। হরের ললাটের অগ্নি মৃদুরশ্মি হইয়া বেহুলার উপর নিপতিত হইল।

অপরাপর দেবতাদের বেশভূষা ও দিব্যকান্তি দেখিয়া, বেহুলা বিস্মিত হইলেন।

১৮

বেহুলা প্রণামপূর্ব্বক, গললগ্নীকৃত-পট্টবস্ত্র হইয়া দেবসভায় দণ্ডায়মান হইলেন। দেবগণ বলিলেন "বেহুলা, আমরা তোমার স্বামি-ভক্তি ও তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, তুমি নর্ত্তকী শ্রেষ্ঠা, একবার আমাদিগকে নর্ত্তন করিয়া দেখাও।"

একি নিষ্ঠুর—এ কি বিসদৃশ আজ্ঞা! এই কি নাচিবার সময়! কিন্তু দেবতাদের আদেশ : বেহুলা উত্তর না করিয়া নাচিতে লাগিলেন।

বেহুলার সমস্ত শোক ও দুঃখ সেই নর্ত্তন-ভঙ্গীকে কোমল-করুণ করিয়া দিল, তাঁহার লাস্যে, তাঁহার হাস্যে,—তাঁহার কর-ভঙ্গীতে গভীর মনোবেদনা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, কারুণ্যের উৎস সঞ্চার করিয়া দিল; তাঁহার প্রতিপাদক্ষেপে দেবচক্ষে অশ্রু দেখা যাইতে লাগিল, তাঁহার হাস্যে ওষ্ঠের যে দুঃখময় মাধুর্য্য ব্যক্ত করিল, তাহাতেও দেবচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তাঁহার অঙ্গসঞ্চালন কোন বিলাপময়ী রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত বীণা-ধ্বনির ন্যায় দেবচক্ষু বারংবার জলে পূর্ণ করিতে লাগিল।

রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গের বিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণের নর্ত্তন, এই নর্ত্তনের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে—তাহা তরল, উজ্জ্বল ও ক্ষণস্থায়ী রস বিতরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিত্তভার অপনোদন করে। এ নর্ত্তন সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের; ইহার রস স্থায়ী, ইহা স্বর্গে দ্বিতীয় অমৃত-ভাণ্ডের সৃষ্টি করিল, ইহার কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা দেবতাদিগের উপরও পুণ্য-প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহারা বেহুলা নাচুনীর নৃত্য দেখিয়া পবিত্র হইলেন।

দেবতারা বলিলেন, "পুণ্যশীলে, তুমি দৈবকর্ত্তৃক যত বিড়ম্বনা ভোগ

করিয়াছ, তন্মধ্যে আমরা যে তোমাকে নাচিতে আদেশ করিয়াছি, ইহাও সামান্য নহে ; কিন্তু স্বামীর জীবনের জন্য তুমি কি না করিতে পার, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা এই আদেশ দিয়াছিলাম, এই অবস্থায় তুমি ভিন্ন কে নাচিতে পারিত ! এই উৎকট পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়া তুমি আমাদিগকে লজ্জা দিয়াছ, যাহা হউক তোমার অভীষ্ট লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না।

দেব-সভা হইতে জয়-বিষহরি মাতার আহ্বান হইল। তিনি দেব-সভায় নাই, তিনি ত বেহুলাকে স্বামীর প্রাণদান করিবেন, দেবসভায় ইহার পূর্ব্বেই তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন ; নেতা-ধোপানী তাহাই শুনিয়া গিয়া বেহুলাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। এখন তিনি কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন ? দিক্‌পালগণ বিষহরি মাতাকে খুঁজিতে লাগিলেন। চন্দ্রের দৃষ্টি জগতের প্রতি কোণে কোণে যায় না, এবং তিনি রাত্রি না হইলে ভাল দেখেন না ; তাঁহার দ্বারা সন্ধান হইল না। সূর্য্য সারাদিন খুঁজিয়া রাত্রে রাতকাণা হইয়া পড়িলেন ; বিষহরি মাতার সন্ধান কেহ বলিতে পারিল না, তখন বেহুলা নাচুনীর মুখ শুকাইয়া গেল—তাঁহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া একটি দীর্ঘ শ্বাস পড়িল।

সেই শ্বাসে দেবাদিদেব শিব অধীর হইয়া পড়িলেন, তিনি নিজ-দেহের ভস্ম-বিন্দু নেতা-ধোপানীর চক্ষে কজ্জলের ন্যায় পরিতে দিলেন। সেই বিভূতির কজ্জল পরিয়া নেতা, বিষহরিকে সন্ধান করিয়া দেবসভায় উপস্থিত করাইলেন। ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ একত্র হইয়া বিষহরি দেবীকে লক্ষ্মীন্দরের প্রাণদান করিতে অনুরোধ করিলেন, বেহুলা নম্রমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন মনসাদেবী সেই দেব-সভায় একে একে তাঁহার পরিতাপের

কথা বলিতে লাগিলেন। সনকা লুকাইয়া তাঁহাকে পূজা করিত, চাঁদ তাহা জানিতে পারিয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার রত্নময় বিগ্রহের পৃষ্ঠদেশ হিন্তালের লাঠিদ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলে, চম্পকনগরে ঢেঁড়া পিটাইয়া ঘরে ঘরে তাঁহার পূজা মানা করিয়া দেয়—সদাগরের গুয়াবাড়ী ধ্বংসকালে সে ভ্রূকুটি করিয়া তাঁহাকে তাড়া করে, ভক্ত চন্দ্রকেতুর স্থাপিত ঘট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে! শঙ্কুরগারুড়ীর বন্ধুত্বের দর্পে সে প্রথমতঃ তাহাকে কীটপতঙ্গের ন্যায় নগণ্য মনে করিত; বন্ধু বিনষ্ট হইলেও তাহার দর্পের কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। যখন কালীদহের ঝড়ে সাত ডিঙ্গা মগ্ন হইতে উদ্যত হয়, তখন তিনি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার ভরসা দিয়াছিলেন; কিন্তু যে হস্তে সদাগর শিবপূজা করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার পূজায় কলঙ্কিত করিবে না বলিয়া দেবীকে নানাপ্রকার কটূক্তি করে। বাম হস্তে পূজা দিলেও তিনি সপ্তডিঙ্গা উদ্ধার করিয়া নিরাপদে তাহাকে চম্পকনগরে পৌঁছাইয়া দিবেন, এই আশ্বাস দিয়াছিলেন, চাঁদ তাহাতেও সম্মত হয় নাই। যতই বিপদে পড়িয়াছে, ততই সে তাঁহাকে বেশী ঘৃণা করিয়াছে; এরূপ করিলে কোন্ দেবতা সহ্য করিতে পারিতেন? যদি চাঁদের পূজা না পাইলেও মর্ত্ত্যধামে তাঁহার পূজা প্রচারের কোন ব্যাঘাত না হইত, তবে এ সকল দুঃসহ অপমানও না হয় উপেক্ষা করা চলিত, কিন্তু মহাদেবের আদেশ—চাঁদের পূজা ভিন্ন তাঁহার পূজা জগতে প্রচার পাইবে না; এই অবস্থায় তিনি কেমন করিয়া নগণ্য মানুষের নিকট মাথা হেঁট করিবেন এবং তাহার প্রার্থনা ভিন্ন তাহার পুত্রের জীবন দান করিবেন?

দেবীর পরিতাপব্যঞ্জক দৃষ্টি মহাদেবের প্রতি বদ্ধ হইল, এবং তাঁহার চক্ষের প্রান্তে একবিন্দু অশ্রু টল্ টল্ করিতে লাগিল।

মহাদেব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া, লক্ষ্মীন্দরকে পুনর্জীবিত করিতে আদেশ দিলেন। চাঁদ-সদাগর যাহাতে পূজা করে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

১৬

তখন প্রফুল্ল-চিত্তে বিষহরি লক্ষ্মীন্দরের পুনর্জীবন দান করিলেন, লক্ষ্মীন্দরের পায়ের একখানি অস্থি বোয়াল মৎস্যে ভক্ষণ করিয়াছিল, বহু সন্ধানে তাহা তিনি আনাইলেন। স্বর্গের বায়ুস্পর্শে অপূর্ব্ব কান্তি লাভ করিয়া পুনর্জীবিত লক্ষ্মীন্দর বেহুলার পার্শ্বে দাঁড়াইল। দেবী বলিলেন, "বেহুলা, আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, তোমার আর কিছু অভীষ্ট থাকে ত প্রার্থনা কর।" বেহুলা যুক্ত-করে মনসাকে বলিলেন, —"আমি স্বামী লইয়া আনন্দে গৃহে ফিরিব, আর আমার ছয়টি জা' শঙ্খসিন্দুর বর্জ্জিত হইয়া নিরামিষ হাঁড়ি লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিবেন—তাহা কেমন করিয়া সহিব? মা বিষহরি, দাসীকে ভাসুরদিগের জীবনভিক্ষা দান করুন।"

চন্দ্রধরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধর গোলাঘরের তত্ত্বাবধান করিতেছিল, এমন সময় নিকটবর্ত্তী ফুল বাগান হইতে একটি সর্প আসিয়া তাহাকে দংশন করিয়াছিল। তৎকনিষ্ঠ শ্রীকর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণকালে সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছিল, তৃতীয় পুত্র গুণাকর বাজপক্ষী শিকার করিবার কালে, তৎকনিষ্ঠ সৃষ্টিধর জলবিহারের সময়, পঞ্চম হীরাধর অন্তঃপুর প্রবেশপথে এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ দুর্গাধর সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিবার সময় সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মনসা দেবী তাহাদের প্রাণ হরণ

করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, দেবীর বরে তাহারা জীবন লাভ করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল।

দেবীর প্রসাদে মগ্ন সপ্তডিঙ্গার স্থলে চৌদ্দডিঙ্গা লাভ হইল ; মণি-মাণিক্য-পূর্ণ "গঙ্গাপ্রসাদ", তাম্র ও কাংস্য নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় বিবিধ দ্রব্য-পূর্ণ "সাগর-ফেন," উৎকৃষ্ট বস্ত্র-পূর্ণ "হংস-রব", সমুদ্রজাত দুষ্প্রাপ্য শঙ্খ-প্রবাল-পূর্ণ "রাজ-বল্লভ," প্রভৃতি ডিঙ্গা কালীদহের ভীষণ ঝড়ে ডুবিয়া গিয়াছিল ; তাহারা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় মন্দাকিনী-নীরে উচ্চগ্রীব হইয়া লক্ষ্মীন্দিরের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেবীর আদেশে যক্ষগণ ও উনপঞ্চাশৎ বায়ু যে "মধুকর" ডিঙ্গাকে বহু চেষ্টায় হেলাইতে পারে নাই, ষোলশত দাঁড়যুক্ত সেই আশ্চর্য্য গঠন নৌকা ডুবিতে ডুবিতে কতবার অগ্রভাগ জাগাইয়া উঠিয়াছিল, বায়ু-পুত্র স্বয়ং বহুক্লেশে "মধুকর" নৌকাকে নাচাইয়া ডুবাইয়াছিলেন, সেই "মধুকর ডিঙ্গা" সদ্য-বর্ষণ-স্নাত সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর ন্যায় সেই বিশাল নৌ-শ্রেণীর পুরোভাগে পরিদৃষ্ট হইল।

বেহুলা অসংখ্য প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দেব-সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় বিষহরি বলিলেন, "তোমার শ্বশুর যদি আমার পূজা না করে, তবে যাহা দত্ত হইল, তাহা সকলই হারাইবে।" এই কথায় বেহুলার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু মহাদেবের আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

১৭

চৌদ্দডিঙ্গা লইয়া ছয় ভ্রাতাসহ লক্ষ্মীন্দর যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলা এক ডিঙ্গাতে রহিলেন। সেদিন ত্রিবেণীর ঘাটে মন্দানিল-চালিত কেতকীরেণু দম্পতির মুখে উড়িয়া পড়িতে লাগিল। বেহুলা বলিলেন, "মৃত্যুকালে তুমি কি কহিতে চেষ্টা করিয়া আমাকে বলিতে পার নাই, তোমার হস্তের ইঙ্গিতে আমি তোমার মুখের কাছে কান পাতিয়াছিলাম, তুমি কি বলিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে পারিলে না, কেবল দুইটি নিশ্চল চক্ষের তারা আমার দিকে ন্যস্ত করিয়া রহিলে। এক একবার শিবচক্ষু হইয়া দৃষ্টি ছাড়িয়া যাইতেছিল, আবার ক্ষণমাত্র চক্ষু সুস্থ হইয়া নিম্ন-দৃষ্টি হওয়ামাত্র তাহা আমার দিকে ন্যস্ত করিয়াছিলে, কি বলিতে চাহিয়াছিলে তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তোমার অসীম প্রেম মুমূর্ষু-কালে দুইটি চক্ষুদ্বারা আমার বুকের মধ্যে লিখিয়া গিয়াছিলে, তোমার মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, তখন মনে স্থির করিলাম, তোমার সঙ্গে চিতায় দগ্ধ হইলেও আমার শান্তি হইবে না, আমি তপস্যাদ্বারা ইহজীবনেই তোমাকে লাভ করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রফুল্লমুখী বেহুলার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

লক্ষ্মীন্দর সে কথা ভুলাইবার জন্য বলিলেন, "ঐ দেখ, গাবরগণ শিঙ্গা ফুকারিতেছে ও ত্রিবেণী-স্নান-রত শত শত লোক আমাদিগের ডিঙ্গাগুলি দেখিতেছে।"

তীব্রগতিতে ডিঙ্গাগুলি বৈদ্যপুর ছাড়িয়া নারিকেল-ডাঙ্গায় পৌঁছিল; সেই খানে মনসার মন্দির ছিল, তথায় তাঁহার পূজা দিয়া তাঁহারা পুনরায় ডিঙ্গা ছাড়িয়া দিলেন ও বোয়ালিয়া-ঘাট ছাড়িয়া জাগুলে উপনীত

হইলেন। বেহুলা যে কষ্টে ভেলায় ভাসিয়া সেই সকল স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন—অশ্রুসিক্তচক্ষে তাহা লক্ষীন্দরকে জানাইলেন, লক্ষীন্দরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মহেশ্বর-ঘাটায় লখাই-এর শবে প্রথম মাছিতা পড়ে, তখন বেহুলার যে শোক হয়, তাহা শুনিয়া পাষাণ বিগলিত হয়। গোদা-ঘাটে গোদা ভাসিয়া গিয়াছিল, বেহুলা মনসা-দেবীকে স্মরণ করিয়া, গোদাকে উদ্ধার করিতে প্রার্থনা করিলেন, গোদা বেহুলার প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করাতে ছয় মাস কাল জলে ভাসিতেছিল, মনসা দেবী তাহার জীবন মাত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে রামকড়ি কর্ণে ও শঙ্খের মালা গলদেশে পরিয়া মৃতপ্রায় গোদা ভাসিতে ভাসিতে ঘাটে উঠিল; প্রাণ পাইয়া গোদা বেহুলাকে বলিল,—"মা, আমি তোমায় না চিনিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি, পাপিষ্ঠ সন্তানের দোষ লইবেন না।" বেহুলার বরে গোদ ভাল হইয়া গেল। শৃগালঘাট ছাড়িয়া নৌকা গঙ্গাপুরে পৌঁছিল। তথা হইতে বর্দ্ধমান, গোবিন্দপুর ও হুবরাজপুর পার হইয়া, বেলা দ্বিতীয়প্রহরের সময় সকলে চাঁপাতলার ঘাটে উপস্থিত হইলেন! বেহুলা চাঁপাতলার ঘাট দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,"প্রভু, এই ঘাটে আমার ভ্রাতারা আমাকে ফিরাইয়া নিতে আসিয়াছিল, তাঁহাদের আনীত নানা খাদ্যদ্রব্য চাঁপাগাছের তলায় পোঁতা আছে, বিষহরি দেবীর বরে তাহা নষ্ট হয় নাই, মাটি খুঁড়িলে তাহা পাওয়া যাইবে। আমার পিতৃগৃহের খাদ্যাদি খাইতে বড় সাধ হইতেছে।" মৃত্তিকা খুঁড়িয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট সন্দেশ চাঁপাকলা, ক্ষীরখণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া গেল; সেগুলি যেমন তেমনই রহিয়াছে। বেহুলা সাশ্রুনেত্রে ভাসুরদিগকে ও স্বামীকে তাহা পরিবেশন করিয়া নিজে প্রসাদ খাইলেন। তাঁহারা চাঁপাতলা পার হইয়া নিছনি

গ্রামের নিকট উপনীত হইলেন। তখন বেহুলা লক্ষীন্দরের পদ জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা দাও, একবার আমার দুঃখিনী মাতাকে দেখিয়া যাইব, আমার মা পাগলিনী হইয়া আছেন।"

লক্ষীন্দর বলিলেন—"চল আমরা ছদ্মবেশে নিছনিগ্রামে যাই।" তখন বেহুলা আনন্দে কাষায় বস্ত্র পরিয়া মাথার কেশে জটা বাঁধিলেন, অঙ্গে বিভূতি মাখিয়া, কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল পরিলেন। লক্ষীন্দর যোগী সাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নিছনিগ্রামের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "এমন যোগী ও যোগিনী আমরা কখনও দেখি নাই, ঠিক যেন শিব ও ভবানী!" বারুইপাড়া অতিক্রম করিয়া, বেহুলা সায়-বেনের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। পিতৃগৃহ দেখিয়া বেহুলার চক্ষু বারংবার অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল। বেহুলা মন্থর-গতিতে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন! তখন অমলা হরি-সাধুর ভাত স্বর্ণ-থালায় লইয়া রন্ধন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। অপূর্ব্ব যোগী ও যোগিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া ভাতের থালা হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "যোগিনী আমার বেহুলারই মত। মা যোগিনি, আমার একটিমাত্র কন্যা পাগলিনীর মত স্বামীর মৃতদেহ বক্ষে লইয়া ভেলায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার শোকে দেশের পশুপক্ষী ঝুরিয়া মরিতেছে। অশ্বশালে অশ্ব ও হাতীশালে হাতী বেহুলার নাম শুনিলে খাদ্য দ্রব্য খায় না, ঝর্ ঝর্ করিয়া তাদের চক্ষের জল পড়িতে থাকে, আমার মত পাষাণী আর নাই। তুমি যে হও সে হও, আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না।" এই বলিয়া উন্মাদিনীর মত অমলা বেণেনী, যোগিনীকে বক্ষে লইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন অবিরলধারে বেহুলার চক্ষের জল পড়িতেছিল, লক্ষীন্দরও তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন। অমলার মোহ ভঙ্গ হইলে, বেহুলা

তাঁহার মস্তক ক্রোড়দেশে রাখিয়া, তাহা অশ্রুনিষিক্ত করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি কেঁদ না, এই তোমার হতভাগিনী কন্যা এবং অশ্রুসিক্ত যোগী তোমার জামাতা।" তখন সায়-বেণের ঘরে এক আনন্দ-কলরব পড়িয়া গেল, সেই আনন্দে হাসি নাই, কেবল চক্ষের জল। সায়-বেণের ঘরে নিছনিগ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, তরুণী বণিক্-বধূগণ বেহুলার পদরজঃ লইয়া মাথায় রাখিতে লাগিল।

বেহুলা একদিনও তথায় রহিলেন না; মাতাকে বলিলেন—"মা তোমার এক কন্যা হারাইয়া তুমি এমন হইয়াছ, আর সাত পুত্র ও পুত্র-বধূকে হারাইয়া মা সনকা কেমন করিয়া আছেন। তাঁহার হস্তে তাঁহার পুত্রগণকে না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি শান্তি পাইব না। আমরা এখনই চলিয়া যাইব।"

অমলা বলিলেন, "অন্নপূর্ণাও তিনটি দিন পিত্রালয়ে থাকেন, মা তুমি কি পাষাণী হইতেও নিষ্ঠুর? একটি দিন থাকিয়া যাও।" বেহুলা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কপট যোগী ও যোগিনী সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইলেন।

১৮

চৌদ্দডিঙ্গা চম্পকনগরে উপনীত হইল। তথায় বেহুলা ডুমুনীর বেশ ধারণ করিলেন। তিনি একজন কারিকরের দ্বারা একখানি ব্যজনীতে চাঁদ-বেণের বাড়ীর সকলের মূর্ত্তি উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মণি-রত্নে ঝলমল করিতেছিল। সেই ব্যজনীটি হাতে ঘুরাইয়া, বেহুলা অপূর্ব্ব ডুমুনী-বেশে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

সেদিন চাঁদ-সদাগর লখাইয়ের ষড়্মাসিক শ্রাদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত, চাঁদের ছয়টি বিধবা পুত্র-বধূ গাঙ্গুড়ের ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল—তাহারা মূল্যবান ব্যজনীহস্তে সুন্দরী ডুমুনীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ ব্যজনী দিয়া কি করিবে?" বেহুলা বলিলেন, "লক্ষ মুদ্রা হইলে এ ব্যজনী বিক্রয় করিব।" ছয়বধূ ভাল করিয়া সেই ব্যজনী লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহাতে তাহাদের বাড়ীর পরিজনের চিত্র অঙ্কিত আছে; ইহা দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইয়া গেল! ডুমুনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বেহুলা বলিল, "আমার নাম বেহুলা ডুমুনী, আমার পিতার নাম সায় ডোম—শ্বশুরের নাম চাঁদ ডোম ও স্বামীর নাম লখাই ডোম।" এই অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়া তাহাদের চক্ষে দর দর জলধারা পড়িতে লাগিল।

তাহারা ঘরে যাইয়া সনকাকে এই কথা বলাতে, তিনি বাসর-ঘরে যাইয়া দেখেন, বেহুলার কথিত স্বর্ণ-দীপ নিবে নাই, দাড়িম গাছের তলা খুঁড়িয়া দেখিলেন, স্বর্ণ থালার ভাত সদ্য উষ্ণ রহিয়াছে; তখন সনকা পাগলিনীর বেশে ঘাটে উপনীত হইলেন, ব্যজনী দেখিয়া তিনি তথায় হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ডুমুনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমরা ডোম, ধুচুনী ও চুপড়ি বিক্রয় করিয়া খাই।" ডুমুনীর চাঁদ-পানা মুখ দেখিয়া তাঁহার আর একখানি মুখ মনে পড়িল, সে মুখখানি সনকা ভুলিতে পারেন নাই; একদিন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে মুখ হৃদয়ে গাঁথা ছিল, সেই শরদিন্দুনিভমুখী পুত্রবধূর কথা মনে পড়াতে, তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, গাঙ্গুড়ের কূলে বণিক্-সীমন্তিনী আছাড়ি পাছাড়ি খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন ডুমুনী শাশুড়ীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "আর কেঁদ না

মা তোমার হারানিধিগণকে একবার দেখ, আমি বড় কষ্টে তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া আনিয়াছি।" এই সময়ে একবারে সাত ছেলে যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া মাতার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন—চমৎকৃত হইয়া ছয়বধূ সরিয়া পড়িলেন; অকস্মাৎ কে যেন অদৃশ্য-হস্তে তাহাদের মাথায় সিন্দুর পরাইয়া দিল, হাতে স্বর্ণ-মণ্ডিত শঙ্খের বালা জুড়িয়া দিল। কিন্তু বেহুলা সরিয়া গেলেন না। বেহুলা বলিলেন, যে পর্য্যন্ত শ্বশুর মহাশয় মনসাদেবীর পূজা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমাদের চম্পকনগরে প্রবেশের অধিকার নাই, এই জন্য ছল করিয়া আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছি।

১৯

"হে দেব নীলকণ্ঠ! সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত অমৃত, লক্ষ্মী উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত, ঐরাবত এবং অমূল্য রত্নরাজি যখন দেবতারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেলেন, তখন তোমার আহ্বান হয় নাই; কিন্তু যখন বিষ উত্থিত হইয়া বিশ্ব নাশ করিতে উদ্যত হইল, দেবগণ তখন তোমার শরণ লইলেন, বিষপান করিয়া তুমি বিশ্ব রক্ষা করিলে; হে নীল-কণ্ঠ! তোমার 'নীলকণ্ঠ' এই অমৃত কথার সাক্ষী হইয়া আছে। সুমন্ত-মুনি যখন সুরেশ্বরী গঙ্গাকে বলিলেন, "দেবসমাজে রাত্রিকালে যখন তুমি অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছিলে, তখন তাঁহাদের লোলুপ-দৃষ্টি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর পড়িয়াছিল, তাঁহাদের দুষ্ট চক্ষে দৃষ্ট হইয়া তুমি পতিতা হইয়াছ। আমি তোমাকে আর আশ্রমে স্থান দিব না।" আশ্রয়চ্যুতা গঙ্গা বিশেষ স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না, অপবাদ-ভীত

দেবতারা কেহ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইলেন না। তখন পাগলবেশে ধূর্জ্জটি আসিয়া পরম করুণায় গঙ্গাদেবীকে মাথায় করিয়া লইলেন। সুর-জগৎ বিস্মিত হইয়া গেল।

"হে নীলকণ্ঠ! তুমি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণই অতিক্রম করিয়াছ। যাহা শুদ্ধ, যাহা জগতের কল্যাণকর, তাহা তুমি পরিহার করিয়াছ, যাহা ঘৃণিত, অশুচি ও অকল্যাণহেতু বলিয়া পরিত্যক্ত, সেই ভস্ম ও চিতাগ্নি—তোমার আদৃত। চন্দন, অগুরু প্রভৃতি তুমি চাহ না, শ্মশানের শব-কঙ্কাল ও চিতাভস্মই তোমার প্রিয়। তোমার ধনরক্ষক কুবের, কিন্তু সে ধনরত্নের প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত নাই। যুগে যুগে তুমি একবারও কুবেরকে স্মরণ কর নাই। অন্য দেবতাদের ভূষণ-বাহনের ঘটায় স্বর্গপুরী উজ্জ্বল, তোমার অনুচর ভূত, প্রেত, অসভ্য নন্দী, ভৃঙ্গী যাহাদের স্পর্শ অপর দেবতারা ঘৃণায় পরিত্যাগ করেন, তুমি নির্ঘৃণ—তাহারাই তোমার প্রিয়সখা; তাথৈ তাথৈ রবে তাহারা তোমার সঙ্গে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। অপর দেবতাদের কণ্ঠে পারিজাত-হার, তোমার কর্ণে বিষাক্ত ধুস্তুর-পুষ্প। জগৎ নাশেও তোমার আনন্দ নষ্ট হয় না; যখন জগৎ ধ্বংস পায়, তখন তোমার মুখে প্রলয়-বিষাণ বাজিতে থাকে এবং তোমার মুখে পবিত্র 'ওঙ্কার' উচ্চারিত হয়। তুমি চির-প্রশান্ত, কামনা তোমার কোপদৃষ্টিতে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল-পঙ্কজ-সদৃশ পাণিযুগল অঙ্কেতে স্থাপিত করিয়া অন্তশ্চর মরুৎ নিরোধপূর্ব্বক যখন তুমি সমাধি-সাগরে নিমগ্ন হও, তখন কত যুগ তোমার উপর দিয়া চলিয়া যায়; তখন কত ইন্দ্র, কত ব্রহ্মার উৎপত্তি ও বিলয় হয়। হে অনাদিদেব! তুমি একমাত্র ধ্রুব-সত্যের ন্যায় সমাধিতে বিরাজ করিতে থাক।

"আমি ক্ষুদ্র হইলেও তোমারই কণিকা ; আমারও মনে হয়—আমার পিতা নাই, মাতা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, আমার পুত্র-কলত্র নাই, আমি কখনও জন্মি নাই, আমি কখনও মরিব না। দিক্ সকল আমার অম্বর, ধ্বংসের মধ্যেও আমি নিত্যস্থায়ী, পরিদৃশ্যমান কিছুর মধ্যে আমি নাই—আমি আনন্দময়, সত্য-স্বরূপ।"

সাঁতালী-পর্ব্বতে অবস্থিত চাঁদ-সদাগর এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি লক্ষ্মীন্দর প্রভৃতির পুনরাগমনের কথা শ্রবণ করিয়াই, নির্জ্জনে অপসৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত-রূপে চিন্তা করার পরে, চন্দ্রধরের মুখে এই শ্লোকগুলি উচ্চারিত হইল—

"ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখম্
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদং ন যজ্ঞং।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মৃত্যুর্নশঙ্কা ন মে জাতি-ভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে চন্দ্রধর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহপূর্ব্বক আত্মস্থ হইতে চেষ্টা

করিতে লাগিলেন, তথাপি মনের অন্তস্তল হইতে বেহুলা ও লক্ষীন্দর প্রভৃতির পুনরাগমন সংবাদজনিত প্রীতি উথলিয়া উঠিল। তিনি মনসা দেবীর পূজা না করিলে তাঁহারা চলিয়া যাইবে, তখন সনকার অবস্থা কি দাঁড়াইবে, এই চিন্তায় তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি ধর্ম্মভাবকে যত প্রবল চেষ্টায় আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তীব্র আশঙ্কা ততই সে ভাবের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতে লাগিল।

এমন সময়ে চাঁদ দেখিতে পাইলেন, অতি জীর্ণ কন্থা-পৃষ্ঠে এক গলিতচর্ম্ম শীর্ণকায় বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্বস্থিত একটি উচ্চ বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক তাহার শাখায় উপবেশন করিল এবং কুঠারদ্বারা সেই শাখাটিরই মূলচ্ছেদ করিতে লাগিল। চাঁদ ভাবিলেন, লোকটা বিকৃত-মস্তিষ্ক। শাখা ছিন্ন হইলে এখনই সে উন্নত বৃক্ষের শীর্ষ হইতে ভূমিতে পতিত হইবে।

চাঁদ ডাকিয়া বলিলেন, "পাগল, কি করিতেছ? এখনই পড়িয়া মরিবে।"

বৃদ্ধ উত্তর না দিয়া বলিল—

"ন মৃত্যুর্নশঙ্কা"

চাঁদ চমকিয়া উঠিলেন, এই শ্লোক তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়াছেন, বৃদ্ধ কি অজ্ঞাতসারে তাহা শুনিয়া ফেলিয়াছে?

চাঁদকে চমৎকৃত দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "আমাকে পাগল বলিলে, তোমার মত পাগল কি কেহ আছে? তুমি মনসাদেবীর সঙ্গে বৃথা দ্বন্দ্ব করিয়া, স্বীয় গৃহের উচ্ছেদ করিতেছ কেন?"

চাঁদ বলিলেন, "সে অনেক কথা— তুমি বুঝিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "এই যে, 'ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ' বলিয়া আপনাকে এতটা উর্দ্ধে কল্পনা করিতেছিলে; মনসাদেবীর সঙ্গে

বাদ করিয়া, কি তুমি প্রকৃতই সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থার পরিচয় দিতেছ? তুমি এই কথার উত্তর দাও, আমাকে পলিতকেশ শীর্ণ বৃদ্ধ দেখিয়া ঘৃণা করিও না, তুমি ত এইমাত্র বলিতেছিলে, 'মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য-ভাবঃ।'" চাঁদ, বৃদ্ধকে কোন সন্ন্যাসী মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে বিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতেছে, সুতরাং বলিতেছি শোন, যে দেবতা দুঃখ প্রদান করেন কিংবা সাংসারিক সুখ দ্বারা ভক্তকে পুরস্কৃত করেন, আমি তাঁহার সেবক নহি। আমি বিদ্বেষবশতঃ মনসাদেবীকে উপেক্ষা করি নাই। আমার পুরীতে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। আমি সুখান্বেষী কি দুঃখ-ভীত নহি। আমি আত্ম-বস্তু, চিৎস্বরূপ, আনন্দময়—আমার গুয়াবাড়ী ধ্বংস হইল, কিংবা সাতডিঙ্গা জলমগ্ন হইল, অথবা সাতটি পুত্রই ধ্বংস হইল, তাহাতে আমি বিচলিত হই নাই। সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আমার নিকট অতি তুচ্ছ, এজন্য আমি মনসাদেবীকে অগ্রাহ্য করিয়াছি। সংসার-সমুদ্রের সমস্ত হলাহল আমার নিকট নগণ্য—এজন্য আমি মনসাকে উপেক্ষা করিয়াছি। এই দুঃখ-সুখ তরঙ্গ মায়িক ও মিথ্যা—আমি নিত্য বস্তুর সন্ধান করিতেছি। আমি স্ত্রীলোকের ন্যায় দেবতার মঠে ধন্না দিয়া, সাংসারিক কোন কামনা-সিদ্ধি প্রার্থনা জানাইবার লোক নহি। সুখে আমি বীতস্পৃহ, দুঃখকে আমি ভয় করি না। বৃদ্ধ, তুমি আমার হৃদয়ের বল জান না—এজন্য মনে করিতেছ, আমি দ্বেষ-পরবশ হইয়া তাঁহার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতেছি।

"এই দেবতাটি গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে চাহে। আমি তাঁহাকে পূজা দিব না, তবু সে পূজা পাইতে লোলুপ। মনসা যাহা নিতে পারে বা দিতে পারে, আমি তাহার উপাসক নহি। আমি কেন তাহার পূজা করিব? আমার দেবতা তাহার অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত,

আমি তাঁহাকে আমার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি। যাহারা সুখ খোঁজে, তাহারা দুঃখ পায় সুতরাং সুখদুঃখের কর্ত্রী মনসার পূজা আমি বারণ করিয়াছি।"

বৃদ্ধ বলিল, "মিথ্যা কথা, তুমি সুখ দুঃখের উর্দ্ধে উঠিতেই পার নাই। এইমাত্র লক্ষীন্দর ও বেহুলার পুনরাগমনজনিত নানা সুখ ও আশঙ্কার কথায় তোমার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল। তুমি কোনওরূপে আত্মস্থ হইতে পার নাই।"

চাঁদ চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিলেন। 'এ শুধু সন্ন্যাসী নহে, ইহার যোগবল অসাধারণ, আমার মনোভাব জানিল কিরূপে?'

চাঁদ বলিলেন, "আমি জনক-ঋষির ন্যায় সংসারে থাকিয়া সংসারের চিন্তা হইতে উর্দ্ধে থাকিতে চেষ্টা করি। সময়ে সময়ে সাংসারিক সুখ-দুঃখের স্রোত হৃদয়ে আসা অনিবার্য্য, কিন্তু তাহা দূরে রাখিবার চেষ্টাই পুরুষাকার।"

বৃদ্ধ বলিল, "তুমি জনক-ঋষি হইতে পার নাই, জনক-ঋষি একেবারে সাংসারিক সুখে দুঃখে অভিভূত হইতেন না; যখন রাজধানী মিথিলাপুরী অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন শুকদেব রাজর্ষিকে নিশ্চিন্তভাবে বাপীতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া শশব্যস্তে বলিলেন, "মহারাজ, দেখিতে পাইতেছেন না, অগ্নিতে আপনার সমস্ত পুরী ধ্বংস হইয়া গেল?" রাজর্ষি হাসিয়া বলিলেন, "এ অগ্নিতে আমার কিছুমাত্র ধ্বংস হইতেছে না।" তুমি কি সেই ভাবে তোমার বিপদরাশি সহ্য করিতে পারিয়াছ? এক সাঁতালী-পর্ব্বতে যখন মহাদেবের স্তোত্র পাঠ করিয়াছ, তখন মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ শ্বাস তোমার বক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে অশ্রু পড়িয়া তোমার হস্তের বিল্বদল ও ধুস্তুরপুষ্প

কলঙ্কিত করিয়াছে, মহাদেব সেই উপহার গ্রহণ করেন নাই। তুমি যে নির্ব্বাণ ষটক পাঠ করিতেছিলে—সে-ভাবের তুমি কল্পনা করিতেছ মাত্র, তাহা প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পার নাই। উহা যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে—তাঁহার ত্যাগ স্বাভাবিক, তাহা জ্বালার উৎপত্তি করে না। তিনি ঐশ্বর্য্যের স্তূপে বসিয়া থাকিলেও তাহা চিতা-ভস্মের ন্যায় দেখেন। তাঁহার উপর বাহ্য বৈভবের কোনই আকর্ষণী শক্তি থাকে না। তুমি শিবকে ইষ্টদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাক, অথচ তাঁহার সহায়তা ছাড়া মায়াপাশ ছেদন করিতে প্রয়াস পাইতেছ, তদ্দ্বারা পাশের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র। তুমি যদি অহঙ্কৃত না হইতে, তাহা হইলে মনসাদেবী কখনই তোমার পূজা গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। তুমি অহঙ্কৃত, আত্মবলে শিব-মায়া-মুক্ত হইবে, এই স্পর্দ্ধিত চেষ্টার দ্বারা ভোগের দেবতাকে আকর্ষণ করিতেছ, এজন্য তিনি তোমায় ছাড়িয়া দিতেছেন না। তুমি তাঁহাকে নিজে আনিয়া আপনাকে বুঝাইতেছ, তাঁহাকে তুমি তাডাইয়া দিতে পার। তুমি শিবমায়া-স্বরূপা মনসা দেবীকে স্বীকার কর এবং তাহার পদে প্রণাম কর, তাহা হইলে তাঁহার অধিকার হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। রাজসিক ভাবকে প্রাধান্য দিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হওয়ার কল্পনা বৃথা।”

এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সদাগরের মনে হইল, যেন তাঁহার কর্ণে শতকোটি বীণা নিনাদিত হইল। স্বশক্তিতে নহে—অবিনয়ে নহে, ভগবৎশক্তিতে ও পূর্ণ বিনয়ে তিনি শিব-মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবেন, এই কথায় তাঁহার হৃদয় অভূতপূর্ব্ব সান্ত্বনা লাভ করিল। তিনি যে বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত ছিলেন, কে যেন অমৃত-নিষেকে তাহা জুড়াইয়া দিল। আপনা আপনি তাঁহার করদ্বয় ভক্তিভরে যুক্ত হইল,

আপনা আপনি তাঁহার চক্ষে অজস্র অশ্রুবিন্দু উপহার-স্বরূপ উদ্গত হইল, আপনা আপনি ভক্তিভরে জানুদ্বয় নত হইল, অতি বিনীতভাবে তিনি বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, তথায় বৃদ্ধ নাই—সেই স্থলে জটাজুটমণ্ডিত, রজতগিরিনিভকান্তি, অঙ্গে ভস্মমাখা, ফণীর বলয়, ফণিহার ও ফণি-মুকুটে কলকল-নাদী গঙ্গাধারা বিধৌত জটাকলাপে, ফণিনীবিবন্ধ-দ্বীপিচর্ম্মাবৃত কটি-তটে, অর্দ্ধেন্দু বিরাজিত বিশাল ললাটে সেই মূর্ত্তি আকাশ-পথে দেদীপ্যমান।

সদাগর আরও দেখিলেন, হরের ত্রিনেত্র জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। তাঁহার সমস্ত কান্তিতে কাম-পরাজয়ের লক্ষণ বিদ্যমান। তাহাতে রাগ, দ্বেষ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের চিহ্ন মাত্র নাই। সেই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র সদাগর বুঝিলেন, তিনি নিজে কত দীনহীন। মহাদেবের দেহের চিতাভস্মে ঐহিক-সুখ ভস্ম হইয়া গিয়াছে, পরমানন্দ জাগ্রত রাখিয়াছে, আর তাঁহার দেহের ধূলিকণা অঙ্গের মলিনতা জ্ঞাপন করিতেছে মাত্র।

সদাগর অনুভব করিলেন, মহাদেবের কর্ণের ধুস্তুর-কুসুম হইতে অপূর্ব্ব সুরভি নিঃসৃত হইতেছে; স্বর্গ, মর্ত্ত্যের কোন পুষ্পে তাহা নাই, তাহার অমল ধবল জ্যোতিতে জগতের সকল কুসুমের বর্ণ পরাস্ত। তাঁহার শরীর-বেষ্টী ত্রিলোক-ভীতিকর সর্পের শব্দে যেন যোগিবরের পরমানন্দ উথলিয়া উঠিতেছে—যাহা অনিত্য, তাহারই ধ্বংস সেই শব্দে সূচিত হইতেছে।

সদাগর বুঝিলেন, চন্দ্রচূড় বিশ্বহিতের জন্য বিশ্বের বিষরাশি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বিষ তাঁহার কণ্ঠকে নীলোজ্জ্বল করিয়াছে, সেই বিষ সর্পরূপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিরাজিত ও তাহাই তাঁহার কর্ণের ধুস্তুর-কুসুমে জ্যোতিষ্মান্। এই বিষ-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সুধার উৎপত্তি

হইয়াছে, তাহাই আনন্দময়ের চন্দ্রবদনে ও ধুস্তুর পুষ্পের শুভ্রতায় প্রতিভাত। তদীয় প্রীতি-ফুল্ল দৃষ্টিপাতে সমস্ত জগৎ কৈলাসপুরীর মহিমায় মণ্ডিত হয়, হলাহল পরাস্ত হয় এবং শার্দ্দূল ও মেষকে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করে।

সদাগর দেখিলেন—দিগ্‌দিগন্ত সেই জ্যোতির্ম্ময়ের রূপে উদ্ভাসিত। সেই জ্যোতিই পুরুষবরের অম্বর-স্বরূপ, মেঘমালার স্বর্ণচ্ছটা নিবিড় গাঢ় কৃষ্ণতা যেন তাঁহারই যুক্ত জটাজুটেরে ছায়ার ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া আছে, সেই রূপ যেন ক্রমশঃ জগতের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। যেন সেই চিতাভস্ম সংসারকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া, নিত্য সত্যকে কষিত করিয়া দেখাইতেছে, যেন গঙ্গাধারার কলরব এই পৃথিবীর পরপারে কোন আনন্দময় লোকের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। সদাগর যুক্তকরে সেই মহামূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া রহিলেন, অশ্রুজল চক্ষে উছলিয়া পড়িল।

তখন তিনি শুনিতে পাইলেন, "তুমি মনসাকে আমার আত্মজা বলিয়া জানিও, তুমি তাঁহার মুখ দেখিবে না ও দক্ষিণহস্তে তাঁহার পূজা দিবে না বলিয়াছ, মুখ ফিরাইয়া বামহস্তে অঞ্জলি দিলেই তিনি প্রীতা হইবেন।" দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল, সমস্ত জগৎ যেন ভূত-ভাবনের চিহ্নস্বরূপ হইয়া পড়িয়া রহিল।

চন্দ্রধর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি দক্ষিণহস্তে মস্তক ভূতলে আনম্র করিয়া তোমার আত্মজার পূজা প্রদান করিব।"

২০

সদাগর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, গাঙ্গুড়ের কূলে সমস্ত চম্পকনগর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সনকা বেহুলাকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার সাত পুত্র নতচক্ষে মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, যে তাহাদিগকে দেখিতেছে, তাহারই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সদাগর সেই পথে আসিলে, একটা উচ্চ কলরব উত্থিত হইল, বেহুলা কাঁদিতে-কাঁদিতে যাইয়া তাঁহার পাদমূলে নিপতিতা হইলেন। সদাগর সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন, বেহুলার দেহ হইতে মহাদেবের কর্ণান্ত-শোভী ধুস্তুর-কুসুমের অপূর্ব্ব গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে। তিনি দেখিলেন, মহাদেবের দেহের যে কামনাহীন নির্ম্মল কান্তি, বেহুলার রূপে তাহারই আভা পড়িয়াছে। বেহুলার চক্ষুজলে ধূর্জ্জটীর জটালগ্ন গঙ্গার পবিত্রতা —এই মাত্র তিনি তাঁহার উপাস্যকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তিনি বেহুলার রূপে, কণ্ঠ-স্বরে এবং অঙ্গ-সৌরভে যেন সেই উপাস্য দেবতার ছায়া ভাসিতে দেখিলেন। বেহুলা কাঁদিয়া বলিলেন "পিতঃ! আমাদিগকে কোন্ প্রাণে ফিরিয়া যাইতে বলিবে. আমরা বড় কষ্টে আবার তোমার গৃহে আসিয়াছি। মনসাদেবীর পূজা না করিলে আবার আমরা ফিরিয়া যাইব, তুমি নিষ্ঠুর হইও না! মহাদেব বলিয়াছেন, এবার তোমার সুমতি হইবে, তুমি বিষহরি মাতার পূজা করিবে।"

চন্দ্রধরের উত্তর শুনিবার জন্য সমস্ত চম্পক-নগরবাসী লোক উৎকর্ণ হইয়া রহিল, তাহাদের বক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল, সনকা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই উত্তর শুনিবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন। সাত

পুত্র মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের চক্ষে ঘন ঘন জল-বিন্দু পড়িতে লাগিল।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, চন্দ্রধর কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, ধীরে ধীরে তাঁহার গণ্ডে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বহু কষ্টে আত্মদমনপূর্ব্বক বলিলেন, "মা, আমি এত দিন শিবপূজা করি নাই, দাম্ভিকতার পূজা করিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে তুমিই শিবপূজা করিয়াছ; না হইলে তোমার দেহে শিবজ্যোতিঃ কেন? নগরে প্রচার করিয়া দাও, আজ চন্দ্রধর-বণিক্ তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে—আজ শিবাত্মজাদেবীর পূজা নিজ হস্তে করিয়া জীবনসার্থক করিব।"

২১

বড় বড় স্ফটিকের স্তম্ভের উপর ময়ূরপুচ্ছ-খচিত ছাদ নির্ম্মাণ করা হইল, তাহার ঝালরসমূহ হীরা, মণি ও বিচিত্র বর্ণের প্রস্তর সকলে গ্রথিত হইয়া স্বর্ণ-প্রদীপ মালার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। মনসা-দেবীর সুবর্ণবিগ্রহ গঠিত হইল; শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে চাঁদ মনসাদেবীকে পূজা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পুরোহিত জনার্দ্দন শর্ম্মা বলিলেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র পড়িলাম, তবু বিগ্রহে শক্তির সঞ্চার হইতেছে না কেন? বিস্মিত হইয়া চাঁদ-সদাগর ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলেন, চতুর্ভুজা, স্বর্ণ-খচিত রক্ত পট্টাম্বর-ধারিণী, হংসারূঢ়া, বিষহরী দেবী আকাশ হইতে অবতরণ করিতে উদ্যত হইয়াও যেন মণ্ডপে আসিতে পারিতেছেন না। বেহুলা যুক্তকরে দেবীর

অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে, শুনিতে পাইলেন—সদাগরের মন্ত্রসিদ্ধ হিন্তালের যষ্টির ভয়ে তিনি মণ্ডপে আসিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন। সদাগর বলিলেন, এই হিন্তালের যষ্টির আর ভয় করিবেন না—

"বেহুলা বিনয় করে আসিয়া শ্বশুরে।
হিন্তালের লাঠি তুমি ছুঁড়ে ফেল দূরে॥"

সদাগর তখন হিন্তালের যষ্টি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, সেই দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড মনসাদেবীর ধূনাতে ব্যবহার করিলেন।

দেবীর উদ্দেশ্যে, চাঁদ-সদাগর এই স্তোত্র পাঠ করিলেন—

"দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং
চারুকান্তিং বদন্যাং
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিত-বসনাং
সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈবং।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমুনিগণৈ-
র্নাগরত্নৈরনেকৈ
র্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুচযুগলাং
ভোগিনীং কামরূপাম্॥"

মনসাদেবী প্রীত হইয়া চন্দ্রধরকে বর দিতে চাহিলেন, চন্দ্রধর স্বয়ং সর্ব্বদা কামনার ঊর্দ্ধে থাকিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি কি বর চাহিবেন? বর না চাহিলে পাছে বিষহরি দুঃখিতা হন, এজন্য যুক্তকরে বলিলেন, "আমার পরম সুহৃৎ শঙ্কুর গাড়ুরীর জীবন দান করুন।"

২২

মনসার কৃপায় শঙ্কুর গাড়ুরী প্রাণ পাইল। চাঁদের গৃহে কতকদিন ব্যাপিয়া ক্রমাগত উৎসব চলিল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ সেই উপলক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। আত্মীয়-সভায় একদা চন্দ্রধরের জ্ঞাতি ভ্রাতা উচ্চবংশের দর্পে স্ফীত, নীলাম্বর বণিক্ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "লক্ষীন্দর কোন্ ওঝা বা দেবতার কৃপায় জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহা ভগবান্ জানেন, নবযুবতী কুলবধূ ছয়মাসকাল কি ভাবে কোথায় ছিল—তাহার সাক্ষী নাই, এ অবস্থায় ইহাকে গৃহে রাখা যুক্তিযুক্ত নহে।" চাঁদের বিশাল পুরীতে অসংখ্য লোক উপস্থিত ছিলেন, এই হীন সন্দেহে তাঁহারা লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। অনেকের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। কুটিল সমাজনীতি-প্রাজ্ঞ নবখণ্ডবাসী জনার্দ্দন রায় বলিলেন, "নীলাম্বরের কথা ঠিক, চাঁদ এরূপ বধূকে লইয়া ঘর করিলে বড় নিন্দার কথা হইবে।" বর্দ্ধমানবাসী ধূষদত্ত এই কথায় বলিলেন, "সমস্ত বণিককুল যাঁহার সতীত্ব-মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই পুণ্যশীলার সম্বন্ধে এরূপ কথা আমরা শুনিতে চাহি না।" কিন্তু নীলাম্বর ও ধনপতি এই ব্যাপার লইয়া উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন; তাঁহারা ক্রমেই ইহার কূটার্থ নিষ্কাশন করিয়া, বেহুলা-সম্বন্ধে নিন্দাবাদ গুরুতর করিয়া তুলিলেন, তখন ধূষদত্ত ক্রোধ-কম্পিতদেহে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন, হরিসাধুর সঙ্গে নীলাম্বর দাসের শ্যালক রামরায়ের হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। তখন বিবাদ থামাইবার উদ্দেশে চণ্ডীপ্রসাদ সদাগর কহিলেন, "বেহুলাকে তিন প্রকারে পরীক্ষা করা হউক।"

১. জতুগৃহে তাঁহাকে রাখিয়া, অগ্নিতে সেই গৃহ দাহ করা যাক্; দ্বাপরে শ্রীরামচন্দ্র-মহিষী এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

২. বেহুলাকে শূলে চড়াইয়া পরীক্ষা করা হউক, কলিতে ময়না-নিবাসী কর্ণসেনের পত্নী রঞ্জাবতী পুত্রার্থ এইরূপ পরীক্ষায় স্বয়ং ব্রতী হইয়াছিলেন।

৩. কালভুজঙ্গদংশনে বেহুলা রক্ষা পাইলে তাহার সতীত্ব প্রমাণিত হইবে; উজানীনগরবাসী ধনপতি-সদাগরের স্ত্রী খুল্লনা এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

বেহুলা যদি সতী হন, তবে এই তিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহা প্রমাণিত হইবে এবং তাঁহাকে গৃহে রাখা যাইবে। নীলাম্বর দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং চাঁদ-সদাগরকে সম্মতি দেওয়ার জন্য বাধ্য করিতে চেষ্টা পাইলেন। সদাগর লজ্জায় ও ঘৃণায় হেঁটমুখ হইয়া রহিলেন, জ্ঞাতিগণের বিরুদ্ধে সহসা কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাঁহার মুখ ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল।

অন্তঃপুর হইতে বেহুলা এই উত্তেজিত আলোচনার সংবাদ পাইয়াছিলেন; তিনি লজ্জাত্যাগ করিয়া সেই সভায় উপনীত হইলেন, তাঁহার পদার্পণে একটা পুণ্যজ্যোতিঃ সভাগৃহের উপর পতিত হইল। তিনি অবনতমস্তকে যুক্তকরে সকলকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমার পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা লাভ করিয়াছি, তদবধি আমার সাধ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এখন আপনারা আমাকে বর্জ্জন করিতে চাহিতেছেন, আমি নিজ হইতে বিদায় লইতেছি," এই বলিতে বলিতে বেহুলা সেই সভাগৃহে

পড়িয়া গেলেন। "কি হইল, কি হইল" বলিয়া সকলে তথায় জড় হইয়া দেখিলেন—বেহুলার প্রাণ নাই ; অকস্মাৎ ঊর্দ্ধ হইতে একটি বিদ্যুৎপূর্ণ জ্যোতিঃশিখা সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিল, সকলে বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন সেই বিদ্যুৎমালায় অলঙ্কৃত হইয়া বেহুলা ও লক্ষীন্দর স্বর্গপথে বিলীন হইয়া যাইতেছেন। ইঁহারা ঊষা ও অনিরুদ্ধ, দেব-সভায় কোন নবপ্রেমবিহ্বলা, লজ্জাকুণ্ঠিতা অপ্সরার প্রেমকথা লইয়া রহস্য করাতে দেবরাজ ইঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ; অষ্টজন্মব্যাপক দুঃসহ বিরহ-ব্যথা সহ্য করিয়া, এতদিন পরে ইঁহারা মুক্তি ও মিলনের বিমলানন্দ লাভ করিলেন।

পদ্মাপুরাণে উল্লিখিত আছে, মনসার বরে চাঁদ-সদাগর তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গসহ দিব্যধামে গমন করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর মনসাদেবীর পূজা জগতে প্রচারিত হইতে আর কোন বাধা রহিল না।

জড়ভরত

দ্বিতীয় সংস্করণ

তিন বর্ষের অধিক হইল, জড়ভরতের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান বর্ষে গ্রন্থখানি মেট্রিকিউলেসনের পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে।

১৯ নং কাঁটাপুকুর লেন্,
বাগ্‌বাজার, কলিকাতা
১লা জানুয়ারী, ১৯১২

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

তৃতীয় সংস্করণ

জড়ভরত নিঃশেষিত হওয়ায় পুনরায় মুদ্রিত হইল। এবারও গ্রন্থের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভূমিকা

ভারতবর্ষের একটা বিশেষ কথা আছে, যুগে যুগে ভারতবর্ষ সেই কথা বলিয়া আসিয়াছে। এ দেশে সে কথার ভাণ্ডার অফুরন্ত, সেই কথা বলিতে সেদিনও বঙ্গদেশে রামকৃষ্ণ ও রামমোহন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞমানী লোকেরা বিজ্ঞতার ভাণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহা বাতুলের উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে কথা এ দেশের সার কথা। কাবুলে যেরূপ বেদানা জন্মে, বসোরায় যেরূপ গোলাপ জন্মে—নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দের কথা সেইরূপ বিশেষভাবে ভারতের সামগ্রী।

ভিন্ন দেশের লোকেরা সে কথার মর্ম্ম বুঝুক আর না বুঝুক—আমাদের দেশে রাজা হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই সেই কথার ভাবুক। এই ভাব বুঝিলে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য আমাদের চক্ষে ঘুচিয়া যাইবে। মনে হইবে ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেবমন্দির। এখানে দিবারাত্র পূজার কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিতেছে। কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ বিল্বপত্র ও তুলসীদাম চয়ন করিতেছে, কেহ সংকল্প করিয়া লক্ষ নাম জপ করিতেছে, কেহ নৈবেদ্য সজ্জা করিতেছে, ঘরে ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, গৃহস্থ পুত্রকলত্রাদি লইয়া যেরূপ বিব্রত, সেই গৃহদেবতাকে লইয়াও তেমনি বিব্রত, তাঁহার সেবা এবং পরিচর্য্যার জন্য বরং তাহাকে বেশী ভাবিতে হয়। ভগবানকে এরূপ গৃহের গণ্ডীতে আনিয়া অপরিহার্য্য অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে আর কোথায় দেখা যায়? কোটি কোটি কণ্ঠের 'মা' 'মা' শব্দ, কোটি কোটি হস্তের পুষ্পাঞ্জলি জগন্মাতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইতেছে। এখানে প্রস্তরখণ্ড, মৃন্ময়স্তূপ,

অশ্বত্থ বৃক্ষ সকলই ঠাকুরের প্রকাশ বুঝাইতেছে। এস্থানে ভগবানের নাম অগ্রে না লিখিয়া কেহ দু'কথা লিখিতে চাহে না, এখানে ভগবানের নাম ছাড়া সন্তানের অন্য কোন নাম রাখিয়া পিতা তৃপ্ত হন না, ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া কেহ আহারে প্রবৃত্ত হয় না। এখানে যে বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, কেহই স্বশক্তির উপর নির্ভর করে না, 'কোথায় দীনবন্ধু' বলিয়া নিঃসহায়ভাবে তাঁহারই কৃপাভিক্ষা করে। এখানে পথে ঘাটে বৈষ্ণবের দল ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করিতেছে, মায়ের লীলা কল্পনা করিয়া আগমনী গাইতেছে। পঞ্জিকায় প্রতি তিথিতে গৃহস্থের জন্য ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থা আছে। পার্থিব সুখ কিছুই নহে—তাহা বুঝাইবার জন্য শত শত বাউল একতারা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেছে। যাত্রা, কথকতা, কবির গান—সমস্তই ভগবৎ লীলারসে মধুর, পল্লীর কৃষকও সেই রসপানে উন্মত্ত।

এই ধর্ম্মকথায়ই আমাদের ঐক্য। সেদিন অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে যে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল, কে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। কুম্ভমেলার সেই সিন্ধুর তরঙ্গের ন্যায় অগণিত যাত্রীর দল কাহার চেষ্টায় একত্র হইয়া থাকে। অন্য প্রসঙ্গে ডাকিতে যাও দেখিবে ঘরে ঘরে অনৈক্য। কিন্তু যে স্থানে প্রকৃত জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত, সেখানে মুমূর্ষু ব্যক্তিও সজাগ; সেও শুধু প্রাণত্যাগ করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য কাশীতে ছুটিয়া যাইতেছে। এই ধর্ম্মকথায়ই ভারতের কর্ম্মগৌরব; তীর্থস্থানগুলিতে সর্ব্বপ্রকার কায়িক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া উপবাসকৃশ সহস্র সহস্র নরনারী কি অসামান্য অনুষ্ঠান করিতেছে। এখানে প্রীতি দেখিবে—ভারতীয় সাধুর বদনারবিন্দের সুধামধুর হাসিতে তাহা পাইবে; ভোগ-বাসনা বিরহিত ত্যাগমহিমায় সমুজ্জ্বল সেই

ভূমিকা

হাসি অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্ম্মল। এই ঐক্য এই কর্ম্ম, এই প্রীতি জগতের অন্যত্র বিরল।

ভারতবাসী গৃহস্থ—সে আহার বিহার ভোলে নাই, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে উদাসীন। শ্মশানবাসী দেবতাকে সে পূজা করিয়া থাকে। সংসারের দিকে তাহার একটা চক্ষু আছে, কিন্তু অপর চক্ষু শ্মশানের দিকে বদ্ধলক্ষ্য। সংসার যদি সত্য হয়, শ্মশান তদপেক্ষা মহত্তর সত্য, এ কথা আধুনিক সভ্য জাতিরা ভুলিয়া গিয়াছে। ভারতবাসী রাজনৈতিক পাণ্ডা চাহে না, সে চাহে মন্ত্র-গুরু। সে ক্ষণিক উত্তেজনায় মাতে না, সে আজন্ম সাধনা করিতে চাহে।

হে ভারতবাসী! তোমার ভগবান্ আবার পাঞ্চজন্য শব্দে তোমায় সেই সাধনার পথে আহ্বান করিতেছেন। যাহা ক্ষণিক, অস্থায়ী ও নশ্বর, তোমার ভগবান্ সেরূপ লক্ষ্যে তোমাকে যাইতে দিবেন না। যাহা চিরকালের জন্য সত্য, চিরসুন্দর ও অমর সেই আদর্শ তোমার চক্ষের সম্মুখে ছিল, পুনরায় তোমার কুটীরে তাহার প্রতিষ্ঠা পাইবে।

আমি জড় ভরতের প্রসঙ্গে সেই প্রাচীন আদর্শ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যুগধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ সর্ব্বকালের পূজনীয়—যদি লিপি-কৌশলের অভাবে আদর্শ যথাযথ চিত্রিত না হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

১৯, কাঁটাপুকুর লেন,
বাগ্‌বাজার, কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩১৫

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১

রাজর্ষি ভরত সংসারে বীত-রাগ হইয়া বনে চলিলেন।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমাব রাষ্ট্রভৃতের সঙ্গে তৃতীয় কুমার আবরণের সদ্ভাব ছিল না। মহিষী পঞ্চজনী জ্যেষ্ঠ কুমারের পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্য আবরণের সঙ্গে তাঁহারও মনান্তর ঘটিয়াছিল। রাষ্ট্রভৃৎ কতকটা উদার-প্রকৃতি, কিন্তু সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় কার্য্য করিতেন; এদিকে আবরণ স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন, স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি জ্যেষ্ঠ কুমারের বিরক্তিকর নানাবিধ কার্য্যে রত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সুদর্শন সংসারসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও আমোদ-প্রিয়; তিনি যখন দেখিতেন, ভ্রাতৃ-বিরোধে গৃহ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, তখন বংশীহস্তে একাকী মন্দা-নদীর তীরে যাইয়া ভৈরব-রাগ সাধনা করিতেন।

ভরত গৃহে শান্তি-স্থাপনের জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ কুমারকে তিনি অতিথিশালার ভার দিয়াছিলেন। সর্ব্বদা যথানিয়মে অতিথি-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিলে হৃদয়ে মহত্ভাব ও সেবা-বৃত্তি জাগ্রত হইবে, ভ্রাতৃ-বিদ্বেষের মূল এই ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এই তাঁহার ধারণা ছিল।

অতিথিশালায় রাজকুমারের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উৎস সঞ্চারিত হইত, লোকে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত, সামান্য ভৃত্যের কার্য্যও তিনি অনেক সময়ে নিজ হস্তে করিয়া অতিথিগণের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। সমস্ত রাজধানীময় তাঁহার সুযশঃ প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার মান-অভিমান ছিল না—অকুণ্ঠিতভাবে তিনি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন। অথচ গৃহে আবরণের একটি কথায় তাঁহার

উচ্চভাব কোথায় চলিয়া যাইত! ভ্রাতৃ-বধূ শান্তশীলা তৎসম্বন্ধে পরিজনগণের নিকট কোন প্রকার কুৎসা বা শ্লেষোক্তি করিয়াছেন এরূপ শুনিলে রাষ্ট্রভৃতের জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত। ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতৃ-বধ করিতে অগ্রসর হইতেন। আবরণও তখন উন্মত্তের ন্যায় খড়্গ-হস্ত হইয়া দাঁড়াইতেন। রাজা স্বয়ং দুই ভ্রাতার মধ্যে পড়িয়া যেন দুইটি ক্ষুব্ধ সিংহকে পৃথক্ করিয়া দিতেন।

আবরণকে রাজা স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিতেন। সস্নেহে তাহাকে গুরুজনের প্রতি ভক্তির উদাহরণ-স্বরূপ পূজ্যপাদ মহাপুরুষগণের কাহিনী শুনাইতেন। স্ত্রীবুদ্ধিতে যে অনেক সময় গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনাইতেন। বুদ্ধিমান্ পুত্রের এই সকল ইতিহাসের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কোনই বিলম্ব দেখা যাইত না। রাজা ভাবিতেন, সুবুদ্ধি পুত্রের এইবার চরিত্রের সংশোধন না হইয়া যায় না; কিন্তু মাতাকে দেখামাত্র অনেক সময় অসহ্য বিরক্তিতে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইত এবং শান্তশীলার নিকটে গার্হস্থ্য-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত স্বরে রাজাকে বলিতেন—"আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিন, কোন ক্রমেই মা ও দাদার সঙ্গে একগৃহে আর থাকা হইবে না।"

রাজা মহিষী পঞ্চজনীকে তাঁহার পক্ষপাতদোষ ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিতেন, "তোমার ন্যায়-অন্যায় বোধ নাই, কি ভাবে যে তুমি রাজ্যপালন কর, তাহা আশ্চর্য্য। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে যে দোষী তাহাকে দণ্ড না দিয়া সখ্য স্থাপনের বৃথা প্রয়াস পাইতেছ।"

রাজা গৃহ-বিবাদে একান্ত বিরক্ত হইলেন। যখন তাঁহার উদ্ভাবিত

সমস্ত উপায় বিফল হইল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেদ-বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মবুদ্ধি চরিত্র সংশোধন করিতে পারে না, "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম্মবাধ্যতে"। তাহা না হইলে এই দুই বুদ্ধিমান্ পুত্র এরূপ বিসদৃশ অভিনয় করিতেছেন কেন? রাজা ভাবিতেন, যদি এই সংসারে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তী নিরীহ কাহাকেও পাইতেন, তবে তিনি ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারিতেন।

বিরক্ত হইয়া রাজা উদাসীনের মত বনে চলিলেন। পঞ্চজনী অনেক করিয়া সাধিলেন। পুত্রেরা চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। 'আর বিবাদ করিবে না' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিল। রাজা বলিলেন, "তোমাদের কথায় আমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু যদি তোমরা শান্তির জন্য প্রকৃতই ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে তোমাদের গৃহ-সুখ অক্ষুণ্ণ হইবে—তাহা সর্ব্বতোভাবে তোমাদের ইষ্টের জন্য। কিন্তু আমি আর গৃহে ফিরিব না। পক্কফল আর শাখায় থাকে না, সংসারের সঙ্গে আমার যে বন্ধন ছিল তাহা স্বাভাবিকক্রমেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রৌঢ় বয়স অতিক্রম করিয়াছি, শাস্ত্রানুসারে বানপ্রস্থই আমার অবলম্বনীয়।"

২

রাজা ভরত পুলহ-ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; পুলহ তখন শিষ্য ভরদ্বাজ এবং আত্রেয়ের সাহায্যে অগ্নি জ্বালিয়া হোমের উদ্যোগ করিতেছিলেন। অদূরে অপর শিষ্য ভামহ কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতেছিলেন এবং শাকটায়ন গুরুদেবের হস্তে স্রুক্ প্রদান করিতেছিলেন। গালব একপার্শ্বে কুশ ও দর্ভাঙ্কুর সজ্জিত করিয়া কদলীপত্রের এক প্রান্তে

শ্বেতচন্দন ঘষিয়া রাখিতেছিলেন। তখন সূর্য্যদেবের অস্তোন্মুখ কিরণ এক দিকে বজ্র পর্ব্বতের শৃঙ্গে স্বর্ণ-কিরীট প্রদান করিতেছিল, অপর দিকে গণ্ডকীর জল রক্তিমাভ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কৃষ্ণবর্ণ বসনের অন্তরালে যাইতেছিল।

এমন সময় তাঁহারা সকলে দেখিতে পাইলেন, সুদীর্ঘ সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়বয়স্ক এক পুরুষবর দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহার পরিধান রক্ত পট্টাম্বর—তাহার প্রান্তভাগ স্বর্ণের কারুকার্য্যময়, রক্ত-ক্ষৌমবাস উত্তরীয়-স্বরূপ কণ্ঠলগ্ন হইয়া কটিতে অবহেলাক্রমে আবদ্ধ, কর্ণে দুইটি হীরক-কুণ্ডল।

পুলহ মুনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে রাজা প্রণাম করিলেন। পুলহ বলিলেন, "মহারাজ ভরত, আপনার এ বেশ কেন? আপনার পরিচারকবর্গ, রথ, অশ্ব কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আপনাকে একাকী এ বেশে দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে, আপনার কোন ঘোর বিপদ উপস্থিত, নতুবা আপনি সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, শিষ্যগণ, এই রাজ-অতিথির সম্বর্দ্ধনা কর।" তাহারা গুরুর নিয়োগানুসারে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভামহ চুপে চুপে শাকটায়নকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কি সেই রাজ-চক্রবর্ত্তী মহারাজ ভরত যিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস প্রভৃতি নানা পুণ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পৃথিবীতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন?" শাকটায়ন বলিলেন, "শুধু কি তাই? ইঁহার গৃহে হোমানল কখনই নির্ব্বাপিত হয় না, শত শত ঋত্বিকগণ তথায় দিবারাত্র আহুতি প্রদানার্থ হবিঃ লইয়া ব্যস্ত থাকেন, ইঁহার তুল্য অতিথিসেবা জগতে কেহ জানে না,—চতুর্হোত্র বিধিদ্বারা ইনি সর্ব্বদা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।"

কুশ, জল প্রভৃতির দ্বারা অতিথি সম্বর্দ্ধিত হইলেন। তখন পুলহ শিষ্যবর্গকে বলিলেন, "ইনি সামান্য মনুষ্য নহেন; এই ভূখণ্ডের নাম পূর্ব্বে 'অজ-নাভ' ছিল, এই মহারাজের নাম হইতে তাহা 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত হইয়াছে।" রাজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজের শুভাগমনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।"

বিনীত ভাবে ভরত বলিলেন, "মহর্ষি, আমি আপনার আশ্রমে বাস করিয়া শিষ্যভাবে উপদেশ লাভ করিব, আমি আর সংসারে ফিরিয়া যাইব না, আমাকে শিষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রদান করুন।"

মহর্ষি পুলহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সে উত্তম কথা, কিন্তু আপনি এই ঋষি-জীবনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন ত?"

ভরদ্বাজ হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়, যে সমস্ত পুণ্যকার্য্য করিয়াছেন, তাহা ক্ষত্রিয় নরপতিগণের গৃহ-ধর্ম্মের আদর্শ, কিন্তু নিবৃত্তিমূলক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অতি কঠোর। রাজাদিগের পঞ্চাশোর্দ্ধে সস্ত্রীক বানপ্রস্থের ব্যবস্থা আছে, তাহা আপনার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু মহর্ষির শিষ্যগণের ন্যায় দুশ্চর তপস্যা এই বয়সে আপনার পক্ষে সহজ হইবে না।"

ভামহ বলিলেন, "আপনাকে বল্কল পরিতে হইবে, ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে, নিয়মিত দিনে উপবাস করিতে হইবে, ফলমূলের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইবে, দেহকে দিনরাত্রি একটি যন্ত্রবৎ নিয়মিত করিয়া সংযম-ব্রতী হইতে হইবে। মনের সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপ দূর করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে ব্রহ্মে আরোপ করিতে হইবে। কুশ, তৃণ যজ্ঞকাষ্ঠ ও হোমানল প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টায় এবং গুরু-পরিচর্য্যায়

হীনতম ভৃত্যের কার্য্য অভ্যাস করিতে হইবে। মহারাজ, বিরক্ত হইবেন না, আপনি যে রাজসিক ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত অভ্যাস করিয়াছেন,—সাত্ত্বিক ধর্ম্মের পথ সেরূপ নহে, ইহা অতি দুশ্চর-তপস্যা।"

আত্রেয় বলিলেন, "আমরা শিশুকাল হইতে এই তপোবৃত্তি অভ্যাস করিতেছি, এজন্য ইহা কতকটা সহজসিদ্ধ হইয়াছে; আপনার যে বয়স, তাহা সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিবার পক্ষে উপযোগী নহে।"

পুলহ বলিলেন, "তোমরা কেন এই মুমুক্ষু মহাজনের তপস্যার চেষ্টায় বিঘ্ন জন্মাইতেছ? বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় সিদ্ধ-ঋষি হইয়াছেন, ইনি কেন না পারিবেন? মহারাজ, আপনি এ আশ্রমে থাকা স্থির করিয়াছেন ত?"

রাজা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আমার লক্ষ্য অটল, এখন দয়া করিয়া আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন।"

পুলহের নির্দেশানুসারে তিনি গণ্ডকীর জলে রক্তবর্ণ স্বর্ণ পট্টাম্বর ও উত্তরীয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বৃক্ষ-বল্কল পরিধান করিলেন; কর্ণের দুইটি উজ্জ্বল ও বহুমূল্য হীরক-কুণ্ডলকেও তিনি গণ্ডকীতে বিসর্জ্জন করিলেন, তাহা জলে নিক্ষেপ করিবার সময় রাজার একবারও মনে হইল না যে, এই দুইটি হীরকখণ্ডের জন্য তাঁহার পিতা ঋষভদেব শতকুম্ভ নামক অসুরের সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষকাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৩

শিষ্যগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া গেল, দীনহীন বালকের ন্যায় সেই প্রৌঢ়বয়স্ক রাজচক্রবর্ত্তী ভরত সমিধ ও কুশ হস্তে যুক্তকরে সর্ব্বদা মহর্ষির আদেশ প্রতীক্ষা করিতেন। যিনি চর্ম্মাচ্ছাদন-শোভিত হস্তিদন্তের শুভ্র পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতে অভ্যস্ত, তিনি কঠোর মৃত্তিকায় শুইয়া পরিমিত সময়ে সুনিদ্রা লাভ করেন। যাঁহার মহার্ঘ আহার্য্যের জন্য সূপকারগণ নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন, তিনি সংযত ভাবে আনন্দসহকারে কষায় বন্য ফল মূল খাইয়া তৃপ্ত। ঋষির আশ্রমখানি তিনি নিজ হস্তে মার্জ্জনা করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতেন, প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উত্থানপূর্ব্বক গণ্ডকী-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক পুলহের নিদেশানুসারে রেচক, পূরক, কুম্ভক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি সাধন করিতেন। ঋষির শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুণ্যজীবন সেই আশ্রমে যেন এক অভিনব প্রভাব বিস্তার করিল।

পুলহ একদিন বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সাধনা অতি দ্রুত হইতেছে, ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ অপেক্ষাও আপনি ক্ষিপ্রতর সাধনার পথে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এখন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় আজন্মসাধনা রক্ষা করিতে পারিলে আপনি এ আশ্রমকে ধন্য করিবেন, সন্দেহ নাই।"

পুলহ দেখিলেন, ব্রহ্মানন্দ লাভের যে সকল চিহ্ন, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে রাজ-শিষ্যের মুখমণ্ডলে প্রকট হইয়াছে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের ভাবে সেই আনন্দ ধরা পড়িতেছে। সেই জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে যে অপূর্ব্ব বিনয় ও জীব-প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহার লক্ষণ তিনি শিষ্যপ্রবরের

মধ্যে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। পুলহ ভাবিলেন, 'এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সাধনার এরূপ ফল প্রত্যক্ষ হইতে আমি দেখি নাই, ইনি নিশ্চয়ই বহু জন্মের তপস্যা দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহার এতদূর পুণ্য-প্রভাব, তিনি ব্রাহ্মণকুলে যোগ-সাধনার মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া ক্ষত্রিয়-কুলে রাজসিক ভাবের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন কেন?'

পুলহ রাজাকে কঠিনতর ও নির্জ্জনতর যোগ-পন্থা দেখাইয়া দিলেন। ভরত সমাহিত হইয়া মহর্ষির উপদেশানুসারে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রমে অতি কঠোর ব্রতে ব্রতী হইতে লাগিলেন—প্রতি তৃতীয় দিনে মাত্র কপিত্থ ও বদরী ফল ভক্ষণ করিতেন, কখনও সামান্য শীর্ণ তৃণ-পত্রাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ভগবানের সাধনা করিতেন। তাঁহার দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল, কেবল অন্তরাত্মা অপূর্ব্ব ভগবৎরূপ ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়া সমস্ত কুণ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক তচ্চরণাম্বুজে লগ্ন হইয়া রহিল। কখনও তিনি দেখিতেন, সমস্ত বনফুল মাল্যের মত কাহার বিরাট্ দেহের শোভা-সম্পাদন করিতেছে, আকাশ ও পৃথিবীর স্নিগ্ধ নীলিমা সেই বরাঙ্গের জ্যোতিঃস্বরূপ নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছে। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী বরাভরণের ন্যায় সেই দেহের দীপ্তি সাধন করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্য মুকুট-মণির উজ্জ্বল শ্রী পরিয়া আছে, শ্রীপাদ হইতে করুণার ধারার ন্যায় কত গঙ্গা কল কল নিনাদ করিয়া ছুটিতেছে; পাপাসুরনাশন কত আয়ুধ হস্তে শোভা পাইতেছে, ভক্তের অভয়চিহ্ন স্বরূপ দীপ্ত পঙ্কজ এক হস্তে ধৃত রহিয়াছে এবং তাঁহার বাণী পাঞ্চজন্য শঙ্খের স্বরযোগে অম্বুদনিনাদের ন্যায় বিশ্বের কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাজর্ষির চক্ষুঃ পদ্মলীন ভ্রমরের ন্যায়, ঊর্দ্ধপক্ষ্মান্তরালে বিলীন হইত, সমস্ত দেহে আনন্দচ্ছটা পড়িত। সেই অবস্থায় যিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন, তিনি ভাবিতেন গণ্ডকীর তীরে কোন দেবতা যোগ-সাধনা করিতেছেন।

৪

কখনও কখনও মহিষী পঙ্কজনীর মুখখানি মনে হইত। রাজপুরীর আনন্দ-নিকেতন তাঁহার স্মৃতিতে উদিত হইলে তিনি ব্যথা বোধ করিতেন, কিন্তু প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত পথ নিরোধ করিয়া যখন তিনি ধ্যান-পর হইতেন, তখন সংসারের কোন ভাবনাই তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিত না। মহারাজ ভরত সর্ব্বত্র রাজর্ষি বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন, পুণ্যরত মহর্ষিগণের মুখে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

গালব, ভরদ্বাজ, ভামহ প্রভৃতি পুলহ-শিষ্যগণকেও স্বীকার করিতে হইল, রাজর্ষি অল্প সময়ের মধ্যে যোগ-পথে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছেন।

একদিন ভামহ প্রাতঃকালে রাজর্ষি ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার তপের কোন বিঘ্ন হইতেছে কি না?

প্রসন্ন মুখে ভরত বলিলেন, "পুলহ-আশ্রমের সন্নিধানে পুণ্যতোয়া গণ্ডকীর তীরে তপঃপথের অন্তরায় কি থাকিতে পারে?"

ভামহ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; শুনিয়াছি বনবাসী হইলেও সংসারের চিন্তা

হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন। আপনার পরিত্যক্ত পরিজনগণের চিন্তা আপনাকে যোগ-ভ্রষ্ট করিতে পারে।"

ভরত নিশ্চিন্ত মনে হাসিয়া বলিলেন, "সে আশঙ্কা মাত্রও নাই, আমি চিত্ত-সংযম অভ্যাসপূর্ব্বক হৃদয় হইতে পরিজনবর্গের মায়া দূর করিয়াছি, এমনকি, মহিষী পঞ্চজনী কিংবা আমার প্রিয় পুত্রবর্গ আমার নিকট এখন যেরূপ—জগতের একটি সামান্য কীট পতঙ্গও তদ্রূপ —আমি আর মোহের বশবর্ত্তী নহি; হৃদয়ে সমস্ত জীবের জন্য করুণা অনুভব করিতেছি।"

"একমাত্র করুণাময় ভগবানই করুণা করিতে পারেন, আমরা সকলেই করুণার পাত্র"—এই বলিয়া ভামহ চলিয়া গেলেন। কথাটা শুনিয়া রাজর্ষি খানিকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা চিত্ত স্থির করিয়া তর্পণার্থ গণ্ডকীর সলিলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অনন্যমনা হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা ভীতিপ্রদ গর্জ্জন-শব্দে রাজার যোগভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া সেই শব্দ শুনিলেন; বুঝিলেন—গণ্ডকীর পূর্ব্বস্থিত অপর তীরের অদূরবর্ত্তী বজ্র-পর্ব্বতে সিংহ গর্জ্জন করিতেছে, সেই শব্দ স্তিমিত মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় দূর হইতে গুরুগম্ভীর ভাবে শোনা যাইতেছে। রাজা উপেক্ষার সহিত চক্ষুঃ পুনরায় নিমীলিত করিবেন, এমন সময় একটি সকরুণ দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল।

গণ্ডকীর অপর তীরে তৃণ-গুল্মের মধ্যে একটি পূর্ণগর্ভা হরিণী জল-পানার্থে নদীর ধারে উপস্থিত হইয়াছিল; সে সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া ভীতনেত্রে ইতস্ততঃ চাহিয়া প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে গণ্ডকীর জলে ঝাঁপিয়া পড়িল। এই ভয় ও উল্লম্ফন-বেগে জলমধ্যেই সে প্রসব করিয়া

ফেলিল, এবং করুণনেত্রে রাজার দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

রাজা দেখিলেন, সদ্যোজাত হরিণ-শিশু গণ্ডকীর তীরের নিকট ভাসিয়া যাইতেছে। অপার করুণায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল, তিনি মাতৃ-হীন হরিণশিশুকে জল হইতে তুলিয়া আনিলেন। হোমের যে অগ্নি তাঁহার কুটীরপার্শ্বে জ্বলিতেছিল, সেই অগ্নির তাপে মৃতপ্রায় শাবকের দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল, হরিণ চক্ষু মেলিয়া রাজার দিকে চাহিল—শিশু যেরূপ মাতার দিকে নির্ভরের ভাবে চাহে, মাতৃহীন হরিণশাবক তেমনই দৃষ্টিতে রাজার দিকে চাহিল, রাজার হৃদয় সেই দৃষ্টিতে বিগলিত হইয়া গেল।

তিনি ভগবানের দানস্বরূপ এই ক্ষুদ্র জীবটিকে পাইয়াছেন, ইহাকে তিনি আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এখন ইহাকে বাঁচাইবেন কি প্রকারে?

রাজা শিশুটি ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লোকালয়ের অভিমুখে ছুটিলেন এবং ভিক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে খাওয়াইলেন; অবশিষ্ট দুগ্ধটুকু কমণ্ডলুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং প্রসূতী যেরূপ স্নেহের সহিত দুধের বাটি সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকেন এবং তাহা গরম করিয়া মাঝে মাঝে শিশুকে ঝিনুক দ্বারা পান করান, রাজর্ষি ভরত ঠিক তদ্রূপই করিতে লাগিলেন। হোমানলের জন্য সংগৃহীত কাষ্ঠ হরিণ-শিশুর দুধের উষ্ণতা সঞ্চারের জন্য পুনঃপুনঃ প্রজ্বালিত হইতে লাগিল। প্রাতঃ-কালে ও অপরাহ্ণে রাজাকে হরিণশিশুর দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য ছুটিতে হয়, এবং অবশিষ্ট সময়ের অনেকাংশ সেই দুগ্ধ গরম করিয়া অতি সাবধানে তাহাকে পান করাইতে ব্যয়িত হইয়া যায়; কখনও বা তিনি সস্নেহে

হরিণটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার কণ্ঠমূল ও ললাট কণ্ডূয়ন করিতে থাকেন, শাবক আরাম পাইয়া চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া সেই আদর উপভোগ করিতে থাকে, কখনও বা পরম তৃপ্তির সহিত চক্ষুঃপত্র প্রসারিত করিয়া নীরবে রাজার প্রতি সৌহার্দ্দ্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক পুনরায় তাহা নিমীলিত করে। রাজা ভাবিতেন, হরিণশিশুটি অতি আশ্চর্য্য—ইহার স্বভাব ঠিক মানব-শিশুর মত,—এই ভাবিয়া তিনি মনে মনে আনন্দিত হইতেন; কখনও বা দেবকার্য্যের জন্য আহৃত কুশ ও দূর্ব্বার কোমলাংশগুলি হরিণশিশু তাহার নবোদ্গত দন্তাগ্রে ছিন্ন করিয়া আহার করিত। রাজা কপট-ক্রোধে তাহাকে বলিতেন, "যা!—দেবতার উদ্দেশে সংগৃহীত উপকরণ উচ্ছিষ্ট করিয়া ফেলিলি!" সে কথায় শাবক থমকিয়া দাঁড়াইত ও করুণনেত্রে রাজার দিকে চাহিয়া থাকিত; রাজা আদরের সহিত তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিতেন, "ওভাবে তাকাইয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে না, যা করেছিস বেশ করেছিস।"

কখনও বা রাজা দাঁড়াইয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তখন হরিণশিশু স্বীয় তরুণ দন্ত দ্বারা রাজার পরিধানের বাকল টানিতে থাকিত; রাজা ভগবানের চিন্তা ভুলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং বলিতেন, "তোকে এমন স্নেহ কে শিখাইল—তুই কি আমাকে ছাড়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিস না?"

কোনও দিন দূরস্থিত শৃগাল দেখিয়া রাজা জপের মালা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি হরিণ-শিশুকে কোলে তুলিয়া কুটীরে রাখিয়া আসিতেন। পাছে বনের শৃগাল বা বৃক শাবককে লইয়া যায়, এই ভয়ে রাজার রাত্রে সুনিদ্রা হইত না, তিনি রাত্রে বারংবার উঠিয়া কুটীরদ্বার ভাল করিয়া

বদ্ধ করিতেন। সংগৃহীত বন-লতা যথেষ্ট শক্ত নহে ভাবিয়া গভীর কানন হইতে সুদৃঢ় লতা আনিয়া তিনি দ্বার ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং এক দিনের সংগৃহীত লতা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া পরদিন পুনরায় বন-লতার সন্ধানে ছুটিতেন। কখনও হরিণ-শিশু নিদ্রা যাইত,—রাজা জপের মালায় অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে সেই নিদ্রিত শাবকের মুখমণ্ডল দেখিয়া স্নেহাতিশয্যে তাহাকে চুম্বন করিতেন। কখনও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য বনে যাইবার সময় হরিণ-শাবককে স্কন্ধে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, গৃহে রাখিয়া গেলে পাছে শৃগালে খাইয়া ফেলে, এই আশঙ্কা। কখনও রাজা দেখিতেন, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে হরিণশিশু লাফাইয়া লাফাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, রাজা বারংবার মুখ ফিরাইয়া দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সেই দৃশ্য-দর্শনে পরম সুখানুভব করিতেন।

৫

পুলহ ও পুলস্ত্য—এই দুই মহর্ষি রাজার কুটীরে উপনীত হইলেন, তখন রাজা জপ করিতেছিলেন। করাঙ্গুলী তুলসীমালার মধ্যে দ্রুতবেগে ঘুরিতেছিল, কিন্তু রাজা ভাবিতেছিলেন—কুটীরপার্শ্বের দর্ভাঙ্কুর সরস ও তরুণ নহে। গত কল্য অদূরবর্ত্তী পল্লীর নিকট যে ক্ষেত্র তিনি দেখিয়াছেন, কাশকুসুমের অন্তরালে সেই ক্ষেত্রে অতি রমণীয় দূর্ব্বা জন্মিয়াছে, হরিণ-শিশু সেগুলি অতি আহ্লাদসহকারে আহার করিয়াছে। আজ সেই ক্ষেত্রে উহাকে লইয়া যাইতে হইবে, তিনি স্বয়ং ক্ষেত্রের পার্শ্বে বসিয়া জপ করিবেন ও সেই দৃশ্য দেখিবেন। ক্ষণে মনে

হইতেছে, সুন্দর নধরকান্তি হরিণ-শিশুটিকে দেখিয়া বনের শৃগালগুলি ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে উঁকি মারিয়া থাকে। সেদিন তাঁহার হস্তে দণ্ড ছিল না, একটা শৃগাল প্রায় আসিয়া হরিণের উপরে পড়িয়াছিল, আজ নিকটবর্ত্তী বন হইতে তিনি একটি সুদৃঢ় শালশাখার দণ্ড প্রস্তুত করিবেন, তাহা সর্ব্বদা ঘুরাইয়া উচ্চশব্দ করিতে থাকিবেন, শৃগালগুলি তাহা হইলে পলাইয়া যাইবে। এই সময় হরিণ-শিশুটি তাঁহার গাত্র-লগ্ন বাকল ঈষৎ লেহন করিতে করিতে পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইল, রাজা তখন পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

পুলস্ত্য ও পুলহ রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, রাজা তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই; তিনি জপে নিযুক্ত, কিন্তু হৃদয় হরিণ-শিশুটির উপর পড়িয়াছে।

পুলহ গম্ভীর-দীর্ঘস্বরে বলিলেন, "রাজন্, কি করিতেছেন! আপনি যোগভ্রষ্ট। আপনি গৃহে ফিরিয়া যাউন, এই আশ্রমে থাকা আপনার পক্ষে শোভন নহে।"

রাজা এবার ঋষিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি এই হরিণশিশুটির জীবন রক্ষা করিয়াছি, এবং নিরপরাধ, বিমাতৃক, নিরাশ্রয় জীবকে পালন করিবার ভার লইয়াছি, ইহাই কি আপনার বিরক্তির কারণ?"

পুলহ বলিলেন, "আপনি যে মায়ার হাত এড়াইবার জন্য গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, একটা সামান্য হরিণ আপনাকে আবার সেই মায়া-চক্রে ফেলিয়াছে, আপনি এ আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন।"

রাজা বলিলেন, "ইহা মায়া নহে, জীবে দয়া—এই দয়ার অনুশীলনে

মোক্ষের বাধা হইতে পারে না। যে অবস্থায় ইহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি, তাহা কি অন্যায় হইয়াছে ?”

পুলহ বলিলেন, “সেই ভাবে রক্ষা করিয়া আপনার ইহাকে কোন গৃহস্থের হস্তে দান করা উচিত ছিল।”

রাজার দৃষ্টি এই সময়ে স্নেহাতিশয্যে হরিণের প্রতি আবদ্ধ হইল এবং তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “তাহা হইলে আর দয়ার ক্ষেত্র কোথায় রহিল ?”

তখন পুলস্ত্য পুলহের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, “চলুন, আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করি, রাজা কুতর্ক করিতেছেন, ইঁহার বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিভ্রম হইয়াছে, ভগবান অগ্নি-শলাকাদ্বারা পুনরায় ইঁহার চক্ষু ফুটাইবেন, আমাদের উপদেশ বা পরামর্শে ইঁহার কিছু হইবার নহে। দেখিতেছেন না, ইঁহার চক্ষু মায়াজড়িত, তাহাতে ব্রহ্মানন্দের লেশ নাই।”

এই বলিয়া পুলস্ত্য পুলহকে তৎস্থান হইতে লইয়া গেলেন। তখন রাজা নিশ্চিন্ত মনে হস্তদ্বারা হরিণ-শিশুর গ্রীবানিম্ন কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। হরিণ বড় হইয়া উঠিয়াছে। রাজার সেই সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু তিনি পূর্ণমাত্রায় গৃহস্থ। তাঁহার কমণ্ডলু হরিণের জলপানপাত্রে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার দণ্ড নেকড়ে ব্যাঘ্র তাড়াইবার অস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছে। এখন আর সবল পুষ্টদেহ হরিণ শৃগালগণের লোভের বস্তু নহে, নেকড়ে বাঘ মধ্যে মধ্যে উহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। রাজা ভারে ভারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহা হোমাগ্নির জন্য নহে। শীতকালে সেই কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালাইয়া হরিণের গাত্রে সেক প্রদান করেন। বর্ষাকালে

বৃষ্টিসিক্ত হরিণের দেহ তিনি স্বীয় বল্কলদ্বারা মার্জ্জনা করেন; নব নব দূর্ব্বাঙ্কুর ও সরস দূর্ব্বা তিনি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন —দেবার্চ্চনার জন্য নহে, কি জানি যদি বর্ষা-নিবন্ধন কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি হরিণকে লইয়া ক্ষেত্রে না যাইতে পারেন—তবে সেই সঞ্চিত শষ্প-লতায় হরিণের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে।

আর কখনও যদি হরিণ একটুকু তাঁহার চক্ষের আড়ালে গিয়াছে—অমনি উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন, এবং হরিণের পদশব্দ শুনিয়া আশ্বস্তভাবে দীর্ঘনিশ্বা ত্যাগপূর্ব্বক জপের মালা লইয়া গণ্ডকীর তীরে আহ্নিকে মনোনিবেশ করেন।

৬

একদিন হরিণকে কুটীরে রাখিয়া গণ্ডকীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় অনেকগুলি বন্য হরিণ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল—রাজার হরিণটি চকিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া ঘ্রাণ দ্বারা কি একটা আনন্দ অনুভব করিল এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিল। একটা বন্য হরিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে চলিয়া গেল—রাজার আশ্রমের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে, রাজা হরিণের গাত্রলগ্ন ধূলি মার্জ্জনা করিবার জন্য কমণ্ডলু ভরিয়া জ লইয়া কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন।

আসিয়া দেখিলেন, হরিণ নাই! অমনি ব্যগ্র-ভাবে উৎকণ্ঠার সহিত চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া হরিণকে ডাকিতে লাগিলেন।

নির্জ্জন আশ্রমে যেন সেই সকরুণ আহ্বানের একটা ব্যঙ্গময় প্রতিধ্বনি উঠিল। রাজার কটির বল্কল এলাইয়া পড়িল, তিনি আত্মহারা হইয়া হরিণের উদ্দেশে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

হিমালয়ের যে শৃঙ্গের নাম ধবলগিরি, তাহারই পাদমূল হইতে গণ্ডকী নদী ছুটিয়াছে এবং তথা হইতে ভিন্নাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ আর একটি অনতি-উচ্চ কূট গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কূটের নাম দেব-সখা—দেব-সখার গাত্র স্পর্শ করিয়া অপর দিকে ধূসর বর্ণ, বিরল-শৃঙ্গ বজ্র-পর্ব্বতের উপত্যকা-ভাগ গণ্ডকীর তীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহাতে লোধ্র ও কুন্দ কুসুমের অপর্য্যাপ্ত সম্ভার। পূর্ব্বে সুদর্শন নামক এক-শৃঙ্গ শৈল, তাহা যেন চিত্রের ন্যায় অম্বরপটে অঙ্কিত রহিয়াছে; এই শিলা-সমুচ্চয়ের মধ্যে প্রবল বেগে গণ্ডকী বহিয়া চলিয়াছে। গণ্ডকী পর্ব্বত-দুহিতা, তাহার জল যেমন নির্ম্মল, তেমনই বেগশীল। এই নদীর তীরে উন্মত্তের ন্যায় রাজা ছুটিয়াছেন, আর ডাকিতেছেন "দেবদত্ত" !—দেবদত্ত সেই হরিণের নাম।

মাঝে মাঝে অশন পুষ্পের শাখাগ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে, রাজা তাহা দেবদত্তের শৃঙ্গস্পর্শ ভাবিয়া বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন। বন্য হরিণ ছুটিয়া যাইতেছে, দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া রাজা "দেবদত্ত" বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতেছেন—এবং যখন বুঝিতে পারিতেছেন, এ দেবদত্ত নহে, তখন আছাড় খাইয়া তরুমূলে বসিয়া পড়িতেছেন। পুনরায় পত্রপাতে ও তরু-কম্পন-শব্দে আশান্বিত হইয়া দেবদত্তের পদশব্দ ভ্রমে অনুসরণ করিতেছেন।

রাজা বিহ্বল হইয়া কহিতেছেন, "দেবদত্ত, একবার আমায় দেখা দে, আমি তোর গ্রীবা-নিম্নভাগ কণ্ডূয়ন করি, একবার দেখা দে, তোর

ক্ষুরের শব্দ শুনিয়া আমি কর্ণ জুড়াই; আমার হস্তধৃত কোমল কিশলয় পুনরায় একবার আহার কর, আমি তোর মুখখানি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।”

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজা মণিহারা সর্পের ন্যায় দেবদত্তকে খুঁজিতেছেন। ঐ দেখ রাজসন্ন্যাসীর গাত্র বন-কণ্টকে ছিন্ন, তাহাতে রক্তবিন্দু ধূলিমাখা হইয়া রহিয়াছে। কঠিন প্রস্তরাঘাতে পদতল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চক্ষের শুষ্ক তারকা নৈরাশ্যে ক্ষিপ্ততা সূচনা করিতেছে। উদরের তল ক্ষুধায় কুঞ্চিত হইয়াছে, এবং শুষ্ক কণ্ঠে “দেবদত্ত” এই শব্দ বিকৃত হইয়া অর্দ্ধস্ফুট ভাবে উচ্চারিত হইতেছে। আর, একবার বন্য-বরাহ, একবার বন্য-মার্জ্জার, একবার কাষ্ঠ-বিড়ালীকে দূর হইতে দেখিয়া দেবদত্ত-ভ্রমে বন্ধুর বজ্র-পর্ব্বতের ক্রমোচ্চ পথে ছুটিয়া যাইতেছেন। অসাবধানতার সহিত যে প্রস্তরখণ্ড বা বন্যলতা ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন—তাহা করমুষ্টিতে উন্মূলিত হইয়া পড়াতে—রাজা উপত্যকার নিম্নে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। কণ্টক ও প্রস্তরখণ্ডে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, রাজার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। পুনরায় গণ্ডকীর তীর ধরিয়া কখনও উত্তরে, নৈঋর্তে বা ঈশাণ কোণে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্যের ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছেন। এই সেই মহাভাগ রাজর্ষি ভরত—যিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া ত্রিভুবনে কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার তপস্যার একাগ্রতা দর্শনে স্বয়ং পুলহ বিস্মিত হইয়াছিলেন, যাঁহার নামে এই মহাভূখণ্ড ভারতবর্ষ নামে পরিচিত।

অষ্টাহ উপবাস, অনিদ্রা ও এই উন্মত্ত শোকের বেগ সহ্য করিয়া বৃদ্ধ রাজা শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। নির্জ্জন বজ্র-পর্ব্বতের উপত্যকায় শিলা-

খণ্ডের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া রাজা উত্থান-শক্তি-বিরহিত হইয়া পড়িলেন। যে শির পৃথিবীর দুর্লভ মাণিক্যরাজিমণ্ডিত মুকুট ধারণ করিত, যাহা স্বর্ণ-খচিত রক্তাম্বরাবৃত মহিষী পঙ্কজনীর উৎসঙ্গে কোমল ব্যজন-সেবিত হইয়া নিদ্রালাভ করিত—যাহাতে একদা ব্রহ্ম-জ্ঞানের উজ্জ্বল-শিখা প্রখর-রশ্মিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যে শির একদা পুণ্য-চিন্তার নিকেতন, বিশ্বের প্রজা-মণ্ডলীর হিত সংকল্পে ব্যস্ত এবং উৎকৃষ্ট গন্ধনিষেবিত কুঞ্চিত কেশভারের ক্রীড়াস্থল ছিল, সেই শির ধূলিধূসর জটাবদ্ধ কেশদামের সহিত মুমূর্ষু কালে একটা কঠিন শিলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া রহিল। রাজা ক্ষীণকণ্ঠে, "দেবদত্ত" বলিয়া তখনও ডাকিতেছিলেন, সে স্বর আর কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইতে পারিল না—তাঁহার চক্ষুতারকা আসন্নমৃত্যুতে ঊর্দ্ধগ হইয়াও দেবদত্তকে খুঁজিতেছিল—নিশ্চেষ্ট দেহ দেবদত্তের পথ-মুখে উন্মুখ হইয়াছিল, সমস্ত মনের শক্তি একত্র করিয়া লক্ষ্য-বদ্ধ বাণের ন্যায় তিনি দেবদত্তের চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে রাজা দেখিতে পাইলেন—অদূরে দেবদত্ত দাঁড়াইয়া করুণনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, শতবার সে দাঁড়াইয়া যেমন ভাবে তাঁহাকে দেখিত, আজও সেইরূপ। শৃঙ্গ দুইটিতে বন্য-লতার ছিন্ন অংশ জড়িত রহিয়াছে। নিম্ন ওষ্ঠপুটের অন্তরালে ঈষৎ বিকশিত দন্তাগ্রে ভক্ষিত তৃণমূলের কিঞ্চিত লগ্ন রহিয়াছে, তাহার বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট চর্ম্মে সূর্য্যের শেষ রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে; নির্ম্মল চিত্র-পটের ন্যায় দেবদত্ত, তাঁহারই দেবদত্ত—দাঁড়াইয়া আছে। রাজা উচ্চৈঃস্বরে "দেবদত্ত" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন—এইবার কণ্ঠে নামটি উচ্চারিত হইল, সেই মুমূর্ষুর চক্ষু-তারা একবার নিমগ্ন হইয়া

দেবদত্তকে দেখিয়া লইল, বহুকষ্টে চক্ষুর প্রান্তে একবিন্দু অশ্রু উত্থিত হইল। সেই দণ্ডায়মান হরিণের রূপ দেখিতে দেখিতে রাজার প্রাণবায়ু বাহির হইল। যে দেবদত্তকে তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত হরিণ নহে, উহা তাঁহার মনের সৃষ্টি। মৃত্যুকালে মনের সৃষ্টি ঠিক প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় প্রকৃত বলিয়া মনে হয়।

৭

মৃগচিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া মহারাজ ভরত বজ্র-পর্ব্বতের কালঞ্জর নামক শৈলে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি জাতিস্মর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।

প্রথম জ্ঞানোন্মেষের কথা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্তিহেতু তাঁহার মহাভয় উপস্থিত হইল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ভগবানকে ভীষণ শাস্তিদাতারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

ধীরে ধীরে হৃদয় হইতে এই ভয়ের ভাব দূরীভূত হইল; তখন মৃগ-জীবনে তিনি কতকটা অভ্যস্ত হইলেন, কিন্তু গভীর বিষাদে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া রহিল।

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অবলম্বন করিয়া মৃগরূপী মহাত্মা গণ্ডকীর তীর-পথে ছুটিয়া চলিলেন। শুষ্কপত্র আহার করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করেন, কোন হিংস্র পশু হইতে আদৌ আত্মরক্ষার চেষ্টা নাই। কেবল যখন সেই শুদ্ধ, নির্ম্মল গণ্ডকী নদীর জল পান করেন, তখন তাঁহার দুই

চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এই নদীর জলে দাঁড়াইয়া এ জন্মে আর তাঁহার তর্পণপূর্ব্বক ভগবৎ আরাধনা করার অধিকার নাই।

কিছু দিন পরে তিনি পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে হরিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মৃগরূপী ভরত গণ্ডকীর তীরে স্বীয় পরিত্যক্ত কুটীর চিনিয়া লইলেন ও একদা যে কুশাসনে বসিয়া, যে জপের মালা ধারণ করিয়া তিনি ভগবৎ চিন্তা করিয়াছেন, তাহা সাশ্রুনেত্রে দেখিয়া কুটীরদ্বারের ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

যে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ তিনি একবার পাইয়াছিলেন—এজন্মে সে অধিকার আর তাঁহার নাই। তিনি কাঞ্চন ভুলিয়া কাঁচে মজিয়াছিলেন, তাই হরিণ সাজিয়াছেন। মানুষ হইয়া মানবের সার ধন ব্রহ্ম-জ্ঞান তিনি স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন—তাই সেই পরম অধিকার হইতে তিনি এবার বঞ্চিত।

মৃগরূপী ভরত পুলহ ঋষির কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঋষি-শিষ্যগণকে হোমানল জ্বালিতে দেখেন, তাঁহারা যখন প্রণব উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হন—তখন তিনি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সেই যোগিগণের রূপসুধা পান করিতে থাকেন। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হয়। পুলহ ঋষিকে তিনি দেখিতে সাহসী হন না, ইনি পরম অনুকম্পায় তাঁহাকে মোহ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন—রাজা ইঁহার স্বর্গতুল্য সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মায়ায় জড়িত হইয়াছিলেন।

মৃগ সেই পুলস্ত্য-আশ্রমের এক কোণে পড়িয়া থাকিত—সে কিছু খাইতে চাহিত না, ঋষি-শিষ্যগণ দয়া করিয়া তাহার সম্মুখে যাহা ফেলিয়া দিত, তাহাই কিঞ্চিন্মাত্র খাইয়া প্রাণধারণ করিত। সে বুঝিল যে, এই জীবন তাহার দণ্ডভোগের কাল; সুতরাং ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক

সর্ব্বপ্রকার সুখে বীতরাগ হইয়া সে দণ্ডের শেষ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কখনও গালব তাহাকে তৃণ দূর্ব্বা হাতে করিয়া খাওয়াইতেন, মৃগ ঋষিকুমারের পবিত্র হস্তস্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া তাহা খাইত, তখন তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে থাকিত।

একদা গালব নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছিলেন—

"সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়া।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥
যথা ফলানাং পক্কানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্॥
যথাগারং দৃঢ়স্থূলং জীর্ণং ভূত্বাঽবসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ॥
অত্যেতি রজনী যা তু সা ন প্রতিনিবর্ত্ততে।
যাত্যেব যমুনা পূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্॥
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ॥
আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তু হীয়তে যস্য স্থিতস্যাথ গতস্য চ॥
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাস্য কঞ্চন॥
এবং ভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ॥"

ভরদ্বাজ এই শ্লোক-পাঠ শুনিতেছিলেন; আর স্থির নেত্রে ভাব-

বিহ্বল শ্রোতার ন্যায় মৃগ সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল; সে চক্ষের পলকহারা হইয়া সেই শ্লোকাবৃত্তি শুনিতেছিল। গালব বলিলেন, "এই মৃগটা অতি আশ্চর্য্য, এ যেন আমাদের সব কথা বোঝে, এরূপ মনে হয়।" ভরদ্বাজ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "তুমি এই হরিণটার প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ যত্ন দেখাও, দেখো, যেন ভরত রাজার ন্যায় মৃগের মায়াপাশে না পড়।" গালব হাসিয়া বলিলেন, "আমিত আর ক্ষত্রিয় রাজা নই যে, প্রবৃত্তি লইয়া খেলা খেলিতে সাহসী হইব!"

মৃগরূপী ভরত এই কথা শুনিয়া দারুণ অনুতাপে দগ্ধ হইলেন।

শুধু পুলহ ঋষি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। মৃগ পুলহের কোমলস্নিগ্ধ আঁখির ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিত যে, পরম কারুণিক ঋষি তাঁহার জন্য হৃদয়ের দুঃখ বোধ করিতেছেন। সে দুঃখ দয়া-জনিত ও জ্বালাবিহীন, তাহা হৃদয়কে পবিত্র করে, কিন্তু মায়ার বশীভূত করে না। মৃগ কৃতজ্ঞতার আবেগে ঋষির পদাঙ্কে স্বীয় শৃঙ্গ ও ললাটদেশ স্থাপন করিয়া মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িত ও অশেষ শান্তি লাভ করিত। তাহার ভগবৎ-জ্ঞানের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সাধুসঙ্গের অধিকার হইতে ভগবান এখনও তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই, ইহাই তাহার সান্ত্বনা।

যেখানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইত, সেইখানে মৃগ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, যেখানে আরতিকালে ঋষিগণ মন্ত্রপাঠ করিতেন, সেইখানেই নিশ্চল চিত্রপটের ন্যায় মৃগ শ্রোতা। ক্রমে সে আর তৃণাদি মুখে গ্রহণ করে না। তাহার দেহ কৃশ হইয়া গেল, ঋষিকুমারগণ মুখের নিকট তৃণ ধরিলে মৃগের দুই চক্ষে ধারা প্রবাহিত হয়; সে একরূপ আহার ত্যাগ করিল। ভগবানকে ডাকিবার জন্য তাহার আত্মা

ব্যাকুল হইল; কিন্তু পশুদেহের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ভগবৎ সাধনা করিতে সে অসমর্থ। একদিন মৃগরূপী মহাত্মা উপবাসশীর্ণ দেহে গণ্ডকীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে সহসা তিনি হৃদয়ে ব্যথার সঙ্গে নবজন্মের আবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন; পশ্চাৎ হইতে এমন সময় কে কোমলস্নিগ্ধ করে তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিল! মৃগ সেই স্পর্শসুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সে স্পর্শ পুলহ ঋষির। আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ কালে ঋষির করাঙ্গুলী উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, কৃতজ্ঞ মৃগ ঋষির মুখপানে সাশ্রুনেত্র বদ্ধ করিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল—এবং সেই সুখ-প্রদোষকালে গণ্ডকীর তীরে দেহ রক্ষা করিল।

৮

দীর্ঘ—সুদীর্ঘ কালের পর আবার মনুষ্যজন্ম। মনুষ্যজন্ম কি?—উহা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর পক্ষে মুক্তির আস্বাদন, ক্ষুদ্র সরিৎ অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্রে পতন। দৈহিক সুখের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক আনন্দে পৌঁছিবার শক্তিলাভ। উহা প্রণব উচ্চারণের অধিকার-প্রাপ্তির শুভ কাল। অনন্ত বিমানের ন্যায়, সীমাহীন সমুদ্রের ন্যায় ব্রহ্মানন্দের অপ্রমেয় ক্ষেত্র মানুষের সম্মুখে পড়িয়া আছে। যে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়া রহিল—সে তাহার জন্মের গৌরব বুঝিল না, রাজাধিরাজের উত্তরাধিকারী সামান্য কুটিরবাসী হইয়া রহিল—সে তাহার দাবী দাওয়া ছাড়িয়া দিল।

এই মুক্তির অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়া মহারাজ ভরত—

ইক্ষুমতীর তীরে শিবালয় নামক গ্রামে আঙ্গিরস গোত্রজাত ইন্দ্রচূড় নামক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এবার সাধুসঙ্গের ফল ফলিয়াছে, দীর্ঘ মৃগজন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া রাজর্ষির ব্রহ্মজ্ঞান এবার সিদ্ধ হইয়াছে। গাভী কিম্বা ছাগ—যদি সহসা সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবার উপযোগী দৃষ্টিশক্তি লাভ করিত, তখন প্রস্ফুট কুসুমটি ভোজন করিবার লোভ আর তাঁহার হইত না; তখন উহা তাঁহার চক্ষুর আনন্দসাধক হইয়া থাকিত। মহারাজ ভরত এ জন্মে সেইরূপ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিলেন, সেই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাসনা তাঁহার একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল! এই জগতের যথার্থ রূপ এবার তাঁহার চক্ষে ধরা পড়িল। কিন্তু একবার সেই দুর্লভ জ্ঞান পাইয়া তিনি হারাইয়াছিলেন; এ জন্মে যদি তাহা যায়—ভগবানের মায়া এড়াইবার সাধ্য কোন্ পুরুষের আছে? তাঁহার কৃপাই শুধু মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অবলম্বন। সুতরাং রাজা ভরত এবার কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া আর আপনাকে বিপদের সম্মুখীন করিবেন না, ইহাই স্থির করিলেন।

ইন্দ্রচূড়ের দুইটি স্ত্রী। প্রথমার গর্ভে আটটি পুত্র এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি ভরত দ্বিতীয়ার গর্ভজাত এই দুই সন্তানের অন্যতর। এজন্মেও তিনি বিধাতার বিধানে ভরত নাম প্রাপ্ত হইলেন।

ইন্দ্রচূড় অতি নিষ্ঠাবান্ এবং শুদ্ধচরিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরম ভাগবত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়া সমাজে সম্মানিত। তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা কমলা দেবীও রমণীকুল-রত্ন-স্বরূপা। ইন্দ্রচূড় যত্নপূর্ব্বক

স্বীয় সন্তানদিগকে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ আটটি পুত্রই শাস্ত্রানুশীলনে রত এবং পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ভরত সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। শিশুকালে তাঁহার মূর্ত্তি সকলের আনন্দদায়ক ছিল। যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ভগবৎজ্ঞান বিরাজমান, তাঁহাকে দেখিয়া যে সকল লোক মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ তাঁহার রূপের স্নিগ্ধ আকর্ষণ দর্শকমাত্রই হৃদয়ে অনুভব করিতেন। আত্মীয়গণ সর্ব্বদা বলিতেন, ব্রাহ্মণ, তোমার এই ক্ষুদ্র শিশুটি পরম ভাগবত হইবে।

কিন্তু শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইন্দ্রচূড়ের সমস্ত আশা তিরোহিত হইল। সপ্তম-বর্ষ-বয়স্ক পুত্র কথা বলিতে পারে না, ডাকিলে স্নিগ্ধ চক্ষুর্দ্বয় প্রসারিত করিয়া উদাসীনের ন্যায় চাহিয়া থাকে। সঙ্গীদের সঙ্গেও খেলা করে না, কোন বিষয়ে আমোদ বা উৎসাহ নাই। যেখানে যে লইয়া যায়, স্থাণুর ন্যায় সেই খানেই বসিয়া থাকে। ইন্দ্রচূড় তাঁহার এই প্রাণপ্রতিম পুত্রটির শিক্ষার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। এমন সুন্দর, উজ্জ্বল ললাট, দীপ্ত নেত্র-বিশিষ্ট সুগঠিত দেহ বালকটি হাবা হইল, এই কষ্ট পিতামাতার অসহনীয় হইয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় তাহাকে উপনয়ন প্রদান করিয়া সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বহু চেষ্টা পাইলেন, বালক কিছুতেই কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিল না। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কত আদরে তিনি তাহাকে মন্ত্র উচ্চারণের জন্য চেষ্টা করাইলেন, সে আদর ব্যর্থ হইল। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া একদা তাহাকে প্রহার করিলেন, বালক শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে কখনও কেহ হাসি দেখে নাই, চক্ষে কেহ কখনও অশ্রু দেখে নাই। নির্ব্বিকার জড়বৎ সমস্ত স্নেহবন্ধনের

অতীত এই শিশুটির মধ্যে জড়তাসত্ত্বেও কি একটা আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ছিল, তাহাতে তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারা যাইত না। ইন্দ্রচূড় তাহার গায়ে হাত তুলিয়া অনুতাপ বোধ করিতে লাগিলেন, পিতৃনেত্র হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু পতিত হইল; হাবা ছেলে সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিলেন, এবং শুধু চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা পিতার হৃদয়ে পরম শান্তির ভাব আনয়ন করিলেন।

মধ্যম পুত্র শ্রীকণ্ঠ প্রায়ই বলিতেন, "এই হাবা ছেলেটাকে লইয়া বাবা রাত্রি দিন ব্যস্ত করেন, ভগবান্ ইহাকে বাক্‌শক্তি দেন নাই, এটা একটা মূক পশুর মত, তথাপি পিতা ইহাকে কথা বলিতে শিখাইবেন, তিনি ভগবানের বিধির উপরও একটা বিধান করিতে চাহেন।" জ্যেষ্ঠ পুত্র মুক্তিকাম বলিলেন, "আমি বলিতে পারি না, কেন এই হাবা ছেলেটার জন্য আমার প্রাণেও বড় স্নেহ হয়। দিন রাত্রি ঐ হাবা ছেলেকে সঙ্গে করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। ভগবান এমন সুরূপ ছেলেকে হাবা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহার বিধান বোঝা কঠিন।"

শ্রীকণ্ঠ—"তোমরা কেবল চেহারা দেখিয়া ভুলিয়া যাও; উহার চরিত্র অতি কুৎসিত, পিতামাতার আদরে ছেলেটা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অশুচি স্থানের জ্ঞান নাই, যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে, ধূলির মধ্যেই ত অষ্টপ্রহর কাটায়, এত বড় ছেলে অঙ্গ-মলা মার্জ্জনা করে না, আমার মনে হয় এ সমস্তই ইচ্ছাকৃত। উহাকে আদর না করিয়া নিত্য বেত্রাঘাত করিলে ছেলেটার বুদ্ধি জন্মিতে পারে।"

মুক্তিকাম বলিলেন—"ও কথা ব'ল না, এমন নিরপরাধ শিশুকেও ব্যথা দিতে হয়!"

৯

ইন্দ্রচূড় কিছুতেই উহাকে শিক্ষা দেওয়ার আশা ত্যাগ করিলেন না। তিনি ক্রমাগত তদ্বিষয়ে চেষ্টিত রহিলেন। বাক্‌হীনের বাক্যস্ফূর্ত্তির জন্য দিবারাত্রি চেষ্টা চলিতে লাগিল, এই চেষ্টার মধ্যে একদিন ইন্দ্রচূড়ের উপর জীবের অপরিহার্য্য শেষ আহ্বান আসিল, তিনি দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন, কনিষ্ঠ জায়া কমলা সপত্নীর হস্তে স্বীয় পুত্র ও কন্যাকে অর্পণ করিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিলেন।

যখন কমলাদেবী চিতানলে দগ্ধ হইবেন, তখন তাঁহার কন্যা অরুন্ধতী সপত্নী লক্ষ্মীদেবী এবং আটপুত্র, বিলাপ-শব্দে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছিলেন। ভরতকে সেখানে আনা হইয়াছিল, এই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে দশম বর্ষীয় বালক ভরত নির্বিকার!—তাঁহার মূর্ত্তি একটু গম্ভীরতর হইয়াছিল এই মাত্র। সমুদ্রে পতিত মনুষ্য ও সমুদ্র-তীরে উপবিষ্ট নিশ্চিন্ত ব্যক্তির যে প্রভেদ, তাঁহার সঙ্গে অপরের সেই প্রভেদ দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও অনিত্য বস্তুর ধ্বংসের জ্ঞান হেতু বিকার-রহিতত্ব, এই দুইটি ভাব সুস্পষ্ট জাগ্রত ছিল, তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই ভাব বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা বৃথা প্রাজ্ঞমানী ছিলেন। শ্রীকণ্ঠ এই বিলাপের মধ্যেও ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "এ হাবা ছেলেটার ভাব দেখিলে কষ্ট হয়। পশুকে ভগবান্ যে জ্ঞান দিয়াছেন, ইহাকে কি তাহাও দেন নাই?"—এই সময় চিতায় উঠিবার পূর্ব্বে সিন্দুরের কৌটাহস্তে কমলাদেবী ভরতের কর ধরিয়া লক্ষ্মীদেবীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "দিদি, এই বালককে দেখো, তোমরা জান না, তোমাদিগকে বলি নাই, এই বালককে দেখিয়া আমি এই জীবনের সকল কষ্ট

ভুলিতাম, আমার সাংসারিক সমস্ত দুশ্চিন্তা, শোক ও দুঃখের মধ্যে যখন এই বালক আমার অঞ্চল স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইত, তখন আমার সুখ-দুঃখের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিত, একটা আনন্দের ভাব মনে উপস্থিত হইত, তাহা পুত্রস্নেহজাত নহে। ইহাকে আমি কখনই পুত্র বলিয়া জানি নাই। আমার এখনও ইহার নির্ব্বিকারমূর্ত্তি দেখিয়া দৈহিক সুখ দুঃখ অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার চিতার নিকট ইহাকে ধরিয়া রাখিও। যে পর্য্যন্ত চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহাকে এইখানে রাখিও। আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহাকে দেখিয়া লইব। আর, দিদি, এ মাতৃহীন হাবা ছেলেকে তুমি ক্ষুধার সময় খাইতে দিও। ক্ষুধা হইলে হাবা খাইতে চাহে না; দিদি, তুমি উহার উদরতলের কুঞ্চন দেখিয়া খাইতে দিও। আমি অরুন্ধতীর জন্য ভাবি না। আমার আর আট পুত্রও বড় হইয়াছে, দিদি সকলে মিলিয়া আমার হাবা ভরতকে রক্ষা করিও।" এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবী সাশ্রুনেত্রে ভরতকে বাহুদ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন এবং কিছু না বলিয়া তাহার শিরে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জনক-জননী এক চিতায় দগ্ধ হইয়া গেলেন। হাহাকার করিয়া পুত্র, কন্যা ও মাতা লক্ষ্মীদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটিতে প্রত্যাগত হইলেন।

১০

পিতার ন্যায় মুক্তিকাম হাবা ভরতকে চক্ষে চক্ষে রাখেন, মাতা লক্ষ্মীও হাবাকে আগে খাওয়াইয়া তৎপর অপর সন্তানদিগকে আহার্য্য প্রদান করেন। হাবা ছেলে সেই গৃহে সকলের চক্ষুর তারার ন্যায় হইল। মৃত পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের জন্য যে নিরুদ্ধ স্নেহ তাহা সমস্ত ভরতের উপর আরোপপূর্ব্বক সেই গৃহে সকলে তাহাকে প্রাণপ্রতিম বলিয়া জ্ঞান করিল। কিন্তু সেই স্নেহের বন্ধনে তিনি ধরা দিলেন না। পাষাণের উপর জলবিন্দু পতনের ন্যায় তাঁহার প্রতি প্রদত্ত এই প্রীতি হৃদয়ে কোন স্থায়ীভাব অঙ্কিত করিল না।

মধ্যে মধ্যে শ্রীকণ্ঠ ভরতকে ভৎর্সনা করেন, তখন আর সকল ভ্রাতা তাঁহাকে দমন করেন এবং মাতা লক্ষ্মীদেবী সেদিন শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে রাগে কথা বলেন না। এই ভাবে এক বৎসর অতীত হইলে লক্ষ্মীদেবী দেহ-ত্যাগ করিলেন। অরুন্ধতীর পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল, এবার তিনি স্বামীর গৃহে চলিয়া গেলেন।

আট ভ্রাতা পৃথক হইয়া যজন-যাজন কার্য্য-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই ব্যবস্থা হইল যে হাবা এক এক দিন এক এক জনের বাড়িতে খাইবেন।

ভরতের প্রতি এখন আর সে মনোযোগ নাই। তিনি রাস্তায় যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকেন, রৌদ্র বৃষ্টি তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ নাই। রাস্তায় তাঁহাকে যে ডাকে, তিনি তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যান। বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ এবং যোগসাধনের ফলে তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ হইয়াছে, তিনি হস্তিশাবকের

ন্যায় ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন দিন একটা মোটবহনে নিযুক্ত করে, তিনি নীরবে বিনা আপত্তিতে তাহা মাথায় করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেন—সেই ব্যক্তি পুরস্কারস্বরূপ কিছু খাইতে দিলে তিনি সেইখানে তাহা আহার করেন। কিছু না দিয়া স্বীয় কার্য্য উদ্ধারপূর্ব্বক দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেও ক্ষুণ্ণ না হইয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করেন—যে তাঁহাকে যাহা বলে তাহাই ভরত ভগবানের আদেশ মনে করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লন। কারণ জগতে তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি করেন না। কোন দিন কোন নৌকার মাঝি লোক না পাইয়া তাঁহাকে লইয়া যায়,—তিনি তাহার নিয়োগে সারাদিন বৈঠা চালাইয়া, লগি ঠেলিয়া নৌকা বাহিয়া দেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে মাঝি বিদায় করিয়া দেয়, ক্ষুৎ-পিপাসা-জ্ঞান-বিরহিত ভ্রাতাকে মুক্তিকাম খুঁজিতে খুঁজিতে নদীতীরে পাইয়া গৃহে ফিরাইয়া আনেন, তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না, সেদিন কিছুই খাওয়া হয় নাই, অথচ মুখমণ্ডল সদানন্দ-ময়। কে তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা শতবার প্রশ্ন করিলেও ভরতের মুখে কোন উত্তর নাই। মুক্তিকাম ও অপরাপর ভ্রাতারা তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখানুভব করেন, কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন! যজন-যাজন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বাহিরে থাকিতে হয়, কে এরূপ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিবে?

ক্রমেই ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার প্রতি একটু উদাসীন হইয়া পড়িলেন। কতকাল গৃহস্থের পক্ষে এ ভাবে জড়বৎ ব্যক্তিকে পালন করিবার সুবিধা হয়! ভরত এখন গৃহে না আসিলেও আর কেহ ব্যস্ত হন না। ভরতকে ধরিয়া কেহ তাহার গৃহের দাওয়ার জন্য মৃত্তিকা কাটাইতেছে, তিনি

কাহারও কাষ্ঠ কাটিতেছেন, সারাদিন এই ভাবে পরিশ্রম করার পর কেহ কিছু দিলে তিনি খাইলেন, না দিলে উপবাসী পড়িয়া রহিলেন। কোন দিন বৃক্ষমূলে, কোন দিন ভ্রাতৃগৃহে, কোন দিন বা কোন ব্যক্তির নিয়োগানুসারে গৃহ পাহারায় তিনি রজনী কাটাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির কথা ভরত ভগবদ্বাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতেন। এই অসামান্য শ্রম, মনুষ্যের পরিচর্য্যাবৃত্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার চিত্তে উজ্জ্বল হইয়াছিল, সুতরাং তিনি হৃষ্টচিত্তে এ সমস্ত কাজ করিতেন।

১১

একদা শ্রীকণ্ঠ বলিলেন, "হাবাটা পৃথিবীশুদ্ধ লোকের জন্য খাটিয়া মরে, আমাদের ক্ষেত্রের কাজ উহাকে দিয়া করাইলে হয়",—সমস্ত ভ্রাতাই এই কথার অনুমোদন করিলেন; তখন তাঁহাদের নিয়োগানুসারে ভরত ক্ষেত্রের আইল বাঁধিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ভরত আইল বাঁধিতে বাঁধিতে দেখিলেন, কতকগুলি পিপীলিকা ক্ষেত্রের জলে আবদ্ধ হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য অপরদিকে যাইবার পথ পাইতেছে না—তখন তিনি আইলের বাঁধ খুলিয়া দিলেন। নিজের বাঁধা অংশের সঙ্গে ভ্রাতাদের বাঁধা অংশও মুক্ত করিয়া দিলেন; আবদ্ধ জল নিষ্ক্রান্ত হওয়াতে ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া গেল—এই অবস্থায় শ্রীকণ্ঠ আসিয়া দেখিলেন, হাবা সর্ব্বনাশ করিয়াছে; তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন। হাবা গ্রাহ্য না করিয়া সেই প্রহার সহ্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীকণ্ঠের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইল,

তিনি নিকটবর্ত্তী একটি ভূপতিত কঞ্চি হাতে লইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত প্রহার করিতে লাগিলেন। ভরতের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তধারা পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় মুক্তিকাম আসিয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীকণ্ঠের হস্ত হইতে কঞ্চি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একটা বিষম দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেলে বহুলোক তথায় উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিবারিত করিলেন। তখন অধোবদনে মুক্তিকাম সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; কমলাদেবী এক হস্তে সিন্দুরের কৌটা অপর হস্তে এই বালকের করধারণপূর্ব্বক তাঁহার মাতা লক্ষ্মীদেবীকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই দৃশ্য মনে পড়িল, তাঁহার মাতা লক্ষ্মীদেবী যে তখন উহাকে বাহুতে জড়াইয়া মস্তকোপরি অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দৃশ্য মনে পড়িল। পিতা যে ইহাকে চক্ষের তারার ন্যায়, কণ্ঠের হারের ন্যায় প্রিয়তম জ্ঞানে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন—সে কথা মনে পড়িল। তখন সাশ্রুনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে। দেহ কর্দ্দমাক্ত, একটা ইষ্টকাঘাতে পদতল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহা হইতে শোণিতের স্রোত বহিতেছে। তথাপি সদানন্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ সমস্ত গ্রাহ্য না করিয়া বসিয়া বসিয়া যেন প্রহারের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার চক্ষে তখনও একটা আনন্দের ভাব জাগিয়া আছে। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—স্ত্রীলোকের ন্যায় আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া জড়ভরতের গলা জড়াইয়া ধরিলেন, ও তাহাকে আর কাহারও হস্তে দিবেন না, নিজ বাড়ীতে রাখিবেন—বারংবার এই শপথ গ্রহণপূর্ব্বক আদরে উঠাইয়া বাড়ীতে আনিলেন এবং অতি স্নেহের সহিত স্বহস্তে ক্ষতস্থানে ঔষধ বাটিয়া দিলেন। কিন্তু ভরত প্রীতি

ও বিদ্বেষে তুল্য উদাসীন ভাব দেখাইয়া ভ্রাতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মুক্তিকামের গৃহিণী অনসূয়া সঙ্কীর্ণ-চেতা রমণী ছিলেন; তাঁহার তিন বর্ষবয়স্ক একটি পুত্র ছিল, এই পুত্রটিকে ভরত অনেক সময় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন, এই ভরসায় তিনি ভরতের আগমনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন না। মুক্তিকাম প্রত্যূষে উঠিয়া স্বীয় কার্য্যে গমন করিতেন, দ্বিপ্রহারান্তে গৃহে আসিয়া স্নানাহ্নিক ও ভোজন ব্যাপার সমাধা করিয়া পুনরায় বহির্গত হইতেন এবং রাত্রিতে গৃহে ফিরিতেন, সুতরাং প্রায় সমস্ত দিন তাঁহাকে বাড়ী হইতে দূরে থাকিতে হইত। তিনি স্ত্রীকে আদেশ করিয়া যাইতেন যেন ভরতের আহারাদির যথাসময়ে ব্যবস্থা হয়—সে নিজে খাইতে চায় না, তাহাকে ডাকিয়া খুঁজিয়া খাওয়াইতে হইবে। গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "ভরত ত খাইয়াছে, সে ত ভাল আছে?" যদি কোন খাওয়ার ভাল দ্রব্য পাইতেন, তবে গৃহিণীর হাতে দিয়া বলিতেন, "আগে ভরতকে দিবে, তৎপর সিতিকণ্ঠকে দিবে"—সিতিকণ্ঠ তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র।

স্বামী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে অনসূয়া ভরতকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাবা, সিতিকে কাঁধে করিয়া খেলা দে।" হাবা সিতিকে কাঁধে করিয়া লইয়া হাঁটিতে লাগিলেন, কিছুকাল পর্য্যটন করিতে করিতে একটি দেবালয় দর্শনে ভরতের ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হইল—তখন সমস্ত দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল, সিতিকণ্ঠ তাঁহার কাঁধ হইতে একটা নর্দ্দমার নীচে পড়িয়া আঘাত পাইল। সে সংবাদ পাইয়া অনসূয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ছেলেকে সান্ত্বনা ও শুশ্রূষাদি করিয়া

উঠাইয়া লইলেন ; তিনি ভরতকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু ভয়ে একথা স্বামীকে বলিলেন না। কারণ স্বামীর স্পষ্ট আদেশ ছিল, "হাবাকে কোন কার্য্যের ভার দিও না, উহাকে দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় যত্নে পালন করিও।"

কিন্তু সেই দিন হইতে অনসূয়া বুঝিলেন, ইঁহার হস্তে ছেলেরক্ষার ভার সমর্পণ করা নিরাপদ নহে। তখন জড়ভরতকে তাঁহার একান্ত একটা গলগ্রহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তদবধি তাঁহার আহার সম্বন্ধে তিনি একান্ত উদাসীন হইলেন, সামান্য শাকান্ন বেলা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতেন। কোন দিন তাহাও পরিমাণে অতি অল্প হইত, কিন্তু জড়ভরত পূর্ব্ববৎ সদানন্দময়। আদরেও তিনি যেরূপ ছিলেন, অনাদরেও ঠিক তাহাই রহিলেন। সামান্য নদীতে বর্ষা গ্রীষ্ম ঋতুভেদে অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—কিন্তু মহাম্বুধি কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল ঋতুতেই সমান।

মুক্তিকামের গৃহে একটা কাঁটাল গাছ ছিল, সেই পল্লীতে সে কাঁটালের তুল্য উৎকৃষ্ট কাঁটাল কোন গাছে ফলিত না। এবার সেই গাছের নিম্নডালে প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়া একটা খুব বড় কাঁটাল ফলিয়াছিল। অনসূয়া তাহা সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। আর তিন চার দিনের মধ্যে তাহা পাকিবে। একদা ভরত সেই বৃক্ষের অনতিদূরে কুটীরের দাওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিলেন, গৃহে একখানি খট্টার মধ্যে সিতিকণ্ঠ ঘুমাইতেছে। অনসূয়া একটা বিশেষ কার্য্যের তাড়ায় নিকটবর্ত্তী এক ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে গিয়াছেন, এমন সময় দুইটি শৃগাল উপস্থিত হইয়া একটি দন্তাগ্রে কাঁটালটির বোঁটা কাটিয়া ফেলিল, এবং তৎপর উভয়ে দন্ত দ্বারা ছিন্নবৃন্ত ধারণপূর্ব্বক টানাটানি করিয়া

কাঁটালটিকে বনের দিকে লইয়া গেল। বলা বাহুল্য, শৃগালদ্বয়ের আগমনাবধি সকল ব্যাপারই ভরত দর্শন করিতেছিলেন। তিনি সামান্য একটু চেষ্টা করিলে কিংবা শুধু উঠিয়া দাঁড়াইলেই শৃগালদ্বয় ভয়ে পলাইয়া যাইত। কিন্তু জীবের খাদ্যের ব্যাঘাত তিনি করিবেন না—সুতরাং তিনি কিছুই করেন নাই। এদিকে 'কাঁটাল শৃগালে লইয়া গেল' —এই ধ্বনিতে অনসূয়া তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিলেন, এবং এতদিনের আশা এইভাবে নষ্ট হইল দেখিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া রুদ্র মূর্ত্তিতে আগমনপূর্ব্বক ভরতের গণ্ডে দারুণ চপেটাঘাত করিলেন। ভরত তাহাতে কোন বিরক্তি বা দুঃখের ভাব প্রকাশ করিলেন না।

অনসূয়া বুঝিলেন, কাঁটাল যে ভাবে গিয়াছে—নিদ্রিত শিশুটিও সেইভাবে যাইতে পারিত, জড়ভরতের দ্বারা কোন কার্য্যই হইবার নহে। এখন হইতে কথায় কথায় জড়ভরতের গণ্ডে চপেটাঘাত পড়িতে লাগিল এবং তাঁহার খাদ্যাদির ব্যবস্থা নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইতে চলিল।

পাছে, লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, পূর্ব্ববৎ পতন ঘটে, এই আশঙ্কায় ভরত মূক ও বধিরের মত ছিলেন, নিজ আত্মা ভগবানের পাদমূলে বিকাইয়া তিনি পরম স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া—জড়বৎ লোকনিগ্রহের পাত্র হইয়া রহিলেন।

১২

একদা মুক্তিকাম কার্য্যোপলক্ষে তিন চার দিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন; তাঁহার ক্ষেত্রের ধান্যগুলি প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে, এ অবস্থায় সেগুলি রাত্রে আসিয়া কেহ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় অনসূয়া হাবাকে বলিলেন, "ক্ষেত্রের পার্শ্বে যে মঞ্চ আছে, তাহাতে যদি রাত্রি বঞ্চন করিতে পার, তবে চোর আসিবে না—তুমি ত কত রাত্রি গাছতলায় কাটাইয়া দাও, নিজেদের কাজ কি একটুও করিবে না?" বধূঠাকুরাণী ভাবিলেন, 'কিছু করুক আর না করুক, তাহার আদেশানুসারে হাবা নিশ্চয়ই মঞ্চোপরি বসিয়া থাকিবে, তাহাকে দেখিলে চোর আসিতে সাহসী হইবে না।' হাবা হৃষ্টচিত্তে সেই মঞ্চোপরি বসিয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য, লোকালয় হইতে দূরে নিভৃত স্থানে রাত্রি-যাপনই তাঁহার ভগবৎ আরাধনার বেশী উপযোগী ছিল।

সে রাত্রি অমাবস্যার রাত্রি—ভরত স্থির হইয়া ক্ষেত্রপার্শ্বস্থিত মঞ্চের উপর বসিয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। ক্ষেত্র হইতে অদূরে প্রবাহিত খরস্রোতা 'রক্তাম্বরা' নদীর বাতাঘাত-চূর্ণ-তরঙ্গ-শব্দ কর্ণে আসিতেছে। আকাশের নক্ষত্রগুলি রক্ত-চক্ষুর ন্যায় দীপ্যমান, সম্মুখস্থ রতনপুর-পল্লী যেন অবগুণ্ঠনবতী হইয়া নীলাম্বরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ভরত মৌনভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করিয়া ধ্যানপর হইয়া আছেন।

এমন সময় দস্যুপতি রুদ্রসহায়ের চরগণ কোলাহল করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দস্যুপতি পুত্রলাভ কামনায় একটি নরবলি মানসিক করিয়াছিলেন। একটি দুর্ভাগ্যকে এতদর্থে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগক্রমে পলাইয়া যায়; রুদ্রসহায়ের চরগণ

সেই লোকটিকে খুঁজিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে অনেক মশাল প্রজ্বলিত ছিল, সেই আলোকে তৎস্থানের অন্ধকার দূর হইয়াছিল এবং অমানিশা সূর্য্যালোকিত দিবসের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহারা সেই ক্ষেত্রের নিকট যাইবার সময় দেখিতে পাইল, মঞ্চোপরি একটি লোক বসিয়া আছে, তাহার কটিবিলম্বিত পরিধেয় অতি মলিন, মাথার চুল জটায় পরিণত হইয়াছে, দেহ ধূলি-ধূসর। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে ?" জড়ভরত কোন উত্তর করিলেন না; একজন বলিল, "তুই আমাদের সঙ্গে চল।" অমনই জড়ভরত ঈশ্বরাদেশ মনে করিয়া সেই দলের সঙ্গে চলিলেন। যে ব্যক্তি তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল, সে চুপে চুপে সহচরগণকে বলিল, "ইহার দেহখানি বেশ পুষ্ট। সুগঠিত দেহ এবং বর্ণ খুব উজ্জ্বল, ধূলি-মলিন হইয়াছে। যে পলাইয়া গিয়াছে এ ব্যক্তি তাহার স্থান পূরণ করিতে পারিবে।" সহচরগণ সকলেই তাহার কথার অনুমোদন করিল। জড়ভরতকে তাহারা ধরিয়া লইয়া চলিল।

বনমধ্যে পূজা হইতেছিল। একটি জীর্ণ মন্দিরের ইষ্টক ধসিয়া গিয়াছিল। তদুপরি অশ্বত্থবৃক্ষ উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে মন্দিরচূড়ার স্খলিত আস্তরের মধ্যে সেই বৃক্ষের মূল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেই মূলে যেন মন্দিরটি নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছে। অদূরে একটি পুরাতন পুষ্করিণী, তাহা শৈবালপূর্ণ; তাহার এক কোণ হইতে একটি নরকঙ্কালের অংশ দেখা যাইতেছে, মন্দিরের পার্শ্বে একটা ভগ্ন অতি পুরাতন প্রাচীর।

এই প্রাচীরের পার্শ্বে দস্যুপতি রুদ্রসহায় বসিয়াছিল, পুরোহিত তাহার কপালে রক্তচন্দনের সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক পরাইয়া দিয়াছিল। তাহার পরিধানে রক্তপট্টাম্বর, এবং গলদেশে লম্বিত দীর্ঘ জবামালা—

চতুর্দ্দিকে দস্যুগণ শঙ্খ, ঘণ্টা ও নানাপ্রকার বাদ্য বাজাইতেছিল। ধূপাচ্ছন্ন হইয়া মন্দিরের মধ্যে পুরোহিত-করধৃত পঞ্চপ্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল—তাহাতে বিনাশ-শক্তিরূপিণী কালীমূর্ত্তির বরাভয়প্রদ হস্তখানি বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইতেছিল। বিনাশ করিয়াও তিনি রক্ষা করেন, করসঙ্কেতে স্পষ্টরূপে এই আশ্বাস যেন সূচিত হইতেছিল। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে এক একবার মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"বলি পাওয়া যায় নাই ?" রুদ্রসহায় উত্তর করিল—"এখনও তাহারা ফিরিল না, বড় আশ্চর্য্য! আমি শিউনারায়ণকে বলিয়া দিয়াছি, যদি একান্ত পক্ষে তাহাকে না পাওয়া যায়, তবে যেন কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে চুরি করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসে। সুতরাং তাহারা একজনকে না আনিয়া ছাড়িবে না; আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া মন্ত্রপাঠ করুন।"

এমন সময় জড়ভরতকে লইয়া অনুচরবর্গ উপস্থিত হইল। দস্যুগণ দূর হইতে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ কি" ? শিউনারায়ণ বলিল, "সংবাদ ভাল, কিন্তু সেটাকে পাওয়া যায় নাই।"

তখন জয়ঢাকের বাদ্য আরও উচ্চে উঠিল। মন্দিরা, ঘণ্টা ও শঙ্খ একত্র বাজিয়া উঠিল এবং আসবপানে উন্মত্ত দস্যুগণ জবাফুলের মালা পরিয়া নৃত্য করিতে করিতে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল—পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হস্তে লইয়া দেবীকে আরতি করিতে লাগিলেন।—তাঁহার মুখোচ্চারিত মন্ত্র বজ্র-গম্ভীররবে নিনাদিত হইতে লাগিল।

দস্যুরা জড়ভরতকে স্নান করাইয়া আনিল। জড়ভরত নিজের অবস্থা বুঝিলেন। তিনি নিবিষ্টভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া নিশ্চেষ্ট দেহে একান্ত ধৈর্য্য সহকারে শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র বিকৃতভাব উপলব্ধ হইল না।

বিধিমতে স্নানান্তে তাঁহাকে দস্যুরা রজ্জুদ্বারা বন্ধন-পূর্ব্বক চণ্ডিকাগৃহে লইয়া গেল। অবশেষে ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, নবীনপত্রের অঙ্কুর ও ফল উপহার দিয়া পুরোহিত তাঁহাকে কালীর নিকট নিবেদন করিলেন।

আবার অট্টরোলে জয়ঢাক, শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল। দস্যুগণের ধেই ধেই নৃত্যে ও পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে সেই মন্দির অতি ভয়াবহ ভাব পরিগ্রহ করিল।

গন্ধমাল্য ও অলঙ্কারভূষিত দেহ ক্ষৌমবাসপরিহিত ভরত যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আনীত হইলেন। তাঁহার কপালে দস্যুরা তিলক পরাইয়া দিয়াছিল। এই অপূর্ব্ববেশে ভরত সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার-স্বরূপ শোভা পাইলেন। যিনি জীবনে কাহাকে বিদ্বেষ করেন নাই, শত অত্যাচারেও যিনি কখনও অভিযোগ করেন নাই, যিনি সামান্য পিপীলিকাকে রক্ষা করিবার জন্য ভ্রাতৃ-হস্তে ভয়ানক প্রহার সহ্য করিয়াছিলেন—যাহারা তাঁহাকে কালীর নিকট বলি দিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদের আহ্বানও যিনি ভগবানের আহ্বানের ন্যায় গণ্য করিয়াছেন, —যিনি জীবনে কাহাকেও ব্যথা দেন নাই, উৎকট পরিচার্য্যাবৃত্তি দ্বারা নির্ব্বিচারে সকলের সেবা করিয়াছেন—সেই ভগবদ্‌ভক্তির অবতার স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানী, পরম সৌম্যমূর্ত্তি ভরতের হস্তপদ বন্ধন করিয়া দস্যুরা যূপকাষ্ঠে গ্রীবা বদ্ধ করিবে, এমন সময়ে অমানিশা ভেদ করিয়া করাল কালীর লেলিহান জিহ্বার ন্যায় একটি বজ্র তথায় পতিত হইল এবং সেই মুহূর্ত্তে রুদ্রসহায়কে তৎস্থানে নিহত করিল।

ধরিত্রী ধার্ম্মিক মহাত্মার এই অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ জ্বালা বোধ করিতে লাগিলেন। এবং তখনই ভূমিকম্পে সেই জীর্ণ মন্দির ভূমিসাৎ হইল। পুরোহিত সেই মন্দিরের সঙ্গে ভূপ্রোথিত হইলেন।

যে ব্যক্তি বলি দিবার জন্য খড়্গে শাণ দিতেছিল সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শিউনারায়ণ বলিল, "ব্রহ্মতেজ, ভাই ব্রহ্মতেজ, স্নানের সময় ইঁহার কটিতে উপবীত দেখিয়াছি, এ যে-সে ব্রাহ্মণ নহে—কোন সাধুপুরুষ।"

অপর এক দস্যু বলিল, "দেখ্‌ছিস্ না, ধরিবার সময়—বাঁধিবার সময় একটা চীৎকার করিল না—উপাধানে যেরূপ মাথা রাখে—যূপকাষ্ঠে সেই ভাবে মাথা রাখিতে গিয়াছিল।"

মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা দুইজন ভরতের বন্ধন ছাড়াইয়া দিল এবং নিজেরা ব্রহ্মশাপে নষ্ট না হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাকে লইয়া যাইয়া সেই মঞ্চের উপর পুনরায় রাখিয়া আসিল। কেহ পাছে কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে তাহারা পট্টবাস ও অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে মলিন বস্ত্র পরাইয়া রাখিল ও কপালের তিলক মুছিয়া ফেলিল।

তিন রাত্রি ক্রমাগত ভরত সেই মঞ্চের উপর বসিয়া ক্ষেত্রে পাহারা কার্যে নিযুক্ত রহিলেন।

অনসূয়া মনে ভাবিলেন, ঠাকুরপোর দ্বারা এখন কিছু কিছু কাজ পাওয়া যাইবে। হাবাটাকে, চারটা ভাত দিতে বিশেষ বিরক্তির কারণ থাকিবে না।

১৩

একদা সন্ধ্যাকালে ভরত ইক্ষুমতী নদীর তীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিতান একখানি গাঢ় কৃষ্ণ মেঘে খণ্ডিত হইয়া নদীতীরবর্ত্তী পুন্নাগ বৃক্ষের নিবিড় পত্ররাজিকে উজ্জ্বল করিতেছিল, জ্যোৎস্নাস্পর্শে নদীর তরঙ্গ বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র জ্যোতিঃ

সঞ্চার করিতেছিল। সহসা মেঘখানি চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, —সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুমতীর তটদ্বয়ে আঁধারের ছায়া পড়িল।

ভাদ্রমাসের মেঘ—আবার ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গেল, করধৃত দীপের জ্যোতিতে সুন্দরীর ন্যায় ধরিত্রী পুনশ্চ উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন।

জড়ভরত—এই নৈশ প্রকৃতি-দৃশ্যের এক প্রান্তে নিশ্চল চিত্রের ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে বহুসংখ্যক সৈন্যবেষ্টিত একখানি শিবিকা সেই পথে উপস্থিত হইল। অগ্রগামী সৈন্য জড়ভরতকে দেখিয়া বলিল, "এই একটা বলিষ্ঠলোক এখানে বসিয়া আছে, শিবিকা বহনে এই ব্যক্তি দক্ষ হইবে সন্দেহ নাই।"

একজন সৈন্য আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া টানিল।—ভরত বিনা বাক্যব্যয়ে সেই শিবিকাদণ্ড স্বীয় স্কন্ধে আরোপ করিলেন। বিনা বাক্য-ব্যয়ে এই ভার গ্রহণ করায় সকলেই মনে করিল শিবিকা বহনই ইহার ব্যবসায়। বলা বাহুল্য, তথায় একজন বাহকের অভাব হইয়াছিল।

এই শিবিকা সিন্ধু-সৌবীরাধিপতির—রাজার নাম রহুগণ। বিনা ওজরে ভরত শিবিকা বহনে নিযুক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার চলিবার ভঙ্গী সাধারণ মনুষ্যের মত ছিল না। পাছে পদ-পীড়নে জীবহত্যা হয় এই জন্য তিনি সতর্ক হইয়া পদক্ষেপ করিতেন। অপরাপর শিবিকা-বাহকদের সঙ্গে তাঁহার গতির সমতা রহিল না। এজন্য শিবিকা একদিকে হেলিয়া সহসা অপর দিকে উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং একবার রহুগণের মাথায় শিবিকার ছাদের প্রান্ত ঠেকাতে তিনি আঘাত পাইলেন।

সিন্ধু-সৌবীরাধিপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "শিবিকা এরূপ

অসমভাবে চলিতেছে কেন?" অপরাপর শিবিকা-বাহকেরা বলিল, —"মহারাজ, নবনিযুক্ত বাহক সমভাবে চলিতেছে না।"

রাজা শিবিকা-দ্বার হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, নবনিযুক্ত ব্যক্তিটি বিশেষরূপ বলিষ্ঠ। তখন তিনি ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "তোমার দেহখানি ত লৌহপিণ্ডবৎ, এই সামান্য ভারেই কি তাহা এত কাতর হইয়াছে! ভারবাহী গর্দ্দভ, অতঃপর সাবধানে শিবিকা বহিয়া যাও।"

ভরতের দেহে সুখ দুঃখ বোধ ছিল না। মনে দেহের অভিমান ছিল না। সুতরাং রাজার ভর্ৎসনায় কিছুমাত্র ব্যথা বোধ না করিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি পূর্ব্ববৎ অসম রহিল। সুতরাং শিবিকা একদিকে ঝুঁকিয়া সহসা উঠিতে পড়িতে লাগিল।

এবার রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ভার-বাহী গর্দ্দভ, নরপালের আজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল এখনই পাইবি। তোর দেহ এখনই খণ্ডবিখণ্ড করা হইবে।"

এবার জড়ভরত জীবনে প্রথম বাক্য উচ্চারণ করিলেন, বাণী স্বয়ং তাঁহার কণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তিনি অমৃতস্নিগ্ধ কণ্ঠে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় এই ভাবের কথা বলিলেন :—

"ভারবাহী আমি না তুমি? আমার দেহে আত্ম-বুদ্ধি নাই, এই দেহের ত্বকে একটি শিবিকার দণ্ড স্পর্শ করিয়া আছে, ইহা আমার ভার নহে।

"আর তুমি নিজের পরিচয় লইয়া দেখ, পিতারূপে, পুত্ররূপে, স্বামিরূপে, বিচিত্র মায়ার ভার তোমার আত্মাকে প্রপীড়িত করিতেছে। তুমি কতকগুলি অহঙ্কারের সমষ্টির মত শিবিকায় বসিয়া আছ। তুমি অজ্ঞানের ভারবাহী, সেই ভারে তোমার স্বরূপ তোমার নিকট গূঢ় হইয়া

পড়িয়াছে। তুমি আপনাকে নরপাল বলিয়া দর্প করিলে! পথের পথিককে ধরিয়া বিনা বেতনে বেগার খাটাইয়া লও, এই ভাবে তুমি নর পালন কর, তুমি অতি নিষ্ঠুর! আর তুমি আমার দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিবে, এই ভয় দেখাইলে। এই নশ্বর মৃদ্ভাণ্ড ভঙ্গের ভয় আমায় বৃথা দেখাও, ইহার সঙ্গে আমি অনেক পূর্ব্বেই সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়াছি। তুমি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার।"

এই ভৎ র্সনা পরম কারুণিকের মুখপদ্মের সুরভি-মাখা। রাজা অপ্রত্যাশিত ভাবে এই স্নিগ্ধ উপদেশমূলক গঞ্জনা লাভ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং যুক্তকরে বলিলেন, "আপনি কোন্ মহাজন! এমন অপূর্ব্ব উপদেশ-সুধা আমি জীবনে পান করি নাই। আমি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য কপিলাশ্রমে যাইতেছিলাম, আপনি কি স্বয়ং কপিল কিংবা বৃহস্পতি? আপনাকে হীনকার্যে নিযুক্ত করিয়া আমি অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি! এই দীনতম সেবকের দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনার ব্যবহারে ও কথায় তাহা আমার বুঝিতে বাকী নাই।"

জড়ভরত বলিলেন, "আত্মপ্রতারণাপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না—মহারাজ. তুমি বৈভবের মধ্যে বসিয়া, অহঙ্কৃত হইয়া ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবে না। মনুষ্যগণকে হীন মনে করিয়া, তাহাদের স্কন্ধের উপর আরূঢ় হইয়া, বেত্রহস্তে তাহাদিগকে গর্দ্দভের মত তাড়না করিতে করিতে ব্রহ্মলাভের প্রত্যাশায় কপিলাশ্রমে যাইতেছ! মহারাজ, ব্রহ্মজ্ঞান তোমা হইতে এখনও যতদূর, কপিলাশ্রম হইতেও ততদূরে থাকিবে।"

রহূগণ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞান পাইলে কি অবস্থান্তর ঘটে তাহাই জানিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। আমি পাপী তাপী—জ্ঞানের অধিকার আমার নাই। তথাপি ভগবৎসদৃশ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিয়া আমি পবিত্র হইয়াছি। আমার প্রতি সদয় হউন, আমার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। আমি আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা মত শুনিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না, এই নিমিত্ত চিত্তের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কপিলাশ্রমে যাইতেছিলাম।"

ভরত—"আপনি এ সম্বন্ধে কি কি মত শুনিয়াছেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

রহূগণ বলিলেন, "আমার সভায় পাঁচ জন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করেন না। এই পাঁচজনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জটাধর। তাঁহার মতে যদি কেহ গঙ্গার উত্তর উপকূলের সমস্ত জনপদ নির্ম্মনুষ্য করিয়া ফেলে, তথাপি সে কোন দুষ্কর্ম্ম করিল বলিয়া তিনি স্বীকার করেন না। যদি কেহ গঙ্গার উত্তর উপকূলের সমস্ত জনপদ ব্যাপিয়া মুক্তহস্তে দান করিয়া অগ্রসর হয়—তথাপি সে কোন পুণ্য কর্ম্ম করিল বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে পাপ-পুণ্য মানুষের কল্পনামাত্র। আমার সভার দ্বিতীয় পণ্ডিতের নাম কামেশ্বর। তাঁহার মতে ধনুঃ হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সীমা হইতে অধিকতর নিকটে বা দূরে পড়ে না। সেইরূপ জ্ঞানীই হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন, কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিবার কাহারও

সাধ্য নাই। জন্ম-জন্মান্তর ক্রমে স্বভাবাধীন ভাবে কর্ম্ম ক্ষয় হইলে জীব শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

"তৃতীয় পণ্ডিতের নাম নিগ্রন্থদেব। তাঁহার মতে সপ্তপ্রকার দ্রব্যে জগৎ নির্ম্মিত। ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা নির্লিপ্ত ও অবিনশ্বর—গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অটল। জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, সুখ, দুঃখ ও আত্মা এই সপ্ত দ্রব্য। ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা চিরস্থায়ী। যদি কেহ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা কাহারও জীবন নষ্ট করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সপ্তদ্রব্যের অভ্যন্তর দিয়া অসি চলিয়া গিয়াছে মাত্র।

"চতুর্থ পণ্ডিত পুণ্যজিৎ বলেন, আত্মা কি জানিতে হইলে, 'রূপস্কন্ধ' 'বেদনাস্কন্ধ', 'সংস্কারস্কন্ধ' ও 'বিজ্ঞানস্কন্ধ' এই চারি ভাব উত্তীর্ণ হইতে হয়; কিন্তু কি ভাবে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহার উপদেশ তিনি দেন না।

"পঞ্চম সুবাহুদেব অণুবাদী। তিনি বলেন—পরমাণু দ্বারাই জগতের বিকাশ। মনুষ্য-আত্মারও সূক্ষ্ম পরমাণুতেই পরিণতি লাভ হইয়া থাকে।

"ব্রাহ্মণ, আমি নিরন্তর এই কোলাহলময় কূটতর্কের মধ্যে পড়িয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকি, এজন্য সংশয়চ্ছেদনার্থ কপিলাশ্রমে যাইতেছিলাম।"

জড়ভরত বলিলেন, "রাজারা সভাশোভনার্থ বিচিত্র প্রকারের পারিষদ্ রাখিয়া থাকেন, আপনিও তদ্রূপ এই পণ্ডিত পারিষদগণ রাখিয়াছেন। আপনার ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা কিরূপে বুঝিব? কারণ, তাহা হইলে আপনার সাত্ত্বিক দৈন্য উপস্থিত হইত।"

তখন সিন্ধু-সৌবীরপতি রহূগণ শিরের মাণিক্য-খচিত উষ্ণীষ ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক জড়ভরতের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্,

আপনার কথা আমার কর্ণে অমৃতের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি পাপী তাপী, আমায় সদুপদেশ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।"

ভরত বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে যে অবস্থা ঘটে তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব! রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির অগ্নি-মান্দ্য ও চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়াছিল—সে যদি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়; কারারুদ্ধ শৃঙ্খলিত ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল পরে মুক্তিলাভ করে, প্রহার-জর্জ্জরিত ক্রীতদাস যদি হঠাৎ একদিন স্বাধীনতা লাভ করে, কিংবা মরুভূমিপথে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর পথিক নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হইয়া ভ্রমণের পরে যদি ধনধান্যশালিনী পল্লী প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সেই অবস্থান্তরজনিত যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তত্ত্বজ্ঞানজনিত আনন্দের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না, আমি উপমায় তাহা কি বুঝাইব?

"মহারাজ, যেরূপ কেহ পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল জলস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে সেই নির্ম্মল জলের ভিতর যে শঙ্খ, কাঁকর, প্রস্তর ও হাঙ্গর রহিয়াছে, তাহা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন—ব্রহ্মজ্ঞানী তদ্রূপ বাসনা-তাড়িত জীবের কষ্টগুলিও সেইরূপ দেখিতে পান।

"তাঁহার অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তিলাভ হয়। কুম্ভকার যেমন ইচ্ছানুসারে যে কোনরূপ ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে, স্বর্ণকার কিংবা হস্তিদন্তব্যবসায়ী যেরূপ যে কোন মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত মহাজন যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন।

"কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দ মুখে বলিবার নহে! কথিত আছে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ তাহা কেহ উচ্চারণ করিতে পারে নাই"—এই বলিতে বলিতে জড়ভরতের অঙ্গ এলাইয়া পড়িল, চক্ষুর্দ্বয় অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব প্রকটিত করিয়া ঊর্দ্ধগ হইল, দক্ষিণ বাহু

প্রসারিত হইয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কি দিব্য সুখের ধাম দেখাইতে লাগিল,—একটি পুন্নাগ বৃক্ষ যোগিবরের দেহের আশ্রয় হইল। তিনি নিশ্বাসশূন্য, পরমানন্দচ্ছটায় তদীয় মুখ-মণ্ডল দীপ্ত। জড়ভরত চিত্রার্পিতের ন্যায় ;—তাঁহার গ্রীবা হেলিয়া পড়িয়াছে, মুখে নবনীতকোমল শিশু ভাবের আভা পড়িয়াছে, তিনি বিহ্বল ও সংজ্ঞাশূন্য। পুণ্যতোয়া নদী যেরূপ দুই কূল স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহার মুখমণ্ডলের আনন্দচ্ছটা সেইরূপ মন ও দেহ উভয়ই পবিত্র করিয়া প্রকটিত হইয়াছে। ধূলি-ধূসর জীর্ণ-বাসপরিহিত, দেহ দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—তাঁহার হৃদয়ে যেন পূর্ণশশধর উদিত হইয়াছেন, তাঁহারই জ্যোৎস্না-কলাপ তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ জটা এবং তাঁহার মলিন গাত্র হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে ; দেহ হইতে অপূর্ব্ব সুগন্ধ নিঃসৃত হইয়া সেই স্থান স্বর্গীয় কুসুম-সুরভিবাসিত করিতেছে।

রাজা এমন দৃশ্য আর দেখেন নাই, তাঁহার বিশাল রাজ-প্রাসাদ, তাঁহার পুত্র-কলত্র, সংসার এই দৃশ্যের নিকট অতি তুচ্ছ। মানব-জীবনের যাহা পরম সম্পদ্—সে দৃশ্য দেখিলে কি অপর কিছু ভাল লাগে? যে কোহিনুর দেখিয়াছে—কাচখণ্ডে কি সে প্রীত হইবে?

রাজা বলিলেন, "আমি যাহা চাহিয়াছি, তাহা পাইয়াছি—আর সংসারে ফিরিব না।" সৈন্যগণ ও শিবিকা বিদায় করিয়া রহূগণ সেই দ্বিপ্রহর নিশীথে জড়ভরতের পাদমূলে পড়িয়া রহিলেন। রাজা স্বীয় পঙ্কিল বৈষয়িক জীবন স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন, জড়ভরত তদ্রূপই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভাবাবেশে আবিষ্ট রহিলেন।

কতক্ষণ চলিয়া গেল, উভয়ে তাহা জানিলেন না। যখন পূর্ব্বাকাশের উজ্জ্বল চিত্রকর পুন্নাগতরুর ঊর্দ্ধশাখার পত্রগুলিকে ঈষৎ রঞ্জিত

করিয়াছে, তখন জড়ভরতের ভাবসমাধি ভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন, দীনবেশে রাজা তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। জড়ভরত সাদরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "ভুজঙ্গদষ্ট ব্যক্তি যেরূপ মহৌষধে বাঁচিয়া উঠে, আমার দুর্নীতিবদ্ধ অহঙ্কারপুষ্ট আত্মা মহৎসংসর্গ পাইয়া আজ তেমনি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। এখন আমি ভগবৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিব না। আমি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী—বিমানচর মুক্ত বিহঙ্গকে দেখিয়া আমার উড়িতে ইচ্ছা হইতেছে, আমার পক্ষপুট বদ্ধ, আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া দিন।"

ভরত বলিলেন—"মহারাজ, আপনি দীনবেশে একাকী সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করুন, সর্ব্বদা অনুসন্ধিৎসু-চক্ষে নিজের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। উৎকৃষ্ট চিন্তা পোষণ করিবেন, সাধুসঙ্গ করিবেন, এবং কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না। আমার সঙ্গে যথাসময়ে আবার আপনার দেখা হইবে।"

১৪

জড়ভরত গৃহে আসিয়া পুনশ্চ মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। অনসূয়া বলিলেন, "হাবা, তুই রাত্রিকালে কোথায় থাকিস্, কিন্তু খাওয়ার সময় ঠিক হাজির হওয়া চাই—কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু এই জ্ঞানটি আছে! যা' হোক্‌গে আজ ঠাকুর পাঁচ মণ শালিধান্য পাঠাইয়া দিয়াছেন: সেগুলি পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, শুকাইতে দিলাম,—আমি সিতিকে লইয়া মামার বাড়ী চলিলাম। আজ ঠাকুর বাড়ীতে আসিবেন না, তুই এখানে ধানগুলির কাছে বসিয়া থাক্, আমি ফিরিয়া আসিয়া

বাঁধিয়া দিব। যদি মামা বেশী পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমাদের সেখানেই খাইতে হবে, তা আমি বেলা থাকিতে আসিয়া তোকে বাঁধিয়া দিব।"

এই বলিয়া সিতিকণ্ঠকে কোলে করিয়া অনসূয়া দেবী চলিয়া গেলেন। জড়ভরত সেই ধান্যের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। এতগুলি ধান্য উঠানে ছড়ান রহিয়াছে—বিস্তর চড়ুই পাখী সেই ধান্যের চতুর্দ্দিকে উড়িয়া আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা একবার লাফাইতে লাফাইতে একটু অগ্রসর হইতেছে, আবার ভরতকে দেখিয়া দূরে পলাইতেছে। কিন্তু ভরত স্থাণুর ন্যায় অটল, ক্ষুদ্র পক্ষীগুলির আহারে ব্যাঘাত জন্মাইবার তাহার কোনই প্রবৃত্তি নাই। কিছু কালের মধ্যেই পক্ষীগুলির ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারা বুঝিল যে, ভরত একটা মানুষের ছবির ন্যায়। তাঁহার দুইটি বিকাররহিত চক্ষুতে তাহারা পরম করুণা বুঝিতে পারিল, সুতরাং চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশ্চিন্তমনে আসিয়া সেই উঠানের উপর চড়িয়া ধান্য খাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ঘাড় নাড়িয়া ভরতকে দেখিতে লাগিল, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যেন 'ভয় নাই' এই বাণী সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে যেগুলি অতিশয় ভীরু, তাহারা তখনও আসিতে সাহসী হয় নাই, দূর হইতে পক্ষপুট নাড়িতেছিল, এবং এক এক বার লাফাইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা পাইয়া ক্ষুদ্র কোন শব্দ হইলেই চকিত হইয়া বহু-দূরে পশ্চাতে হটিয়া পড়িতেছিল। ক্রমে তাহাদেরও ভয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং বিশ্বের সমস্ত চড়ুইপাখী একত্র হইয়া সেই উঠান আক্রমণ করিল।

প্রায় এক প্রহর পরে নিজের এবং পুত্রের উদরতৃপ্তি করিয়া বেলা

প্রায় দুই ঘটিকার সময় অনসূয়াদেবী সিতিকণ্ঠের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি একটু তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলেন—ঠাকুরপো না খাইয়া ধান্যের প্রহরা দিতেছেন, অথচ নিজে আহার করিয়াছেন—এজন্য একটু লজ্জিত হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাঁহার বাড়ী চড়ুইপাখীদের আড্ডা হইয়াছে, ধান্যগুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। জড়ভরত উঠানের এক কোণে বসিয়া আছেন, বিক্ষিপ্ত ধান্যকণা তাঁহার পাদমূল হইতে খাইবার জন্য কতকগুলি পাখী তাঁহার গাত্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে—ভরতের দৃক্‌পাত নাই।

এই দৃশ্য অনসূয়ার অসহ্য হইল। তিনি এক খণ্ড অসম কাষ্ঠ গ্রহণ-পূর্ব্বক হাবার পৃষ্ঠে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন। পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ক্রমাগত আঘাতের চোটে হাবা উপুড় হইয়া মৃত্তিকার উপর পড়িয়া গেল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

এই ভাবে প্রহার করিয়া বধূঠাকুরাণী, পক্ষীর ভুক্তাবশিষ্ট অর্দ্ধমণ ধান্য তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইয়া গৃহে যাইয়া শুইয়া রহিলেন। সিতিকণ্ঠ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার হইল না।

যখন বেলা প্রায় উত্তীর্ণ হয়, তখন গৃহিণী ভাবিলেন, ভরতের মুখ দেখিয়া ঠাকুর নিশ্চয়ই বুঝিবেন, যে তাহার খাওয়া হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গের আঘাত চিহ্ন দেখিলে তিনি পাঁচ মণ ধান্যের কথা উপেক্ষা করিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইবেন। গৃহের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার তাহাকে না দেওয়ার জন্য তিনি বারবার বলিয়া দিয়াছেন, এ অবস্থায় কিছু

খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র উহাকে কুটীরে রাখিয়া আসি। ঠাকুর আসিলে বলিব, 'সে খাইয়া শুইয়া আছে,' আর আঘাত-চিহ্ন দেখিলে বলিব 'কে মারিয়াছে কে জানে ? এরূপ মা'র ত প্রায়ই খাইয়া থাকে।'

কিন্তু এমন ব্যক্তিকেও খাইতে দিতে ইচ্ছা হয় ! পশুকে পশুর যোগ্য আহার দান করা উচিত। এই ভাবিয়া অনসূয়া দেবী রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহের এক কোণে কতকগুলি দগ্ধ তণ্ডুল মাটিতে পড়িয়া আছে , সেইগুলি, কিছু তুষ ও পচা খইল এই তিন দ্রব্য একীকরণপূর্ব্বক জল দিয়া সিদ্ধ করিলেন ; তাহাতে এরূপ দুর্গন্ধ হইল, যে তাহাকে নাসিকায় বস্ত্র দিয়া রন্ধন কার্য্য সমাপন করিতে হইল। এই ত্রিবিধ দ্রব্য সিদ্ধ হইয়া যাহা হইল, তাহা কোন জীবের ভক্ষ্য নহে। অনসূয়া ভাবিলেন, 'হাবাকে যাহা দেওয়া যায়, তাহাই খায়. আজ তাহার বিশেষ শাস্তির প্রয়োজন। এই খাদ্য আজ তাহাকে খাইতে হইবে। যাহা দ্বারা প্রাণ রক্ষা হয়, সেই ধান্যের উপর এত অবজ্ঞা, আজ হইতে এইরূপ খাদ্য খাইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে।'

রান্না শেষ হইলে হাবার কুটীরে যাইয়া বধূঠাকুরাণী একখানি শাল-পত্রের উপর সেই দুর্গন্ধ অখাদ্য দ্রব্য রাখিয়া চলিয়া আসিলেন জড়ভরত তাহা খাইতে গেলেন। পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে অবিরত রক্ত পড়িতেছে সারাদিন কিছু না খাইয়া উদর কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দেহ ধূলি মাখা ও প্রহার-চিহ্নে অসম, বেলা তখন প্রায় অতীত হইয়াছে। পরম ভাগবত জড়রূপী ভরত কুটীর মধ্যে নারায়ণকে প্রথমতঃ খাদ্য নিবেদন করা মাত্র খাদ্য অমৃতে পরিণত হইল।

অনসূয়া সায়ংকালে সেই স্থান মুক্ত করিতে যাইয়া দেখেন, শালপত্র-স্থিত সমস্ত খাদ্যনামধেয় অখাদ্য নিঃশেষ করিয়া ভরত একটা চটের উপর

বসিয়া আছেন। অনসূয়া নাকে কাপড় দিয়া সেই স্থান মুক্ত করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন হাবাটা সত্যই পশু! গরু কি ছাগলেরও যে খাদ্য অভক্ষ্য—হাবা তাহা স্বচ্ছন্দ চিত্তে খাইয়া বসিয়াছে!' নাকে কাপড় না দিলে তিনি বুঝিতেন, শালপত্র হইতে দিব্য পদ্মগন্ধ নিঃসৃত হইতেছিল।

যাহা হউক, দগ্ধ তণ্ডুল ও পচা খইল যাহার খাদ্য তাহার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন, বধূঠাকুরাণী এবার মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

দুই তিন দিন এই ঘৃণিত খাদ্য জড়ভরতের জন্য প্রস্তুত হইল, তাহার দুর্গন্ধ এরূপ যে প্রতিবেশিনী রমণীরা আসিয়া অনসূয়াকে জিজ্ঞাসা করে —"হ্যাগা, তোর রান্নাঘরে এরূপ পচাগন্ধ কিসের?" অনসূয়া বলেন, "কিসের গন্ধ ভাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কোন জিনিষ হয়ত ঘরের কোন স্থানে পচিয়া আছে, আজ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিব।"

নিজেদের রান্না যত্নপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া—একটা পরিত্যক্ত উনানে সে দগ্ধ তণ্ডুল, পচা খইল ও তুষ রান্না করা হয়; গৃহের গাভীগণ খাইয়া যে খইল পরিত্যাগ করে—সেই পচা খইল, তুষ ও দগ্ধ তণ্ডুলযোগে এরূপ দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। অনসূয়ার নাসিকা ক্রমে সেই গন্ধে অভ্যস্ত হইয়া গেল। তিনি এখন রাঁধিবার সময় আর নাসিকায় বস্ত্র প্রয়োগ করেন না। এইরূপে একদিন উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিবার সময় আর নাসিকা-পথ বন্ধ করিলেন না। শালপত্রে কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাহা আঁস্তাকুড়ে ফেলিতে যাইয়া তাহাতে দিব্য পদ্মগন্ধ পাইলেন। 'এ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে', চিন্তা করিয়া তিনি উচ্ছিষ্টসহ শালপত্রের ঘ্রাণ লইয়া বুঝিলেন, এ গন্ধ সেই উচ্ছিষ্টের, তখন বিস্মিত হইলেন।

হাবা এই খাদ্য রোজ রোজ কিরূপে খায়? ইহার গন্ধই বা এমন মনোহর কিসে হইল? একি আমার হস্তের স্বাভাবিক গন্ধ? যাহা হউক, হাবা ইহা কিরূপে খায় একবার দেখা আবশ্যক। এখানে ত কেহ নাই, এই মনে করিয়া অনসূয়া সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যের এক কণা মুখে তুলিয়া অমৃতের আস্বাদ পাইলেন। তখন অচিরাৎ অবশিষ্ট সমস্ত খাইয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন! এমন অপূর্ব্ব জিনিষ তিনি পিত্রালয়ে কিংবা স্বামীর গৃহে খান নাই। একবার জালন্ধরের রাজা তথায় আগত হইয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণীগণকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। উৎসবের দিনে রাজগৃহাধিষ্ঠিত দেবতার যে সকল দ্রব্যে ভোগ দেওয়া হয়, তাঁহাদের জন্য সেই খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই উপলক্ষেও অনসূয়া এমন সামগ্রী খান নাই।

অনসূয়া স্বামীর নিকট দ্রব্যগুণের কথা শুনিয়াছিলেন, চুণ ও হলুদ একত্র মিশাইলে রক্তবর্ণ হয়, অথচ ঐ দুই বস্তুর কোনটিতেই রক্তবর্ণ নাই। স্বামীর কাছে একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাদে দেখ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, চুণ ও হলুদে লালবর্ণ কোথা হইতে আসে?"—মুক্তিকাম বলিয়াছিলেন "উহা দ্রব্যগুণ"। আজ অনসূয়ার মাথায় চট্ করিয়া সেই কথাটার উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, উহা দ্রব্যগুণ, তাঁহার হস্তের অদ্ভুত শিক্ষার গুণে, সেই তিন অখাদ্য মিশ্রিত হইয়া এরূপ সুখাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সত্য আবিষ্কার করিয়া অনস্থয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন,—কোন্ সময়ে স্বামী আসিবেন,—সেই আশায় ছট্‌ফট করিয়া একবার ঘর, আর বার বাহির হইতে লাগিলেন, উঠানে শব্দ হইলেই অমনি বাহির হইয়া বলেন, "ওগো এসেছ নাকি ?" রাত্রির কতকাংশ অতিবাহিত হইলে মুক্তিকাম স্বীয় গৃহ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। গৃহিণী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কাষ্ঠপাদুকা ও জল প্রদান করিলেন। ঠাকুর পদের কর্দ্দম ধৌত করিতে উদ্যত হইলে গৃহিণী বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া নিজেই স্বীয় লৌহ-শঙ্খ-ভূষিত করে ব্রাহ্মণের পদলগ্ন কর্দ্দম ধুইয়া ফেলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আজ এ অতি ভক্তি কেন ?" অনস্থয়ার বিম্বাধর হর্ষ ও গর্ব্বে ফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তিনি কোন কথা না বলিয়া খাওয়ার স্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ নিমীলিত চক্ষে আহ্নিকে বসিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি স্মিতমুখে স্বামীর নিকট ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আহ্নিক শীঘ্র সারিয়া আইস, কথা আছে।"

অনস্থয়ার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া মুক্তিকাম মনে করিলেন, পত্নী নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত ধনাগারের খোঁজ পাইয়াছেন, স্বতরাং করাঙ্গুলী জপকার্য্যে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরিতে লাগিল—কোন ক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া আহার করিতে বসিলেন, এবং পঞ্চ দেবতাকে অন্ন নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"বল ব্রাহ্মণী, ব্যাপারখানা কি ?"

অনস্থয়া বলিলেন,—"সে হবে, তুমি খাইতে আরম্ভ কর।" ব্রাহ্মণ স্ত্রীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন

অনসূয়া ব্যজনী হস্তে উত্তপ্ত ব্যঞ্জনের বাটীর উপর বীজন করিতে করিতে বলিলেন, "ঠাকুর তোমায় কাল একটা কাজ করিতে হইবে। কাল আর তুমি যজন-কার্য্যে বাহিরে যাইতে পারিবে না।"

একরাশ অন্ন হাতের থাবায় লইয়া মুক্তিকাম হাঁ করিয়া বলিলেন,— "কেন ?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"এই গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে কল্য তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে, আমি রাঁধিয়া খাওয়াইব।"

মুক্তিকাম—"এত পয়সা আমার কিসে হইল ? উৎসবটাই বা কি ?"

অনসূয়া—"তোমার অতি সামান্য খরচেই হইবে,—যে সকল দগ্ধ তণ্ডুলকণা অভক্ষ্য বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছি, তাহা এবং গরুর অখাদ্য পচা খইল ও তুষ আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ ত অবাক্—গৃহিণীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে সংসার চলিবে কিসে, সিতিকেই বা কে রাখে ?

অনসূয়া বলিলেন,—"তুমি হাঁ করিয়া রহিলে যে,—বিশ্বাস হইল না—না, আমায় পাগল ঠাওরাইলে ? সে সকল কিছুই নহে, আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, দৈববলে আমি এরূপ চমৎকার রান্না শিখিয়াছি যে, ঐ সকল জিনিষ পাইলে আমি অমৃত রাঁধিয়া দিব। পৃথিবীতে সেরূপ সুখাদ্য কেহ খায় নাই, তাহা স্বপ্নেও কেহ ধারণা করিতে পারে না ;—তুমি অবিশ্বাস করিয়া ঘাড় নাড়িতেছ। তোমাকে কাল আমার কথা মত কাজ করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণের কিছুতেই প্রত্যয় হয় না, কিন্তু স্ত্রীর একান্ত দ্বিধা-শূন্য ভাব দর্শনে এক একবার ভাবেন কি জানি—"ন চ দৈবাৎ পরং বলং"—হইলে হইতে পারে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর মুক্তিকাম সে রাত্রিতে আর চিন্তা করিতে

পারিলেন না। স্ত্রী যাহা এত আগ্রহে—এত উৎসাহে বলিতে লাগিলেন, তাহা খণ্ডন করিলে, কান্নাকাটি ও দীর্ঘনিশ্বাসের চোটে নিদ্রাদেবী সেই গৃহ হইতে সেই রাত্রির জন্য নিষ্ক্রান্ত হইবেন—সুতরাং মুক্তিকাম বিনা ওজরে স্ত্রীর সকল কথারই সম্মতি জানাইয়া হস্তপদ প্রসারণপূর্ব্বক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনসূয়া অমৃতের রন্ধন ও পরিবেশনের চিন্তায় সারা রাত্রি জাগিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গৃহিণীর তাড়নায় ও শিক্ষামত মুক্তিকাম সেই পল্লীর সকল ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন,—তাঁহার পত্নী অমৃত রান্না করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা আজ মধ্যাহ্নে সেই অমৃতের পরীক্ষা করিবেন। ভ্রাতা চলিয়া গেলে শ্রীকণ্ঠ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন,—"তোমাদিগকে লইয়া ঘর করা কেবলই বিড়ম্বনা, জিনিষপত্র উৎকৃষ্ট দেখিয়া বাজার হইতে লইয়া আসি, আর রান্নার গুণে তাহা মুখে দেওয়ার উপায় নাই, কতকগুলি গরুর খাদ্য খাইয়া কেবল ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া আছি। আজ বড় দাদার স্ত্রী অমৃত রান্না করিতে শিখিয়াছেন। শুনিলাম তাহাতে ব্যয়-বাহুল্যও কিছু নাই, সকলই অদৃষ্ট।" শ্রীকণ্ঠ-পত্নী অমৃত-রন্ধনে অপটু; সুতরাং মুখ নাড়া খাইয়া বিষণ্ণভাবে স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

আজ মুক্তিকাম-ঠাকুরের গৃহে অমৃত রান্না,—ক্ষুদ্রপল্লীতে এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে। শিশুগণ অমৃতভক্ষণের হর্ষে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া নাচিতেছে। ব্রাহ্মণ-পল্লীতে নিমন্ত্রণের আকর্ষণ, তারপর দেবদুর্লভ অমৃত আস্বাদনের লোভ! এই উপলক্ষে কত স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্র যে পত্নী, ভগিনী ও মাতৃগণকে খোঁটা দিতেছেন তাহার অবধি নাই,—মুক্তিকামের স্ত্রী অনসূয়া-ঠাকুরাণীর যশের ভেরী পূর্ব্বেই বাজিয়া উঠিয়াছে।

১৬

মধ্যাহ্ন হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণগণ মুক্তিকামের গৃহে একত্র হইয়াছেন, সকলেই বলিতেছেন,—"একটা পচা গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে ?" কেহ কেহ হুঙ্কার তুলিতেছেন। মুক্তিকাম পাগলের মত এক একবার রান্না-ঘরে যাইয়া বলিতেছেন,—"আনি (অনসূয়ার সংক্ষেপ), তুই সর্ব্বনাশ করিলি, আজ ব্রাহ্মণগণ আমার মুখে চুণকালি দিয়া যাইবেন, আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিব না, তুই আমায় পৈতৃক ভিটায় থাকিতে দিলি না। আমি পাগ্লীর কথা শুনিয়া পাগল হইয়াছিলাম,—এই দুর্গন্ধে পশু পর্য্যন্ত ছুটিয়া পালায়, ইহাই না কি অমৃত হইবে! হায় ভগবান্, আমার মুখ রক্ষা কর। আমার সর্ব্বস্ব যাউক, আমি যেন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণদিগকে ভালরূপে খাওয়াইয়া সায়াহ্নে মৃত্যুমুখে পতিত হই,—এ বিপদ্ হইতে, হে দয়াল ঠাকুর, রক্ষা কর।" —এই বলিয়া ব্রাহ্মণ যুক্তকর উর্দ্ধে তুলিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন, আর তাঁহার গণ্ডদ্বয় বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে।

গৃহিণী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি পাগল হইলে নাকি ? —এই খাদ্য শালপত্রে পড়িলেই অমৃত হইবে, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অপেক্ষা কর, দ্রব্যগুণে কি না হয় !"

রান্না যতই শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই দুর্গন্ধ অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ কাপড় দ্বারা নাক বন্ধ করিয়া কোথা হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছে তাহারই স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা পাইতেছেন।

ব্রাহ্মণগণ আহার করিতে বসিয়া গেলেন। অবগুণ্ঠনবতী অনসূয়া শালপত্রের উপর সেই খাদ্য কিছু কিছু রাখিয়া গেলেন। ক্ষুৎপিপাসাতুর

ব্রাহ্মণগণ দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ ক্ষুধার আতিশয্যে খাদ্যের দুই একটু অংশ মুখে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ থুত্কার করিয়া ফেলিলেন। মুক্তিকাম মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণায়, ক্রোধে অন্ধ হইয়া একটা বংশের লাঠি লইয়া অনসূয়াকে বিষম প্রহার করিলেন।

অনসূয়া ভূতলে পড়িয়া লজ্জায় মৃত্তিকায় মুখ লুকাইয়া রাখিলেন। সহস্র বৃশ্চিকে যেন তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। তখন অনসূয়ার দর্প টুটিল, দর্পহারীর কৃপা হইল। তিনি সহসা উঠিয়া পাগলিনীর মত কুটিরে প্রবেশ করিয়া হাবার চরণে গড়াইয়া পড়িলেন,—"ঠাকুরপো, সে অমৃত তোর কৃপায় হইয়াছে, আমি তোর ভ্রাতৃবধূ, তোর ঘরের কুলরমণী আমায় এ লজ্জা হইতে রক্ষা কর্, তোর পৃষ্ঠে কত চেলাকাঠ ভাঙ্গিয়াছি, তোকে কত ভর্ৎসনা করিয়াছি, কত কুখাদ্য খাওয়াইয়াছি। কাল তুই ঝাঁটা মারিয়া আমায় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিস্, আজ এই ঘোর লজ্জা হইতে ভ্রাতৃবধূকে রক্ষা কর, ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ হইতে তোর দাদাকে ও তোর বংশের বংশধর সিত্তিকে রক্ষা কর্।" সংজ্ঞাহীনার মত অনসূয়া জড়ভরতের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

তখন আস্তে আস্তে ধূলি-ধূসর জটিল মস্তক পুরুষবর স্বীয় কুটীর ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার মুখে কেহ কখনও ভাষা শোনে নাই, আজি তিনি দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—"আপনারা আহারে বসিয়াছেন, আহার করুন। গৃহস্বামীর অপরাধ লইবেন না। আপনারা যদি তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন, তবে অমৃত হইতে বঞ্চিত হইবেন না, কারণ ক্ষমাতেই অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে।" ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন—হাবা কথা বলিতেছেন—কণ্ঠ সুধামধুর—সৌজন্যের বিলাস।

ব্রাহ্মণগণকে উত্তর করিতে অবসর না দিয়া জড়ভরত প্রত্যেকের সম্মুখস্থ খাদ্যসহ শালপত্র স্পর্শ করিলেন, অমনই তাহাতে পদ্মগন্ধ ও অমৃতের আস্বাদ উপজাত হইল। ব্রাহ্মণগণ সেই অমৃতাস্বাদনে মুগ্ধ হইলেন, তাঁহাদের আর আহারে প্রবৃত্তি রহিল না। তাঁহারা জড়-ভরতকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে পূজা করিতে উদ্যত হইলেন। জড়ভরত বলিলেন,—"আপনারা গৃহস্থের নিমন্ত্রণ রক্ষা করুন, ভোজনান্তে আপনাদের সঙ্গে আমার কথা হইবে" এই বলিয়া তিনি স্বীয় কুটিরের দাওয়ায় নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণগণ আহারান্তে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। জড়ভরত বলিলেন,—"আপনারা আমার কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আজ কথা বলিতেছি, চিরদিন আমাকে আপনারা 'হাবা' বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। আমার পূর্ব্ব-পরিচয় আপনাদিগকে জানাইতেছি।

"আমি পূর্ব্বে এক জন্মে ঋষভ-দেবের পুত্র ভরত ছিলাম। সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে তপস্যা করিতে গিয়াছিলাম, তথায় আমি তপস্যায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমি আপনাকে মায়ার অতীত মনে করিয়াছিলাম, সেই অহঙ্কারে আমি মায়ায় পতিত হইলাম। একটা মৃগের জন্য আমি তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া, একান্ত মুগ্ধ হইয়া শেষে মৃগচিন্তা করিতে করিতে মৃগযোনি প্রাপ্ত হইলাম।

"মৃগ হইয়া আমি ভগবদারাধনার সুখ হইতে বঞ্চিত হই। তখন বড় খেদ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই খেদে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া পবিত্র হইলাম। পূর্ব্বজন্মের তপস্যানিবন্ধন ভগবান্ আমাকে জাতিস্মর করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধুসঙ্গের গুণে ও সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত তীর্থক্ষেত্রে বাস করিবার পর আমার মৃগদেহ অচিরাৎ লয় পাইল।

"তৎপর ব্রাহ্মণকুলে এই জন্ম লাভ করিয়া আমি ভাবিলাম, যাহাতে এ জন্মে আর ভগবদারাধনায় ব্যাঘাত না ঘটে,—জীবনে মরণে তাহারই চেষ্টা করিব। পুনর্ব্বার পতিত হইবার ভয় আমাকে এতদূর অধিকার করিয়াছিল যে, আমি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে সাহসী হই নাই। আমি সর্ব্বদা একচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে আরাধনা করিয়াছি, ভগবান্ কি আমার উপর প্রসন্ন হইবেন না? আমি তাঁহাকে কোথায় পাইব?" বলিতে বলিতে জড়ভরত সংজ্ঞাহীনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বদন হইতে অলৌকিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে সেই দেহ কদম্ব-কোরকবৎ হইল। অপোগণ্ড শিশুর কমনীয়তা, তাঁহার মুখমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল। তিনি মুক্তিকামের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া রহিলেন। এভাব ত কতদিন হইয়াছে। হাবাকে ত তোমরা কেহই দেখ নাই—কেহই চিন নাই। আজ কেহ মুখে সাবধানে ব্যজন করিতেছে, কেহ কর্ণে ভগবৎ নাম শুনাইতেছে, যেন স্বর্গের দেবতাকে ভূতলে পাইয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া দিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ, মহাদেব, নীলাঞ্জনাথ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ আজ হাবাকে পাইয়া হারানিধির মত বক্ষে রাখিতে প্রস্তুত। দূরে—সমস্ত নর-নারী সমাজ হইতে স্বতন্ত্র—রান্নাঘরের পার্শ্বে আম্রবনতলে বসিয়া অনসূয়া হাবার সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ বদনমণ্ডল দেখিতেছেন, আর কাঁদিতেছেন, "এই মুখে আমি দগ্ধ তণ্ডুল ও পচা খইল দিয়াছি। ঠাকুরপো, আমার আর গতি নাই।" তিনি এ গৃহে আর মুখ দেখাইবেন কিরূপে? নীলকণ্ঠ বলিল, 'বাবা ও মা হাবাকে চিনিতেন, তাই এত আদর করিতেন, আমরা স্পর্শমণি পাইয়া হেলা করিয়াছি।'

জড়ভরত কাহারও কোন উপরোধ-অনুরোধ না মানিয়া হরিদ্বারে

চলিয়া গেলেন। সেখানে সিন্ধু-সৌবীরাধিপতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

হিমাদ্রি অনন্তকাল স্থিরভাবে বসিয়া আছে। কি এক মহিমাদর্শনে হিমাদ্রি ভাবে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার নড়িবার শক্তি নাই। সেই ভাবে বিস্ময়াপন্ন হইয়া হিমাদ্রি স্তব্ধ চিত্রের ন্যায় প্রশান্ত। বিশাল জটাজুটের মধ্যে তুষাররাশি এলাইয়া পড়িয়াছে। হরিদ্বারে জটার তুষার বিস্ময়ে বিগলিত হইয়া গঙ্গাস্রোতে পরিণত হইয়াছে। এই অফুরন্ত তপস্যা জগৎকে সুধা-মধুর করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রিকালে সমাধি-প্রশান্ত গিরির ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রের উদয় হয়। সমাধি ভঙ্গ হইলে দিবসে গিরিবরের তৃতীয় নেত্রের ন্যায় সূর্য্য সমুদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করে, যোগভঙ্গের পরে যে জাগরণ তাহাতে প্রবৃত্তিনিচয় জাগিয়া উঠে। তৃতীয় নেত্রনিঃসৃত তীক্ষ্ণ রশ্মি সেই অজ্ঞান ধ্বংস করে। হে হিমাদ্রি, ভীষণ অজগর তোমার শরীরে বিহার করিতেছে, তোমার ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহাদের ফণারক্ষিত বিষ তোমার অঙ্গ-ধূলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সেই অঙ্গ-নীলকান্তমণির সৃষ্টি হইতেছে—তোমার উপকণ্ঠে সেই মণির নীলিমা।

হে হিমাদ্রি, তুমি কি শৈলাধিরাজ না ভগবানের স্বহস্তে নির্ম্মিত প্রশান্ত শিবমূর্ত্তি? তোমারই স্থিরমূর্ত্তিতে যেন জড়ভরতের—ভারতীয় সাধুর রূপের আভাস দেখিতে পাই; নির্ব্বিকল্প ভারতীয় সাধুর চিত্ত সেই হিমাদ্রি শৃঙ্গের মত, উচ্চতায় জগতের সর্ব্ব-আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে বিস্ময়কর, হে চিরশান্ত, চিরসুন্দর সর্ব্বকালে পূজ্য শিব, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

সতী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এবার এই পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে পুস্তকখানি আদ্যন্ত সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল।

১৯, কাঁটাপুকুর লেন
বাগ্‌বাজার, কলিকাতা
১৬ই পৌষ ১৩১৬

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভূমিকা

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ-ত্যাগের উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন, সেই উপাখ্যানটি গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। "বেহুলা" ও "ফুল্লরা" লিখিতে যাইয়া প্রাচীন সাহিত্যের যেরূপ অজস্র উপকরণ দ্বারা আমি সহায়বান্ হইয়াছিলাম, দাক্ষায়ণী সতীর বৃত্তান্ত লিখিতে আমি তদ্রূপ সাহায্য অতি সামান্যই পাইয়াছি। মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও জয়নারায়ণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাচীন বঙ্গীয় কবি এ সম্বন্ধে যে কিছু বিবরণ দিয়াছেন তাহা অতি সামান্য, আমি তাহা হইতে আহরণ করিবার উপযোগী উপকরণ অতি অল্পই পাইয়াছি। ভারতচন্দ্রের বর্ণিত শিবের ক্রোধ ও দক্ষযজ্ঞ-নাশ—ছন্দের ঐশ্বর্য্য ও ভাষাসম্পদে উক্ত কবির অমরকীর্ত্তিস্বরূপ প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দ ভাঙিয়া কথাগুলি গদ্যে পরিণত করিলে কবির অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্রের মোহিনী শক্তি নষ্ট হয়, সুতরাং অন্নদামঙ্গল হইতে আমি উপকরণ সংগ্রহের তাদৃশ সুবিধা প্রাপ্ত হই নাই। অপরাপর বঙ্গীয় কবিগণকৃত এই বিষয়ের বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত, এমন কি উল্লেখযোগ্যই নহে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা কতকটা সবিস্তর, আমি তাহাই কথঞ্চিৎ অবলম্বনপূর্ব্বক এই গল্পটি লিখিয়াছি।

এই উপাখ্যানসংক্রান্ত একটি কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে হইবে। এ দেশের লোকের প্রচলিত বিশ্বাস যে, মহাদেব যখন সতীকে দক্ষালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন, তখন সতী দশমহাবিদ্যার বিচিত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক স্বামীকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। আমি এই অংশ উপাখ্যান-

ভাগ হইতে বর্জ্জন করিয়াছি। সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, একমাত্র মহাভাগবতপুরাণে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব সম্বন্ধে উক্তপ্রকার আখ্যায়িকা পরিদৃষ্ট হয়, অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহা নাই। কুব্জিকাতন্ত্র, স্বতন্ত্র তন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবের কারণ ভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ অসুর নিধনকালে কিংবা অপর কোন প্রকার ঘটনায় পড়িয়া দেবী দশমহাবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন— দক্ষালয়ে যাওয়ার উপলক্ষে তাঁহার দশমূর্ত্তির কল্পনা একমাত্র পূর্ব্বকথিত মহাভাগবত-পুরাণেই দৃষ্ট হয়; দক্ষযজ্ঞের সম্বন্ধে শিবপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকাই বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য, তাহাতে দশমহাবিদ্যার কল্পনা নাই। শুদ্ধ মহাভাগবত-পুরাণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ দশমহাবিদ্যার বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন এবং তজ্জন্যই এ দেশে সেই ধারণাটি বদ্ধমূল হইয়াছে।

আশা করা যায়, একমাত্র সংস্কৃত পুরাণের নজির গ্রহণ না করার অপরাধে গল্পলেখককে বিশেষরূপে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে না। কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার দশমহাবিদ্যানামক কাব্যে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব সতীর দেহত্যাগের পরবর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কল্পনায় সৃষ্টি। আমি সতীর চিত্র যে ভাবে চিত্রণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তাহাতে দশমহাবিদ্যার সঙ্গতি রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হইত, এজন্যই আমি উহা বর্জ্জন করিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত বিবরণ যখন আমার অনুকূলে, তখন আমি লিখিতে যাইয়া স্বয়ং কোনরূপ দ্বিধা বোধ করি নাই।

ভূমিকা

প্রাচীনকালে স্বামীর প্রেম ও রমণীর পাতিব্রত্যের যে আদর্শ বঙ্গীয়-সমাজের সম্মুখে ছিল, এই গল্পে যদি তাহার আভাস দিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমাদের সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তৎসঙ্গে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পরিচয় স্থাপন করা উচিত—তাহা হইলেই আমরা বর্ত্তমানের উপযোগী সমাজ গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি পাইব, নতুবা পাদ্রীর বক্তৃতা শুনিয়া কাফ্রি বা সাঁওতালের ন্যায় একবারে নিজস্ব হারাইয়া—নব্য-সভ্যতার গ্রাসে পতিত হওয়া শ্লাঘার বিষয় নহে। সেই পরিচয়স্থাপনের চেষ্টা কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি শিল্প, সকল দিক দিয়াই প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রযত্নের বিষয় হওয়া উচিত। সাহিত্যক্ষেত্রে এই লক্ষ্যই আমার সামান্য লেখনীকে প্রেরণা দান করিয়াছে। ১৬ই পৌষ ১৩১৪

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১

ভৃগু-প্রজাপতির গৃহে মহাযজ্ঞ—অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষিগণ মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। রাত্রিকালে চন্দ্র ও দিবসে সূর্য্য পর্য্যায়-ক্রমে দ্বারদর্শীদ পদ গ্রহণ করিয়াছেন। দেবসভায় বিষ্ণু মাল্য-চন্দন পাইয়া যজ্ঞের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্র কর্ম্মকর্ত্তৃরূপে অভ্যাগতদিগকে আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও বৃহস্পতির সঙ্গে শাস্ত্র-বিচার জুড়িয়া দিয়াছেন; উনকোটি তাহার হস্তে আলো রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ করিয়া রন্ধনশালা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, বরুণ ভৃঙ্গারহস্তে নবাগত দেবগণের পদ-প্রক্ষালন করিতেছেন। কপিলাগাভী অজস্রধারায় দুগ্ধ প্রদান করিতেছে এবং বিষ্ণুদূতগণ সেই দুগ্ধ হইতে সদ্যঃ হব্য প্রস্তুত করিতেছে। সেই হব্যে পুষ্ট হইয়া হোমাগ্নি জ্বলিতেছে।

যমরাজের সঙ্গে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। যমরাজ মাণিক্য-মণ্ডিত একটা নস্যাধার হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া অনেক কথা শুনিয়া দুই একটি উত্তর দিতেছেন। তাঁহার রথবাহক স্বর্ণ-শৃঙ্গ কৃষ্ণকায় মহিষপ্রবর ব্রহ্মার অঙ্গের রক্তজ্যোতিঃ দেখিয়া ক্রোধে রোমাঞ্চিত হইতেছে। শূলপাণি সভার একটু দূরে উর্দ্ধনেত্র হইয়া বসিয়া আছেন—যেন প্রশান্ত রজতগিরি। সেই শ্বেতকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া যে রক্তচক্ষু সর্পরাজ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, সহসা সে বিষ্ণুরথবাহী গরুড়কে দেখিয়া ভয়ে মহাদেবের সিদ্ধির থলিয়ার ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিতেছে। মহাদেবের পার্শ্বে বৃষভবর অর্দ্ধনিমীলিত-চক্ষে স্বীয় প্রভুকে দর্শন করিতেছে। বৃষের মূর্ত্তি কতকটা শিবের ন্যায়ই শান্ত।

রন্ধনশালায় মূর্ত্তিমতী শ্রী। শত শত অন্নমেরু ; ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধির সরোবর। "ভুজ্যতাং দীয়তাং" শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞশালা স্রুক্, স্রুব, দণ্ডাদির সংঘট্ট-শব্দ এবং অগ্নিহোত্রী ও ঋত্বীকৃগণের মন্ত্রপাঠে মুখরিত। সমিধ্ ও কুশ শকটে শকটে আহৃত হইতেছে। অষ্টবসু বস্ত্র ও ধন দান করিয়া তিলমাত্র অবসর পাইতেছেন না।

দেব-যজ্ঞ এই ভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এমন সময়ে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষ প্রজাপতি সেই সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন।

দক্ষ দাম্ভিক-প্রকৃতি, উন্নত-তেজপুঞ্জ বপুঃ। ব্রহ্মার আদরে তিনি জগৎকে নগণ্য মনে করেন। দেবগণের অতিমাত্র বশ্যতা ও নম্র ব্যবহারে তাঁহার দাম্ভিকতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দৌহিত্র সূর্য্য ও ইন্দ্র, এবং জামাতা ধর্ম্ম, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ; সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষ সমাগত দেববৃন্দকে সহাস্যবদনে শিরো সঞ্চালনপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ইঙ্গিতে দেবগণকে বসিতে অনুমতি প্রদান করিলে তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। তিনজন তাঁহাকে দেখিয়া উত্থান করেন নাই। ব্রহ্মা—দক্ষের পিতা, বিষ্ণু—পিতৃসখা, ইঁহারা দক্ষেব নমস্য। কিন্তু শিব দক্ষদুহিতা সতীকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি জামাতা, তিনি শ্বশুরকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান নাই, বা প্রণাম করেন নাই। জামাতার এই ব্যবহারে দক্ষের মুখমণ্ডল রোষ-দীপ্ত হইল, তাঁহার ললাট হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বালা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি বিরূপাক্ষের দিকে সঘৃণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "শিব, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তুমি দেবসমাজে স্থান পাইয়াছ। নতুবা তুমি যে প্রকৃতির

লোক, তোমায় দেবতাসমাজে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিতে হইতে। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, তাহা কেহ জানে না, তোমার গোত্র ও কুলের পরিচয় নাই। তোমার আচার ব্যবহার জঘন্য, তুমি শ্মশানে থাক, ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি তোমার ব্যবসায়, একটা ষাঁড়ের উপরে চাপিয়া তুমি সাপ লইয়া খেলাও। কোন্ পার্ব্বত্য সাপুড়ে দেশ হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহা জানি না। বসন-ভূষণ নাই—দিগম্বর, সময়ে সময়ে দুর্গন্ধ বাঘছাল পরিয়া থাক। এই ঘৃণিত আচরণ দেবসমাজে অতি নিন্দিত। আঁমার দিকে চাহিয়া তাঁহারা তোমায় কেহ কিছু বলেন না। দেখ, আমার জামাতা চন্দ্রকে দেখ—যেমন মধুর প্রকৃতি, তেমনি বিনয়ী—যেমন রূপবান্, তেমনি গুণশীল। তাঁহার রূপের গুণে দেব-সভা উজ্জ্বল, বিশ্ব উজ্জ্বল। অগ্নি ও ধর্ম্ম ইঁহারাও জামাতা, ইঁহারা ত্রিদিব উজ্জ্বল করিয়া আছেন। আর তাঁহাদের পার্শ্বে জাতিহীন, কুলহীন, বৃষবাহন, নগ্নকায়, ক্ষিপ্ত ভিক্ষুককে জামাতা বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা হয়। তোমার অহঙ্কারের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, তাহা একেবারে আমি চূর্ণ করিব।"

এই উক্তিতে বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লজ্জিত হইলেন। কিন্তু দক্ষ ব্রহ্মার অতি প্রিয়, এই জন্য সকলেই কেবল মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা অতিমাত্র পুত্রবাৎসল্যে প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন।

দক্ষ যখন শিবের নিন্দাবাদ করিতেছিলেন, তখন ভৃগুর মুখে উল্লাসের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। ভৃগুর গৃহেই যজ্ঞ—গৃহপতি দক্ষের কথায় সায় দিলেন। তৎসঙ্গে পূষা প্রভৃতি ঋষিগণও মহাদেবের নিন্দায় বেশ আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শিবনিন্দা

শুনিয়া অনুকূল ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। উৎসাহিত হইয়া দক্ষ মহাদেবের প্রতি যথেষ্ট কটূক্তিবর্ষণ করিলেন।

বৃষভের পার্শ্বে শূলহস্তে নন্দী দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সর্ব্বদেহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রোধে তাহার দুইটি চক্ষের তারা ছুটিয়া যাই-বার মত হইয়াছিল। সে বিক্ষুব্ধ বারিধির ন্যায় অস্ফুট-গর্জ্জন মাত্র করিতেছিল, মহাদেবের ইঙ্গিতে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে সাহস পায় নাই। বৃষটিও যেন শিবনিন্দায় ব্যথিত হইয়া দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ত্যাগ করিতেছিল।

শিব কোন কথাই বলেন নাই, তিনি একবার ঊর্দ্ধচক্ষু নত করিয়া দক্ষের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে দৃষ্টিতে ক্রোধ ছিল না, ক্ষমা ছিল। —ব্যথার চিহ্নমাত্র ছিল না, করুণার স্নিগ্ধতা ছিল। দাম্ভিক দক্ষ ভাবিলেন, শিবের এই ভাব—ঘৃণার ছদ্মবেশমাত্র। তিনি ক্রোধে আরও জ্বলিয়া উঠিলেন।

যজ্ঞ শেষ হইয়া গেল। যাঁহার ভস্ম ও চন্দনে সমজ্ঞান, এমন মহাদেবের নিকট আদর ও ঘৃণার তারতম্য কি?

জগতের হলাহল একমাত্র শিবই পান করিতে সমর্থ এবং হলাহল-সিন্ধু-মন্থন করিয়া যে অমৃতের উৎপত্তি হয়, একমাত্র শিবই তাহার ভোক্তা। দেবসভা হইতে যে ঘৃণা ও কটূক্তির বর্ষণ হইল, তাহা মর্ম্মর-প্রস্তরের উপর বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার চিত্তে কোন রেখা আঁকিয়া গেল না। তাঁহার বিশাল জটাজুটে গঙ্গার যে মৃদু-মধুর কলরব হইতেছিল, আনন্দময়ের তাহাতেই পরমানন্দ জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কর-ধৃত বিষাণ বাদনপূর্ব্বক আনন্দধ্বনিতে আকাশ কম্পিত করিয়া কৈলাস-পুরীতে প্রত্যাগত হইলেন। সমুদ্রমন্থনকালে দেবগণ অমৃতের ভাগ

পাইয়াছিলেন, শিব বিষ পান করিয়া আসিয়াছিলেন। এবারও তাহাই হইল, ভৃগু সমস্ত দেবগণকে অমৃত তুল্য আদরে আপ্যায়িত করিলেন। অপমানের তীব্র বিষ শিবের প্রতি বর্ষিত হল। কিন্তু শিব-মুখের অর্দ্ধেন্দু-উজ্জ্বল প্রসন্নতা দেখিয়া কে তাহা জানিতে পারিবে?

শুধু নন্দীর মনে সেই তীব্রজ্বালা জ্বলিতে লাগিল। সপ্তাহ পর্য্যন্ত নন্দী আহার করে নাই। রাত্রিতে নিদ্রা যায় নাই, সিদ্ধি ঘুটিতে ঘুটিতে অতিমাত্র ক্রোধে নন্দী কষ্টি পাথরের আধারগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। "সতী বলিতেন, "নন্দী, তুই সমস্ত অসুরের বল পাত্রগুলির উপর প্রয়োগ করিলে তাহা উহারা সহিতে পারিবে কেন?"

২

এদিকে শিবের প্রতি দক্ষ-প্রজাপতির ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ভাবিলেন, এত ভৎর্সনা করিলাম, তাহার উত্তরে একটা কথা বলিল না, বেটার এরূপ অভিমান? দেবতারা বলে—ইহার নমস্য কেহ নাই। ইহাতেই মনে হয়, শিব অতি হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; অমরগণের সুবৃহৎ পরিবার—ইহাতে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের প্রতি মর্য্যাদা-যুক্ত না হইলে সামাজিক শৃঙ্খলা থাকিবে কিসে? শিব ভুঁইফোড়, শ্বশুর পিতৃতুল্য, তাঁহাকে প্রণাম করিবে না। বৃহস্পতির সঙ্গে অনেক শাস্ত্র ঘাঁটিয়া দেখা গেল, এরূপ বিধি কোথাও নাই।

দক্ষের দল ক্রমেই পুষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা একবাক্যে বলিল, "শিবের আচার দেবসমাজের বিধিবহির্ভূত; আমরা তাহাকে দেব বলিয়া স্বীকার করিব না।"

তাহারা দক্ষের ক্রোধ ক্রমেই উদ্দীপিত করিয়া দিল। একে ত শিবের মৌন-উপেক্ষা-কল্পনায় দক্ষ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর বিকৃতানন নন্দীর রোষকষায়িত সঘৃণ দৃষ্টির কথা মনে পড়িয়া দক্ষ ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। তিনি অবশেষে প্রকাশ্য-ভাবে দেব-সমাজে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন যে, শিবের সঙ্গে আর দেবসমাজ এক পংক্তিতে ভোজন করিবেন না। যজ্ঞের ভাগে শিবের কোন অধিকার থাকিবে না।

সুদীর্ঘ কুটিল শ্মশ্রুগুলি অঙ্গুলি দ্বারা মার্জ্জনা করিতে করিতে ভৃগু বলিলেন, "এবাব ভাঙ্গড জব্দ হইবে, এই ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট হইল।" অষ্টদিক্‌পাল দক্ষ-প্রজাপতির এই আদেশ জগতে প্রচাব কবিলেন, মহাদেব যজ্ঞভাগ পাইবেন না।

সমস্ত জগৎ এই আদেশে ভীত-স্তব্ধ হইয়া গেল। শিবহীন যজ্ঞ কে করিবে? হৈহয়, যযাতি, মান্ধাতা প্রভৃতি রাজরাজেশ্বরগণ সর্ব্বদা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, শিবহীন যজ্ঞ করিতে তাঁহারা সাহসী হইলেন না। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার মুখের দিকে চাহিয়া এই আদেশের প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। অথচ শিবহীন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহার কোনই উৎসাহ রহিল না। দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নর-জগতে কোন উৎসাহ দিতে পারিলেন না, অথচ দক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও ভরসা পাইলেন না।

যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে অনাবৃষ্টি হইল; পৃথিবীর বর্ণ প্রতপ্ত তাম্রখণ্ডবৎ ধূসর-রক্ত হইয়া উঠিল। শস্য দগ্ধ হইয়া গেল। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মনুষ্য—লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ঋষিগণ হোমকার্য্যে বিরত থাকিয়া তপোভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। যোগিগণ অন্তশ্চর বায়ু নিরোধ

করিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন, যজ্ঞাগ্নির ধূমে মরুৎ-পরিষ্কৃত না হওয়াতেও জীবের পক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া যেন কতকটা আয়াস-সাধ্য হইয়া উঠিল।

রুদ্রের অপমানে পৃথিবীতে রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল। ধরিত্রী জ্বালা বোধ করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজগণ ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বালখিল্য ঋষিরা বৃক্ষের আশ্রয়চ্যুত হইতে উদ্যত হইলেন। দিক্‌পালগণ কম্পিতকলেবর হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের নেত্রস্পন্দনে মুহুর্মুহু বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।

শিব-হীন যজ্ঞে কে সাহস করিবে? পৃথিবী ক্রোধ ও বিদ্বেষের আগার হইয়া উঠিল। কারণ ধর্ম্ম শিবহীন। যাহার উদারান্ন সংস্থানের উপায় নাই, সে বিলাসী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, কারণ তাহার লক্ষ্য শিবহীন। পরিধেয় ও ভূষণের বাহুল্য হইল—অথচ গৃহে শিশুগণ না খাইয়া মৃতপ্রায়, গৃহ-কর্ত্তার সেদিকে দৃষ্টি নাই কারণ তাহার দৃষ্টি শিবহীন। গৃহকর্ত্রীরা বিলাসিনী হইয়া উঠিল, কারণ শিবহীন গৃহে অন্নপূর্ণার সাধনা কে করিবে? স্বেচ্ছায় কিংবা পরার্থে কেহ কণ্টকের আঁচড় স্বশরীরে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে, অথচ আলস্য-জড়িত নিশ্চেষ্ট দেহ পরকৃত সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। প্রতারক ধর্ম্ম-যাজকগণ তামসিক ভাবকে সত্য গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। বিলাস ও মূঢ়তা চরিত্রকে অধিকার করিয়া বসিল—কারণ ত্যাগী এবং সত্যস্বরূপ শিবের আদর্শ জগৎ হইতে অপসৃত হইল।

ব্রহ্মার সৃষ্টি লুপ্ত হইতে চলিল। প্রশ্ন এই—"দক্ষ চাও না শিব চাও?" জগৎ এই দুয়ের অধিকার সহ্য করিতে অসম্মত। একদিকে দম্ভ, বল, স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রবল দণ্ড-শক্তি—অপর দিকে ত্যাগ,

নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ, কোন্‌টা চাই? দক্ষের কঠোর অনুশাসন পৃথিবীর অসহ্য হইল। ভীত, ত্রস্ত এবং মূক জগতের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। তথাপি মনের কথাটি উচ্চারণ করিবার সাহস তাহার হইল না—সে কথাটি, "আমরা দক্ষকে চাই না, আমরা শিবকে শিরে ধারণ করিব।"

৩

বিষ্ণু জগতের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা ত সৃষ্টি করিয়াই দায় হইতে মুক্ত, এই জগৎকে রক্ষা করা কিরূপ শক্ত তাহা ত তিনি জানেন না। পুত্রটি অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হইতেছে, ইহার দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। আমার সে সকল কথা এখন আত্মীয়তা-স্থলে না বলাই ভাল, কিন্তু পৃথিবীর রক্ষার একটা উপায় ত করিতে হইবে। তুমি বৈবস্বত মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতকে যজ্ঞ করিতে বলিয়া আইস। সে অতি প্রবল রাজা, সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, প্রদক্ষিণ-কালে তাহার রথচক্রের ঘর্ষণে পৃথিবী ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছিল, সেই সপ্তরেখা সপ্ত-সিন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত জগতের রাজকুল-চক্রবর্ত্তী। বিশেষতঃ, সে দক্ষের শ্যালক। সম্ভবতঃ, সে সাহসী হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিতে পারে।"

নারদের বীণাধ্বনি শুনিয়া প্রিয়ব্রত দিগ্বিজয়ে যাত্রা স্থগিত করিয়া দেবর্ষির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বর্গপ্রদেশ অপূর্ব্ব বীণাঝঙ্কারে নাদিত করিয়া দিব্যপ্রভা-মণ্ডিত ঋষিপ্রবর প্রিয়ব্রতের প্রাসাদে অবতীর্ণ হইলেন। নারদ তাঁহাকে গোপনে বিষ্ণুর অভিপ্রায় জানাইলেন। কিছুকাল নীরব থাকিয়া—প্রিয়ব্রত বলিলেন, "যাঁহার

দেহ কোন ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত নহে, যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, এমন দেবাদিদেব শিবের নমস্ত আবার কে থাকিবে? দক্ষ প্রজাপতি পাগল হইয়াছেন—শিবহীন বিশ্ব দগ্ধ হইতে উদ্যত, আমি পৃথিবীকে সরস রাখিবার জন্য যে সপ্তসিন্ধু প্রস্তুত করিয়াছি, রুদ্রের অপমানে বারিরাশি ধূমের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুকাল পরে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইবে। শিবহীন বিশ্ব বাস-যোগ্য নহে। আমি শিবহীন যজ্ঞ কখনই করিতে সমর্থ নহি। বিষ্ণু ঘরের কলহ মিটাইয়া আমাকে যে আদেশ করিবেন, তজ্জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেব-সমাজের এই বিদ্বেষ-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিবার জন্য আমিই সর্ব্বপ্রথম পতঙ্গ হইতে স্বীকৃত নহি।"

বীণা বাজাইতে বাজাইতে নারদ বিষ্ণুকে যাইয়া প্রিয়ব্রতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বিষ্ণু এই সংবাদে একটু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন।

'দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং প্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন না কেন? দক্ষ প্রজাপতি, বৃহস্পতি, ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডলী তাঁহার সহায়, তিনি দক্ষের দৌহিত্র; ভীত হইবার পাত্র নহেন। নারদ, তুমি দেবরাজকে আমার আদেশ জানাইয়া আইস। দেবরাজ স্বয়ং যজ্ঞ করিলে নরলোকে-যজ্ঞানুষ্ঠানে আর কোন বাধা থাকিবে না।'

ইন্দ্র নারদকে বলিলেন, "আমি শিবহীন যজ্ঞ সর্ব্বপ্রথম করিতে সাহসী নহি। শিবের পিণাক অমরাবতীর সর্ব্বপ্রথম ভিত্তিস্বরূপ। ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া এই সিংহাসনে শিবই আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিষ্ণু আমাকে কেন এই বিপজ্জনক ব্রতে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিতেছেন? দেবগণ বহুদিন যজ্ঞভাগ পান নাই—তাঁহারা

ক্ষীণপুণ্য হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু আমি কি করিব? আমি এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।"

নারদ এই উত্তর লইয়া আর বিষ্ণুর নিকট গেলেন না, তিনি স্বয়ং আর একটা উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

দক্ষের গৃহে উপনীত হইয়া নারদ দক্ষকে প্রণামপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেবশিল্পিনির্ম্মিত বহুমূল্য রোমজ পরিচ্ছদে দক্ষের সুদীর্ঘ দেহ মণ্ডিত, তাঁহার কান্তিতে প্রখর দেব-প্রভা, তাহা হইতে সৌরকর-জ্বালা বিচ্ছুরিত। ললাটের শিরা স্ফীত, নেত্রে দর্প, ওষ্ঠ ও হনুতে বাগ্মিতার চিহ্ন। অহঙ্কারে স্ফীত মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা জগতের প্রতি উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান। নারদকে দেখিয়া দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন, "নারদ, তুমি কি শোন নাই, পিতা আমায় সমস্ত প্রজাপতিগণের উপরে আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। তোমার ঘটকালীতে সতী-মেয়েটাকে একেবারে ভরাডুবী করিয়াছি, ভাঙ্গর বেটা বিশেষ অপদস্থ হইয়াছে। দেবসমাজে আর তাহার স্থান নাই, যজ্ঞভাগ কেহ আর তাহাকে দেয় না—সে একেবারে দেবসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।"

নারদ বলিলেন, "শিব আর কি অপদস্থ হইয়াছেন! শিবহীন যজ্ঞ আর কেহই করিতে সাহস পাইতেছে না। আপনার নিষেধ-বিধিতে এই লাভ হইয়াছে, দেবতাদের মধ্যেও আর কেহ যজ্ঞভাগ পাইতেছেন না। তাঁহারা ক্ষীণ-পুণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ধরিত্রী যজ্ঞহীন হইতে প্রপীড়িত হইতেছেন। পুষ্কর, শম্বর ও আবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘমণ্ডল অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। মহার্ণব জলহীণ হইয়া যাইতেছেন। বরুণের রাজ-কোষ শূন্য। হোমাগ্নির অভাবে মরুৎ-মণ্ডল দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। শিবের কিছুই ক্ষোভ হয় নাই। নন্দী সিদ্ধি ঘুটিতেছে,

আপনার ভাঙ্গড় জামাতার চিরাভ্যস্ত মহানন্দের কোনই ত্রুটি নাই। বিষাণে ওঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে এবং কর্ণাবলম্বী ধুস্তুর-পুষ্পের ঘ্রাণে তিনি মাতোয়ারা হইয়া আছেন।"

দক্ষের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, তিনি গর্ব্বিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি? আমি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর দক্ষ সহায় থাকিতে শিবহীন যজ্ঞ করিতে কেহ সাহসী হইতেছেন না? এ বড় আশ্চর্য্য কথা। যাহা হউক, আমি এই বিষয়ের উদ্যোগী হইয়া দেবসমাজকে শিক্ষা দিব। নারদ, তুমি প্রচার করিয়া দাও, আমার গৃহে বাজপেয় ও বার্হস্পত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। ত্রিজগৎ নিমন্ত্রিত হইবে। শুধু কৈলাসপুরী বাদ দিয়া তুমি সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ প্রচার কর।"

৪

দক্ষ-যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ত্রয়োদশ ধর্ম্ম দক্ষের জামাতা। কেহ মহিষ-চালিত শকটে, কেহ রত্ন-রথে দক্ষ ভবনে যাত্রা করিলেন। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি সাতাইশ ভগিনী দক্ষকন্যা, তাঁহারা চন্দ্রালায় হইতে আগত হইলেন। অগ্নির স্ত্রী স্বাহা দক্ষের অপর এক কন্যা, বিচিত্র যানারোহণ-পূর্ব্বক তিনি পিত্রালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ ও দিক্‌পালগণের সঙ্গে দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া যজ্ঞসম্পাদনে ব্রতী হইলেন, স্বয়ং ভৃগু এই যজ্ঞে হোতাস্বরূপ বরিত হইলেন।

নারদ কৈলাসপুরীতে যাইয়া শিবকে বলিলেন, "ভগবন্! আপনাকে ছাড়া ত্রিজগতের সকলকেই নিমন্ত্রণ করার ভার আমার উপর পতিত

হইয়াছিল, এই শিবহীন নিমন্ত্রণ ব্যাপারের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।”

দেবাদিদেবের বিম্বোষ্ঠে মৃদু হাস্য প্রকাশিত হইল। ললাটের অর্দ্ধেন্দুর রশ্মিতে সেই হাস্য মনোহর হইল। তিনি বলিলেন, “যজ্ঞহীন হইয়া ধরিত্রী পীড়িত হইতেছেন। যজ্ঞ হইলেই মঙ্গল, আমাদের নিমন্ত্রণ নাই বা হইল ; আমি কৈলাস পর্ব্বতে থাকিতেই ভালবাসি—নন্দিকেশ্বর এবং আমি, কতকটা নির্জ্জনতা-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। নিমন্ত্রণে যাওয়া আসা আমাদের পক্ষে ক্লেশকর ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু তুমি সতীকে দক্ষ-গৃহের যজ্ঞের সংবাদ দিও না। তাঁহার পিতা আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে তাহা জানাই নাই। তিনি এই সকল ব্যাপার শুনিলে মনে কষ্ট পাইবেন।”

নারদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে লাগিলেন। উচ্চ দেবদারু-দ্রুমের নিম্নের কোথাও বেদী প্রস্তুত, সেখানে শিব যোগাসনে আসীন হন। কোথাও সতীর বাহন সিংহ মহাদেবের বৃষের অঙ্গলেহন করিয়া সখ্য জানাইতেছে। অপূর্ব্ব ধুস্তূর-পুষ্পরাজি চারিদিকে ফুটিয়া তীব্রমধুর গন্ধে দিক্ প্রফুল্ল করিতেছে। কোথায়ও হরীতকীর বন ও নিম্ববৃক্ষের শ্রেণী। যেখানে হর ও সতী একত্রে কথোপকথন করেন, সেই মনোহর স্থানটি যেন চিত্রে লিখিত। সেখানে রজতখণ্ড-পতনের শব্দের ন্যায় ঝঙ্কার করিয়া রজতের ন্যায় শুভ্রধার বিশিষ্ট অলকনন্দা বহিয়া যাইতেছে। নন্দীর প্রক্ষালিত শিলার বিভূতিস্পর্শে তাহার শুভ্রতা স্থানে স্থানে ম্লান হইয়া গিয়াছে।

দেবর্ষি দেখিলেন, কর্ণিকার পুষ্পতরুমূলে সতী দাঁড়াইয়া আছেন। তাপসীর বেশ, অঙ্গযষ্টিকে অপূর্ব্ব কোমলতা প্রদান করিয়া একখানি বল্কল

শোভা পাইতেছে। তাহা দেহে বিলম্বিত, এবং সীমান্তপ্রদেশ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। হস্তে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষবলয়, আলুলায়িত কেশরাশিতে একটি অতসীকুসুমের মাল্য গ্রথিত। তিনি একটি কর্ণিকার তরু সন্নিহিত বিল্ববৃক্ষ হইতে একটি বৃহৎ বিল্বফল পাড়িতেছেন। বিল্বের কণ্টকরাশি দেবীর স্পর্শে পল্লবে পরিণত হইয়া যাইতেছে, এবং দেবী ছুঁইতে না ছুঁইতেই শাখা আনম্র হইয়া পড়িতেছে। তৎসম্বদ্ধ ফলগুলি দেবীর স্পর্শ-প্রত্যাশায় আপনি আপনি করতলে আসিতেছে। নারদকে দেখিয়া দেবী বলিলেন, "নারদ ভূপর্য্যটনই তোমার কর্ম্ম। আমার পিতা দক্ষের গৃহের কোন সংবাদ জান? আমার মাতাকে অনেক দিন দেখি নাই, আমার দুঃখিনী মাতাকে দেখিতে বড় সাধ যাইতেছে।" সতীর চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

নারদ এ প্রকার প্রশ্নের প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি কি উত্তর দিবেন! দেবর্ষি মিথ্যা কথা বলিবেন না; শিবের আদেশ অমান্য করাও তাহার পক্ষে শোভন নহে। তিনি দ্বিধা-কুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "দেবি, দক্ষ এবং প্রসূতি ভাল আছেন, আমি কল্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছি।" দেবী বলিলেন, "নারদ তুমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিলে, তাঁহারা কি আমার কথা কিছুই বলিলেন না?" নারদ নিরুত্তর রহিলেন।

দেবীর সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "তুমি এরূপ করিতেছ কেন? তবে কি তাঁহারা কুশলে নাই?" নারদ বলিলেন। "তাঁহারা ভাল আছেন, কিন্তু মা, আমায় ক্ষমা করিবেন, পিতৃকুলের কোন প্রশ্ন আমায় করিবেন না।"

এই বলিয়া নারদ বীণা বাজাইয়া প্রস্থানপর হইলেন। তত্ত্বপূর্ণ

বিচিত্র সংগীতালাপনে বীণা-তন্ত্রীর স্বরলহরী সেই পুণ্য নিকেতনকে মুখরিত করিল। পিণাকী সেই সঙ্গীতে যোগাম্বুধিতে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত কৈলাসপুরী সেই বীণাবাদনে একখানি ভাবের চিত্রের ন্যায় স্থির নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কেবল জবাতরুর শ্যাম শাখাপ্রশাখা হইতে অজস্র জবাপুষ্প নিম্নে পতিত হইয়া সেই স্থানে ঈষৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকটিত করিল, আর দেবীর হৃদয়ে মাতার জন্য আকুলতা প্রবল উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী উৎকণ্ঠা কিম্বা বায়ুকম্পিত লতার ন্যায় বিচলিত করিয়া সেই সেই সৌম্য নিকেতনকে কথঞ্চিৎ অশান্ত করিয়া তুলিল।

৫

দেবী যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে শুভ্র স্থির রজত-গিরিসঙ্কাশ দেবমূর্ত্তি। যেন কৈলাসোর্দ্ধে লগ্ন একখানি শুভ্র মেঘ। যেন মরুৎহিল্লোলবিক্ষুব্ধ হিমগিরি শিরোদেশে মরুতাদিভূতের অনায়ত্ত স্তব্ধ রজত গিরিসঙ্কাশ দেববিগ্রহ। করজোড়ে সতী দাঁড়াইয়া আছেন। গিরি পার্শ্বে সূর্য্যাস্তের প্রভাচন্দনে অনুরঞ্জিত হইয়া সন্ধ্যা দেবী যেমন দাঁড়াইয়া থাকেন, অথবা সমুন্নত শুভ্র মেঘপংক্তির পার্শ্বে সূর্য্যোদয়ের সিন্দূর ললাটে পরিয়া উষা যেরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যোগিবরের নিকট সতী তেমনি দাঁড়াইয়া আছেন। করশোভন রুদ্রাক্ষ-বলদ্বয় যুক্তকরের পার্শ্বে যুক্ত হইয়া আছে। নিবিড় কেশরাজির চাপল্য নাই। তাহারা স্থিরকৃষ্ণ ধূম্রপটল কিম্বা কৃষ্ণ ভ্রমরপংক্তির ন্যায় চন্দ্রবদনের পার্শ্বে স্থির হইয়া আছে। যেন স্থির চিত্রের লেখা। যুক্তকরে তপস্বিনী তপস্বিবরের নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন?

মহাদেব দেবীর আগমনপ্রভাব বুঝিলেন। ব্রহ্মানন্দ টুটিয়া গেল। কোন ব্যাকুল প্রার্থনার আবেশে তাঁহার দৃষ্টি নিম্নদিকে আবদ্ধ হইল। মনোময়ী বাক্য উচ্চারণ না করিয়া মৌনভাবে তাঁহার প্রার্থনা শিবকে বুঝাইয়া দিলেন।

শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, পদ্মনালের ন্যায় কোমলকান্তি সতী যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সতীকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবীর কি অভিলাষ তাঁহাকে পূর্ণ করিতে হইবে?" দেবী বলিলেন, "ভর্তৃদেব, নারদ আমাকে বলিয়া গেলেন, আমার পিতৃগৃহসম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি নিষিদ্ধ। আমার আর কোন কথা শুনিবার প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি বীণা বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেলেন। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, আমি নারদের কথার ভাব বুঝিতে পারি নাই।"

শিব বলিলেন, "আমি তাঁহাকে মানা করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি এতটা জানিয়াছ যে, এখন আর গোপন করা চলে না। তোমার পিতা দক্ষ বাজপেয় ও বার্হস্পত্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন। শুনিলাম, আমাদিগকে বাদ দিয়া বিশ্বশুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আমি নারদকে এই সংবাদ দিতে বারণ করিয়াছিলাম।" দক্ষ যে শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, শিব তাহা সতীকে বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন।

সতী করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তপস্বিনীর ত্রিনয়নে অশ্রু দেখা দিল। শিব বলিলেন, "তুমি কি পিতৃগৃহে যাইতে অভিলাষী হইয়াছ? বিনা আহ্বানে তথায় যাওয়া কি উচিত?"

সতী উত্তর করিতে পারিলেন না, তথাপি যেন মনোভাব ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক। ব্রীড়াবনত পুষ্পলতার ন্যায় তিনি মহাদেবের পাদপদ্ম

লক্ষ্য করিয়া নোয়াইয়া পড়িলেন। যেন সেই চরণকমলে তাঁহার কোন বিনীত নিবেদন আছে।

শিব বলিলেন, "তুমি পিতৃগৃহে যাইতে চাহিতেছ, কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে আমি কি করিয়া বলিব 'তুমি যাও'।"

সতী বলিতে চাহিলেন, "নিমন্ত্রণ আবার কি? তাঁহার বিরহিণী জননী যে তাঁহার পথের দিকে দুইটি চক্ষু ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সে নিমন্ত্রণ তিনি প্রাণের প্রাণে অনুভব করিতেছেন। তিনি দক্ষের আদরিণী কন্যা, পিতা কি মুহূর্ত্তেও কৈলাসপুরীর দিকে তাকাইয়া সতীর কথা চিন্তা করিবেন না? সতীকে হস্তে ধারণ করিয়া যে তিনি সর্ব্ব শুভকার্য্যে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন, আজ কি সতীকে তিনি ভুলিয়া যাইবেন? কন্যাকে আবার নিমন্ত্রণ কে করিয়া থাকে? নিজের মাতৃ পিতৃ অঙ্কে যাইবেন, কোন কন্যা তজ্জন্য নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে? দক্ষপুরীর আম্রবনে সতীর স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষগুলি এই উৎসবের সময় সতীকে হারাইয়া শাখাগ্র হেলনপূর্ব্বক তাঁহাকে খুঁজিতেছে। বাল্যসখীগণ ও ভগিনীগণ সতীর জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে, সকলের আকর্ষণ তিনি মনে মনে অনুভব করিতেছেন। পিতৃগৃহে যাইতে তিনি আর কোন্ নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষা করিবেন?"

সতী করযোড়ে মহাদেবের পাদপদ্মে নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি একটি কথাও বলেন নাই! যিনি কোন কথাই বলেন না, তাঁহার মনোভাব যেরূপ সুস্পষ্ট বোঝা যায়, অন্য কাহারও সেরূপ নহে!

শিব কি করিবেন! তিনি দেবীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সাহসী হইলেন না। এই সূত্রে কি অনর্থ ঘটিবে তিনি তাহা আশঙ্কা করিয়া বিচলিত

হইলেন। চন্দ্রচূড়ের চন্দ্রবদনে শঙ্কার ছায়া পড়িল। নন্দিকেশ্বর সকলই জানিতেন। তিনি বলিলেন, "মা তোমার এবার পিত্রালয়ে যাইয়া কাজ নাই।"

বিমনা হইয়া সতী চলিয়া গেলেন—নিপুণভাবে গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া দেবী কৈলাসপুরীর রম্য বনান্ত-ভূমিতে যাইয়া সন্ধ্যাকালে দাঁড়াইলেন। দেবী দেখিলেন—আকাশাম্বররঞ্জিত করিয়া সারি সারি রথ চলিতেছে। কোনটি মাণিক্য-খচিত, কোনটি মরাল-বাহন,—বুঝিলেন, ইহারা তাঁহার পিতৃগৃহের যাত্রী।

সহসা সমুজ্জ্বল একখানি রথ সম্মুখে ভাসিয়া গেল। তাহা প্রদীপ্ত মণিময়। তন্মধ্যে রক্তপটাম্বরধারিণী মরকতহার-লম্বিত-কণ্ঠ-দেশা যাহাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন। তৎপার্শ্বে কলহংসসদৃশ পাণ্ডুর চন্দ্রের বিমানে রোহিণী ও ভগিণীবর্গকে তিনি আভাসে দেখিতে পাইলেন।

এবার দেবীর হৃদয় যেন শোকে বিদীর্ণ হইল। জননীর মুখখানি দেখিবার জন্য দেবীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই উৎকণ্ঠায় মহাদেব স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার আনন্দময়ী তপস্বিনী নিরানন্দ, তদীয় বিম্বাধরের হাসি বিশুষ্ক, মলিন-নেত্র অশ্রুপূর্ণ।

শিব বলিলেন, "দেবি, তুমি নিশ্চয়ই যাইবে?" সতী বলিলেন, "প্রভুর ইচ্ছা হইলে আমি যাইতে এখনই প্রস্তুত হইব।"

শিব পুনরায় বলিলেন, "দেবি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তুমি নিরানন্দ হইলে কৈলাসপুরীর তপস্যা বৃথা হইয়া যায়। ঐ দেখ জবা-কুসুম শাখা-মলিন হইয়া গিয়াছে। বিল্বদল শুষ্কপ্রায়। পক্ষিগণ কাকলী বন্ধ করিয়াছে। তোমার ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার শক্তি

আমার নাই। নন্দী সিংহকে সাজাইয়া আন। দেবী পিতৃগৃহে যাইবেন। তুমি ইঁহার সঙ্গে থাকিও, তুমি থাকিতে ইঁহার অনিষ্ট ঘটিবে না, আমি এই ভরসায় পাঠাইতেছি।"

দেবী এই কথা বুঝিতে পারিলেন না। নন্দী মহাদেবের আদেশে সিংহকে সাজাইয়া লইয়া আসিল। কিন্তু তাহার মুখ ভ্রূকুটী-কুটিল, যেন ঘোর অনিচ্ছায় কোন মৃত্যুতুল্য কঠিন আজ্ঞা সে বহন করিতেছে। দেবী নন্দীর এই ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন না। তাঁহারও হৃদয় যেন কোন অনিশ্চিত আশঙ্কায় কম্পিত হইতে লাগিল।

৬

এত ঘটা, এত উৎসব—কিন্তু প্রস্থতি বিমনা। স্বাহা, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি সকল কন্যা আসিয়াছে, কিন্তু প্রিয়তমা সতী কোথায়! আজ তাঁহার গৃহে চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু সতীবিহনে তিনি বেদনাভরা। যাহার মুখের দিকে চাহেন, তাহাকে দেখিয়াই সতীকে মনে পড়ে, আর অঞ্চলাগ্রে নয়নজল মুছিয়া ফেলেন।

সতী অলক্তক-রঞ্জিত পদে নূপুর শিঞ্জিত করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেন। আজ সতী আসিবে না, কন্যা-বৎসলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

এক একটি করিয়া দেবরথ ঘণ্টারবে আকাশ নিনাদিত করিয়া অবতীর্ণ হয়, আর প্রস্থতি মরালীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া ভাবেন, এই বুঝি সতী আসিল। কিন্তু সতী আসিবে না, এই সত্য মনে অনুভব করিয়া দরদরপ্রবাহে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।

প্রতিবাসিনীরা আসিয়াছে। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের বিখ্যাত সুন্দরীগণ আসিয়াছে। কুটম্বিনীগণ আসিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, সতী আসিবে না। শুনিয়া শেল-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় প্রসূতি উঠিয়া যাইতেছেন। প্রসূতির নিকট আত্মীয়া কর্দ্দমঋষি-কন্যা অনসূয়া আসিয়াছেন। একদল দেবকন্যা তাঁহাকে ঘিরিয়া তৎপুত্র দত্তাত্রেয়ের রূপমাধুরী ও ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া প্রশংসা করিতেছেন। বালকের চন্দ্রমুখ দেখিয়া প্রসূতির সতীর কথা মনে হইল, অমনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। মরীচি ঋষির স্ত্রী কলা বাপীতীরে বসিয়া আম্রবাটিকা-শ্রেণী দেখিতেছিলেন। একটি মঞ্জরীপূর্ণ আম্রতরু দেখাইয়া কলা শুধাইলেন, "রাণি, এই গাছগুলি কত বৎসরের?"

প্রসূতি বলিলেন, "এগুলি আমার মেয়ে সতী বিবাহের বৎসর রোপণ করিয়া গিয়াছে"—এই বলিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া আসিল। সতীর জন্য তিনি পাগলিনীর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ বসিয়া হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছেন। অগ্নিদেব স্বয়ং জামাতৃবেশে দক্ষের দক্ষিণ দিকে বেড়াইতেছেন। ধর্ম্মরাজ শ্বশুরের প্রতি অতিরিক্ত সম্ভ্রম দেখাইয়া নগ্ন পদে ছুটাছুটি করিতেছেন। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা শেষ সময়ে আসিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন। দক্ষের তেজোদীপ্ত ললাটের শিখা অভিমানে স্ফীত। কিন্তু দেবগণ সকলেই একটা অভাব বুঝিতেছেন। অগ্নি স্বয়ং চেষ্টা করিয়াও হোমাগ্নিকে উজ্জ্বলতা দিতে পারিতেছেন না। শ্মশানবিহারী ভিখারী শিবের অভাবে যেন উৎসবের আনন্দ কতকটা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। বৃহস্পতির বাগ্মিতা লয় পাইয়াছে। তিনি মৌনভাবে দক্ষের বামদিকে অজিনাসনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

স্বয়ং ভৃগু হোতা, মন্ত্র উচ্চারণ-কালে তাঁহার বক্ষঃ কম্পিত হইতেছে কেন ?

দক্ষের অভিমানদৃপ্ত চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে কোমল হইয়া পড়িতেছিল। যজ্ঞশালার পার্শ্বে একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠ সতীর খেলাঘর ছিল। কয়েকটি সুবৃহৎ স্তম্ভের অবকাশ-পথে সেই গৃহ দৃষ্টিগোচর হওয়াতে দক্ষের মানস-পটে সতীর মুখখানি অঙ্কিত হইতেছিল। কিন্তু অভিমান মমতাকে স্থান ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। ক্ষণমাত্র অন্যমনস্ক থাকিয়া দক্ষ পুনরায় উৎসবে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিলেন।

৭

সতী দক্ষালয়ে আসিতেছেন। আসিবার সময় উৎসাহে মহাদেবকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কৈলাসের অভ্রংলেহী চূড়া যখন নেত্রপথ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন সতীর ধ্যানস্থ-শিবমূর্ত্তি কেবলই মনে পড়িতে লাগিল এবং কেন যে তাঁহার এমন ভ্রান্তি হইল, তজ্জন্য অত্যন্ত অনুতাপ হইতে লাগিল।

সিংহ উল্কার মত আকাশ হইতে অবতরণ করিতেছে। পিণাক-পাণির বিরাট শূলহস্তে ভ্রূকুটি-কুটিল ক্রূরকটাক্ষ নন্দী পশ্চাতে আসিতেছেন। দেবীর কপালে সিন্দূরবিন্দু, কেশরাজি নিবিড় আগুল্ফলম্বিত, তাহা সিংহের পৃষ্ঠ বাহিয়া পড়িয়াছে। যেন নিবিড় মেঘপংক্তি ভেদ করিয়া উল্কা ছুটিতেছে। রুদ্রাক্ষের মাল্য ত্রিগুণিত হইয়া দেবীর বক্ষে বিলম্বিত। কর্ণে কুণ্ডল। দেবী বল্কলবসনা, অক্ষবলয়া, ললাটের ঊর্দ্ধে কেশকলাপে বিল্বদল ও জবাকুসুম আবদ্ধ। শ্বেতচন্দনে ললাট দীপ্ত।

কপোলে অলকাতিলকার পরিবর্ত্তে বিভূতি! একি অপরূপ বেশ! নন্দিকেশ্বর কুবেরকে আহ্বান করিয়া দেবীর রাজরাজেশ্বরী-যোগ্য মণিখচিত পরিচ্ছদ আনয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। দেবী তাহা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি যোগীর স্ত্রী যোগিনী; তপস্বিনীর বেশেই তিনি পরিতৃপ্ত, অন্য-বেশ তাঁহার প্রীতিকর নহে।

এই বেশে দেবী আসিতেছেন। হীরামণি-খচিত পট্টাম্বরধারিণী যে সতীকে প্রসূতি সাজাইয়া হরকে প্রদান করিয়াছিলেন, এ ত সে সতী নহে। এ সতী বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল সৌরকরদীপ্ত কুসুমকোরক নহে। এ যেন সন্ধ্যামালতী—স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর, কিন্তু চক্ষুর পরমতৃপ্তি-সাধক। সিংহ ধীরে ধীরে দক্ষালয়ের নিকটে আসিল, অমনই কলরব পড়িয়া গেল, সতী আসিয়াছে। সেই কলরব অন্তঃপুরের প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞবেদীর পার্শ্বস্থিত দক্ষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তাহাতে কঠিন হৃদয়ে অমৃত-নিষিক্ত হইল! কিন্তু দক্ষ ঘৃণার দ্বারা প্রীতিকে পরাস্ত করিয়া বিমুখ হইয়া বসিলেন।

কিন্তু যখন সেই কলরব প্রসূতির কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি জাগ্রতা কি স্বপ্নাবিষ্টা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এ কি মৃগতৃষ্ণিকা, না—উন্মাদ চিত্তক্ষোভ! রাণী অন্তঃপুর-দ্বারে আসিলেন, "আমার সতী বক্ষে আয়" বলিয়া সিংহবাহিনীকে হস্তদ্বয় অগ্রসর করিয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে মাতা-কন্যা আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া রহিলেন। উভয়ের গণ্ড প্লাবিত করিয়া নয়নাশ্রু পতিত হইতেছিল। কন্যা অভিমানিনী, মাতা লজ্জিতা। এই উৎসবেও মেয়ে বলিয়া মনে হইল না, মা, তোমার পাগল জামাতাকে ছাড়িয়া আসিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে, বিনা নিমন্ত্রণে তাঁহাকে আনিতে পারি নাই।

দেখিতে দেখিতে কৃত্তিকা ও রোহিণী উপনীতা হইলেন। স্বাহাও তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তিনী; কৃত্তিকা স্বর্ণ-খচিত "নীলাম্বরী" পরিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তের শঙ্খবলয়ে চন্দ্রকান্তমণি নিবদ্ধ ছিল। চন্দ্রের প্রিয়-মহিষীর কণ্ঠে নীলমণির কণ্ঠী, তাঁহার কাঁচলীতে বিশ্বকর্ম্মা সপ্তবিংশ ভার্য্যা সহ চন্দ্রদেবের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিলেন। রোহিণীর বাম অঙ্গে দক্ষিণ বাহু স্থাপন করিয়া কৃত্তিকা। তাঁহার রক্তপট্টবাসের প্রান্তভাগে শুভ্র মণিময় চিত্র অঙ্কিত; মস্তকে চন্দ্রকিরণের মুকুট। পদে মণির মঞ্জীর, কিন্তু স্বাহার বস্ত্রখানি হুতাশনের জ্যোতির ন্যায়। তিনি খর্ব্বাকৃতি বিপুলনিতম্বা। তাঁহার কেশরাজি একটি জ্যোতিষ্মান্ পদ্মরাগ-মণির গ্রন্থিতে আবদ্ধ। রোহিণী আসিয়া সতীর মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। "ভগিনী এক সিন্দুরই তোমার আয়ৎ-চিহ্ন, হস্তে রুদ্রাক্ষবলয়!" কৃত্তিকা বলিল, "ছি! বল্কল পরাইয়া এই উৎসবে পাঠাইতে শিবের লজ্জা হইল না?" স্বাহা বলিল, "ভগিণী, তোমার এমন রূপ, আহা এত বড় চুলের গোছা তৈল ও মার্জ্জনার অভাবে জটা-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জঙ্গলে মুক্তা ফেলার মত শিবের ঘরে তোমায় ফেলা হইয়াছে। আহা একখানি পদ্মরাগমণিও কি তোমার হারে গাঁথিয়া দিতে পারিল না? ইহার মধ্যে রবির দুই স্ত্রী—ছায়া ও সংজ্ঞা তথায় উপনীত হইলেন। একজন গঙ্গাজলী রেশমীশাড়ী পরিয়াছিলেন। কষ্টি পাথরে বাঁধা-ঘাটের ন্যায় সেই শাড়ীর উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাড় ঝলমল করিতেছিল। তাঁহার উত্তরীয়াঞ্চলে স্বর্ণবিন্দু দীপ্তি পাইতেছিল। সংজ্ঞার মূর্ত্তি দীর্ঘ ও গৌরব-দীপ্ত। একখানি অয়স্কান্ত মণির চূর্ণে রচিত নীলাভ্র বর্ণের বস্ত্র পরিয়া তিনি রূপের হিল্লোল তুলিয়াছিলেন। শচীর বাগান হইতে সংগৃহীত একটি মন্দারকুসুমের মালা তিনি কণ্ঠে পরিয়াছিলেন। ছায়া আসিয়া বলিল,

"এই নাকি সতী! শিব আমার নিকট বলিয়া পাঠাইলে ত আমি একখানি রক্তমাণিক্যের অঙ্গদ ও দুইখানি হীরার বলয় পাঠাইতে পারিতাম!—এরূপ উৎসবেও কি এমন বেশে স্ত্রীকে পাঠাইতে হয়?" ছায়া ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল, "দুইটা জবাফুল ও বিল্বদল চুলে আটকাইয়া আসিয়াছে। দেবরাজের কাছে বলিয়া পাঠাইলেও ত একগাছি পারিজাতের হার পাঠাইয়া দিতেন—আমাদের কর্ত্তার সঙ্গে ইন্দ্রের বড ভাব, আমরা জানিলেও অনুরোধ করিতে পারিতাম।"

সতী এই সকল মন্তব্য শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একমুহূর্ত্তও তথায় তিষ্ঠিতে ইচ্ছা রহিল না, গণ্ড আরক্তিম হইল। তিনি যাহাদিগকে শৈশবসঙ্গিনী, প্রিয়-ভগিনী বলিয়া জানিতেন, যাহারা একটি বনফুল পাইলে তৃপ্ত হইত, একটুকু মুখের হাসিতে উল্লসিত হইত, এ ত তাহারা নহে। সেই সরল স্বচ্ছন্দ প্রাণ যজ্ঞের কবলিত হইয়াছে। সতীর হৃদয় সেই স্থান হইতে বহির্গত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে অত্রির স্ত্রী অনসূয়া সেই স্থানে আসিযা সতীকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেম। তিনি উৎসাহের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি দেখিতেছি, সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী এই মেয়ে নাকি সতী! মরি, বিনা ভূষণে, বল্কল-বসনে, জবাকুসুম ও রুদ্রাক্ষে শ্রীমূর্ত্তির কি শোভা হইয়াছে! যোগিনীর মত কুণ্ডল মা তোমাকে বড সাজিয়াছে, মা তোমার পদের অলক্তকরাগ ধরিত্রী শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে, বিভূতিতে কপোল বড সাজিয়াছে। মা, কুবের তোমার ভাণ্ডারী, তথাপি তুমি সামান্য জবাফুল পরিয়া আসিয়াছ—তুমি এই ধনরত্নগর্ব্বিতা সুন্দরীগণের পার্শ্ব হইতে আমার নিকট এস।" আনন্দে প্রসূতির মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি সতীর প্রতি মন্তব্য শুনিয়া অধীরা হইয়া পড়িতেছিলেন। সতীকে অনসূয়ার সঙ্গিনী

করিয়া দিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন। রোহিণী বলিল, "দেখ্‌লি, অনসূয়া মাসীর কথা, উহারা ঐ এক রকমের। স্বয়ং ভগবান দত্তাত্রেয় নাম ধারণ করিয়া উহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই গর্ব্বে উহার পা মাটিতে পড়িতে পায় না। উনি কর্দ্দমঋষির কন্যা, ভাঙ্গা কুঁড়েতে জন্ম, আধপেটা খাইয়া থাকেন, বাকল ভিন্ন একখানি খুঞাকাপড় কিনিবার কড়ি নাই, যা হোক, সতীর সঙ্গে মিশ্‌বে ভাল। বাবা কি সাধে ভাঙ্গড়ের যজ্ঞভাগ মানা করিয়া দিয়াছেন!" মুক্তবেণী দোলাইয়া আর্দ্রা রোহিণীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি ও কথা বোল না, শিবের যজ্ঞভাগ মানা, এ কথা যেন সতীর কানে না উঠে; মা যে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা কি মনে নাই?" রোহিণী বলিল, "সতী এখানে নাই, তাহার কানে এ কথা উঠাবে কে?"

অম্রমুকুলের গন্ধে বাপীতীর ভরপুর। দক্ষভবনের পরে এক বিশাল শ্যামপট বিস্তারিত রহিয়াছে। দ্বিপ্রহরে সৌরকিরণে সুদূর পল্লীনিচয়ের তরুরাজি সমুজ্জ্বল। মনে হইল যেন হরিৎ শস্যে বসুন্ধরার শাড়ীর জমি প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই উজ্জ্বল, সুদূরে অবস্থিত বৃক্ষ পংক্তি সেই শাড়ীর পাড়। সতী সেই স্থানে অনসূয়ার সঙ্গে দাঁড়াইয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করিলেন। দক্ষালয় হইতে যে কৈলাসপুরীর গগনালম্বী চূড়া তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, সেই মুক্তস্থানে দাঁড়াইয়া তাহা দৃষ্টি গোচর হইল। অনসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয়কে দেখিয়া সতী হস্ত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিলেন। শিশু অষ্টমবর্ষীয়। সে একটি পূজার ফুলের ন্যায় পবিত্র। সতী বলিলেন, "এই শিশুর মুখে ভগবানের রূপ আঁকা রহিয়াছে, দেবমানুষ-সমাজে এমন অপূর্ব্ব শিশু আমি দেখি নাই।" অত্রিপত্নী বলিলেন, "তুমি কি জান না যে, ভগবান্ আমার উদরে অবস্থান

করিতে সম্মত হইয়া এই শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন? দত্তের পিতা একশত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি এই একশত বৎসর শুধু বায়ু সেবন করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রার্থনায় ভগবান আমাদিগকে কৃপা করিয়াছেন।" এই বলিয়া অনসূয়া একখানি প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলেন। দত্তাত্রেয় তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া জানুর সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। সেই দ্বি-প্রহরের সৌর-কিরণ মন্দীভূত তেজে শিশুর কুঞ্চিত জটাকলাপ স্পর্শ করিতে লাগিল। সতী তাহার রূপ দেখিয়া বিমল আনন্দলাভ করিলেন। অনসূয়া বলিলেন, "এই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করিতেছিলেন— শিবালয়ে তুমি বড় কষ্টে থাক।" সতী উত্তর করিলেন, "আপনার কি মনে হয়? কৈলাসপুরীর সুখের কথা কি বলিব! সেখানে জগতের সমস্ত সাধ যোগিবরকে দর্শনমাত্র পূর্ণ হইয়া যায়। কত দিন নিম্ব বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আমি তাঁহার ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখিয়াছি। আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছি। স্ত্রীজাতির ঈপ্সিত বসন, ভূষণ, আড়ম্বর আমার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছে। তাঁহার শ্রীমুখের বাণীই আমার কর্ণের ভূষণ, তাঁহার পদসেবাই আমার হস্তের অলঙ্কার, তাঁহার মূর্ত্তি-চিন্তাই আমার হৃদয়ের হার হইয়াছে। বলিব কি, তাঁহাকে দেখামাত্র চিতাভস্ম পরম পবিত্র মনে করিয়াছি, সেই বিভূতিতে যে তত্ত্ব অঙ্কিত দেখিয়াছি, জগতের কোথাও তাহা নাই। এইজন্য বিভূতি লেপিয়া যোগিনী সাজিয়াছি। তাঁহার জন্য সিদ্ধি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হাতে কড়া পড়িয়াছে বলিয়া ছায়াদিদি আক্ষেপ করিলেন। এ নন্দীর কাজ হইলেও সবই আমার কাজ। তাঁহার সেবায় যে কষ্ট, তাহা যেন আমার জন্মে জন্মে পাইতে হয়, এই কড়াই আমার আয়ৎ-চিহ্ন।"

দেবী এই বলিয়া নীরব হইলেন। অনসূয়া দেবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। একদিকে দত্তাত্রেয়, অপরদিকে সতী, দুইই তাঁহার মনে অপত্যস্নেহের উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তুলিল। ভাই-ভগিনীর মত দুইটিকে দেখা যাইতে লাগিল। শিবকে যাত্রাকালে প্রণাম করিয়া আসেন নাই, এত বড় ভুল তাঁহার কেন হইল এই চিন্তা সতীর মনে একটা কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের রঙ্গিন ফুল ফুটিয়াছিল ; শুভ্র বক-ফুলের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসূন, কোমল-পত্রের মধ্যে পুষ্পতরুর বদ্ধাঞ্জলীর মধ্যে শিরোপহারের মত দেখাইতে লাগিল ; অজস্র মালতী ফুল শিবের পায়ের অজস্র অর্ঘ্যের ন্যায় পবিত্র বোধ হইল ; পশ্চিমাকাশের ডুবন্ত সূর্য্যের আলো-রঞ্জিত মেঘখণ্ড শিবপূজার একটা বৃহৎ তাম্রকুণ্ডের মত দেখাইতে লাগিল। পলক-হীন চক্ষে সতী এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে চহিয়া কহিলেন, "আজ সমস্ত জগত তাহার শোভাসৌন্দর্য্য লইয়া, দেবাদিদেব তোমারই পূজা করিতেছে ! আমিই এই পূজারীদল হইতে বাদ পড়িয়াছি। বিচিত্র ফুলের উপকরণ লইয়া পূজারিণী প্রকৃতি তোমার উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্রেম নিবেদন করিয়া দিতেছে। আজ আমি তোমার পদে একটি জবা-ফুলের অর্ঘ দিতে পারিলাম না, তোমার কর্ণে দুইটি ধুস্তুর পুষ্প পরাইতে পারিলাম না— বিল্বদল পাদ-পদ্মে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে পারিলাম না ; আজ আমার দিন বৃথা, শুধু তাহাই নহে, আজ আমার জীবন নিন্দিত, আমি তোমার নিন্দা কানে শুনিয়াছি ; হে দেব ! কবে আমি তোমার শত শত বীণার ন্যায় মধুর ও মহান কণ্ঠস্বর শুনিয়া কান জুড়াইব !"

এই কল্পনার মধ্যে আত্মহারা সতী ডুবিয়া পড়িলেন। তখন অনসূয়ার কণ্ঠ-স্বরে তাঁহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইল ; অনসূয়া

বলিতেছিলেন, "এই সকল সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-বিলাসে নিমজ্জিত মেয়েরা শিবের গৌরব কি করিয়া বুঝিবে? সমুদ্র মন্থনের সময় কত বহুমূল্য রত্ন উত্থিত হইয়াছিল—সমস্ত দেবতারা তাহা লুটিয়া লইলেন। কৌস্তুভ-মণি লক্ষ্মী বিষ্ণুর ভাগে পড়িল, পারিজাত-তরু, উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত ইন্দ্র গ্রহণ করিলেন; অপরাপর দেবতারা অমৃতের ভাগ পাইয়া অমর হইলেন। শিব একবারে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন, কিন্তু যখন দ্বিতীয়বারের মন্থনে ক্লিষ্টকর্ম্মা দেবাসুরের অত্যধিক শ্রম জনিত নিঃশ্বাসে বিষ-প্রবাহ উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল, তখন হতাশ উপায়হীন ও আর্ত্ত দেবমণ্ডলী সৃষ্টি রক্ষার জন্য শিবের শরণ লইলেন। জগতের এই আসন্ন ধ্বংসকালে শিব সেই বিষতরঙ্গ গণ্ডুষ করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিলেন, মুহূর্ত্ত কাল তাঁহার ত্রিনেত্র স্পন্দিত হইল, মুহূর্ত্ত কাল তাঁহার কর্ণস্থিত অতি শুভ্র ধুস্তূর পুষ্পদ্বয় কথঞ্চিৎ ম্লান হইল, তার পর আবার যে ধ্যানের মূর্ত্তি, তাহাই,—শুভ্র রজত-গিরিনিভ প্রসন্নবদন শিব। কিন্তু এই মহাসহিষ্ণুতা ও ত্যাগের চিহ্ন-স্বরূপ নীলকণ্ঠের কণ্ঠ নীলিমারঞ্জিত হইয়া রহিল। দেবাদিদেব একদিন আমার স্বামী অত্রিকে বলিয়াছিলেন—'যাহা অন্যের উপেক্ষিত, তাহাই আমার প্রার্থিত; সুরঞ্জিত বহুমূল্য পট্টবস্ত্র দেবতারা পরিধান করেন, কিন্তু বাঘের ছাল কেহ ঘৃণায় গ্রহণ করেন না; আমি তাহাই কুড়াইয়া লইয়াছি। অপরাপরের জন্য অগুরু চন্দন ও কস্তুরী; কিন্তু এই চিতাভস্ম—যাহা জগতের শেষ পরিণতি—তাহা কে লইবে? আমি এই চিতাভস্ম আদর করিয়া অঙ্গে মাখাইয়া লইয়াছি। কৌস্তুভ এবং অপরাপর মণি-মুক্তা লইয়া দেবতারা কাড়াকাড়ি করেন, কিন্তু এই জটাজূটই আমার মাথার শোভা, ইহার মধ্যে গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গের মধুর রব আমার

মনে ব্রহ্মানন্দ জাগাইয়া দেয়। দেবতারা জগতের শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও হস্তী আরোহণ করুন; এই বৃদ্ধ বৃষভ সকলের পরিত্যক্ত, ইহাই আমার যান-বাহন। এই আড়ম্বর, এই ঐশ্বর্য্য—এ সকলে আমার মন ভুলে না, আমি আত্মার পরম সম্পদ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ চাই, আর কিছুর প্রার্থী আমি নই।' বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু ধ্যান-মগ্ন হইল এবং তিনি সমাধি-সিন্ধুতে ডুবিয়া পড়িলেন; তখন তাঁহার মস্তক বেড়িয়া এক অপূর্ব্ব আলোচ্ছটা আসিতে লাগিল, এবং তিনি যে কোন নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহার আভাস দিতে লাগিল! এই আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি অপরের বোধগম্য নহে। সুতরাং যদি শিবকে কেহ ভুল বুঝে, তবে দুঃখিত হইবে না। একদা বিষ্ণু বলিয়াছিলেন, 'আমি সকল দেবতার পূজ্য, কিন্তু আমি শিবের পূজক। দেবতারা অমর কিন্তু তাঁহারাও মানুষের মত ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠার উপাসক। শিব নিস্পৃহ, নির্ধন, পাশমুক্ত, বন্ধনহীন। আমি কুবেরকে তাঁহার ভাণ্ডারী করিয়া দিয়াছিলাম, স্বর্ণময় কৈলাসপুরী তাঁহার নিবাস স্থির করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শ্মশান-বাসী, যুগে যুগে একদিনও কুবেরের খোঁজ লন নাই।'

এই সময়ে প্রসূতি আসিয়া বলিলেন, "সতি! একবার কিছু খাইয়া যাও।" অনসূয়া সতীর হাত ধরিয়া ভোজনস্থানে উপস্থিত হইলেন। দক্ষের অপরাপর কন্যাগণ ভোজনে বসিয়াছেন, সতীকে সকলে আদর করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বসাইলেন। কৃত্তিকা যত্নের সহিত সতীর কেশপাশ গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, "ভগিনি, তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ? তা' আর শিবপুরীর প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। সকলেরই কিছু আঢ্য ঘরে বিবাহ হয় না; যাহার যা, তাহাই ভাল। মা তোমাকে

আমাদের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া স্বামিগৃহে পাঠাইবেন, তা' যেরূপ ঘর, সে সব রাখিতে পারিলে হয়! তিনি প্রতি বৎসরের উপযোগী ভূষণ ও বস্ত্র তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে তোমার আর কোন দুঃখের কারণ থাকিবে না।"

দেবী কোন উত্তর করিলেন না। এমন সময় চিত্রা সংজ্ঞাকে বলিলেন, "দিদি, শচীর সঙ্গে নাকি তোমার বড় ভাব? শচীর হারে যে পদ্মরাগ-মণিখানি, তাহা দেবরাজ কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহা কি শুনিয়াছ? উহা ঠিক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, বিশ্বকর্ম্মা জহুরী তাহার পলগুলি কাটিয়া দিয়াছেন, এমন মণি অমরাবতীতে নাই।" সংজ্ঞা বলিলেন, "ঐ মণি সুন্দ-উপসুন্দরের ঘরে ছিল, ইন্দ্র তাঁহাদের কোষাগারে প্রাপ্ত হন। উহা একবার মন্দাকিনীতে পড়িয়া গিয়াছিল, শুনিয়াছি নাকি মন্দাকিনীর যে স্থানে উহা নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে অপূর্ব্ব প্রভা বিকীর্ণ করিয়া জলের উপর ঠিক একটি উজ্জ্বল আলোর ফুলের মত দেখাইতেছিল, সুতরাং তাহা উদ্ধার করিতে কোনই অসুবিধা হয় নাই।" চিত্রা বলিল, "সংজ্ঞা-দিদি! তোমার শাড়ীখানা ভাই বড় চমৎকার, অয়স্কান্তমণির গুঁড়ার দ্বারা ইহা রাঙ্গান হইয়াছে, তোমায় উহা বেশ মানাইয়াছে।" ইহার মধ্যে রোহিণী বলিলেন, "ভাই, এখানে কি বেশী দিন থাকা চলে? মা আমায় একটি মাস থাকিতে বলিয়াছিলেন; উনকোটি তারা আমাদের বাড়ীতে আলো দেয়, এখানে যেন সব আঁধার আঁধার ঠেকছে, আর এখানে চলাফেরার বড় কষ্ট, সেখানকার বিস্তৃত ছায়াপথে বিমানে চড়িয়া যাই, আর এ পাড়াগাঁয়ের পথে কাঁকর কেবলই পায়ে বাজে।" রোহিণীর কথা শেষ না হইতে আর্দ্রা বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের সোমরস এখানে পাওয়ার

বড় কষ্ট, দূত পাঠাইয়া আনিতে হয়; এখানে থাকা কি আমাদের সাজে? আর আমাদের কর্ত্তাটির যদিও আমরা সাতাশ ভার্য্যা, তথাপি সব ক'টির সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই, তিনি বলেন, 'ঠাট বজায় না রাখিলে মান-সম্ভ্রম থাকে না'।" ইহার মধ্যে স্বাহার এক পুত্র সতীর গা ঘেঁষিয়া বলিল, "সতি মাসি! শিব মেসো কি ক'রে বাঘছাল প'রে থাকেন? মা বলছিলেন, তোমার ভাল ভাল শাড়ী ও অলঙ্কার বেচে নাকি তিনি ভাঙ্গ খেয়েছেন!" সংজ্ঞা বলিল, "দুষ্ট ছেলে, মাসীমাকে কি এ কথা বলিতে হয়?" পুনর্ব্বসু বলিল, "তা বেচারি করবে কি, স্ত্রীলোকের কপালে যা', তা ঘুচাবে কে? সতি! তুমি মনে দুঃখ ভেব না।"

মুক্ত ব্যোমবিহারী পক্ষীকে সহসা পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে তাহার যেরূপ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম ঘটে, এই পার্থিব বৈভবের আলোচনা—তাঁহার প্রতি কটাক্ষ ও অযাচিত সহানুভূতি—এ সমস্তই সতীকে সেইরূপ তীব্রভাবে পীড়ন করিতে লাগিল। সতীর মনে হইল, দক্ষপুরী আর তাঁহার যোগ্য নাই, তাঁহার একমাত্র স্থান কৈলাস। দেবাদিদেবের আনন্দময় বদন তাঁহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল; সেই বদনের ধ্যান-প্রশান্তভাবে বিশ্বের হিত সঙ্কল্পিত, সেইভাবে তিনি মাতৃস্নেহ, ভগিনীর স্নিগ্ধতা, স্বামীর আদর, সমস্তই অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। কৈলাসপুরীর প্রতি তরুপল্লবে তিনি জন্মভূমি, নিবাসভূমি ও স্বর্গের গৌরব একাধারে অনুভব করিতে লাগিলেন! তিনি কি দেখিতে আসিয়াছিলেন, আর কি দেখিতে লাগিলেন! যতই তাঁহারা বেশভূষার সমালোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বল্কল প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ কৈলাসের জন্য অস্থির

হইয়া উঠিল। আজ শিবের চরণপদ্মে তিনি জবা ও বিল্বদল প্রদান করেন নাই, তাঁহার দিনটা বৃথা ও শূন্য বলিয়া বোধ হইল। আকাশ-পানে তাকাইয়া দেখেন, মুক্ত অম্বর যেন দিগম্বরের দিক্‌বাসের ন্যায় প্রসারিত, উৎসবের নানা বাদ্যরব অতিক্রম করিয়া তিনি পিনাকপাণির ডমরু-নিনাদ শুনিতে পাইলেন। তাঁহাদের কৃপা তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি অতি সামান্যরূপ আহার করিয়া প্রসূতির নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম, একবার পিতাকে ডাকাইয়া আন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৈলাসপুরীতে চলিয়া যাই। আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।"

প্রসূতি বলিলেন, "সে কি! যজ্ঞ দেখিতে আসিলে, যজ্ঞ শেষ না হইতেই চলিয়া যাইবে? একি পাগলের কথা!"

সতী বলেলেন, "কেন বলিতে পারি না—যজ্ঞের ধূম আমাকে ব্যথিত করিতেছে, যজ্ঞের মন্ত্রের শব্দ অসিদ্ধ ও অপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। বেদী-পার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণগণের কোলাহল অপবিত্র বোধ হইতেছে; আমি বলিতে পারি না, কেন এই যজ্ঞ আমার প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে না। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ত এই যজ্ঞ অনুমোদন করিয়াছেন?"

প্রসূতি বুঝিলেন, শিবানীকে না বলিলেও, এ যজ্ঞ যে শিবহীন, তাহা সাধ্বী মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "সিংহটা চলিতে বড় দোলে, তাহার পৃষ্ঠে এতটা পথ আসিয়া তোমার মাথাটা ঘুরিতেছে, এজন্য কিছু ভাল লাগিতেছে না, তুমি খাইতে পার নাই, দুই এক দিন আরামে থাকিলে সুস্থ হইবে। যজ্ঞেশ্বর অনুমোদন না করিলে কি কোন যজ্ঞের আরম্ভ হইতে পারে?" দক্ষ কোমল-হৃদয়া সতীকে পাছে কোন প্রকার অপমানসূচক কথা বলেন, এজন্য

তিনি তনয়ার আগমনসংবাদ তখনও নিজে স্বামীকে বলিয়া পাঠান নাই।

এদিকে অন্তঃপুর-দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছিল। যজ্ঞের সমস্ত সম্ভারের যে দিকেই সে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহাতেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যজ্ঞের ধূমে তাহার শ্বাসরোধ হইতেছিল। বেদী-সন্নিহিত হোমাগ্নি তাহার নিকট চিতাগ্নির মত বোধ হইতেছিল; কেন তাহার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল, সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। যজ্ঞভাগ যে শিবকে নিবেদিত হইবে না, এ কথা সে জানিত না, কিন্তু সমস্ত দক্ষপুরীর বায়ুস্তর তাহার শরীরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদাহ উপস্থিত করিতেছিল; ভাবী কোন অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বিশাল বক্ষ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছিল।

৮

দক্ষ যজ্ঞশালায় বসিয়া আছেন, সতী বিনা নিমন্ত্রণেই আসিয়াছেন, এ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। একবার ভাবিতেছেন—সতী আমার বড় আদরের কন্যা; আমার শয়নপ্রকোষ্ঠে দিনরাত্রি আমার পরিচ্ছদাদি যত্নপূর্ব্বক রাখিত, কতদিন বাহু দিয়া আমার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া আমার প্রাণ স্নিগ্ধ করিত; আমাকে অপর কন্যারা ভয় করিয়াছে, তাহাদের আমার নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা থাকিত, সতীর মুখে তাহারা তাহা আমাকে জানাইত। সতীকে কখনও কোন বহুমূল্য অলঙ্কার, এমন কি সামান্য একটি বনফুল দিলেও, সে তাহার

ভগিনীদিগের সকলকে তদ্রূপ এক একটি না দিলে নিজে লইত না; আমার নিকট হইতে কত ছন্দে তাহা আদায় করিয়া তবে ছাড়িত। সতী চলিয়া যাইবার পরে আমি দিনরাত্রি স্বপ্নের ন্যায় তাহার ছায়া আমার শয়নপ্রকোষ্ঠে, আম্রবাটিকায়, যজ্ঞশালে, পূজামণ্ডপে, খেলাঘরে দেখিতে পাইতাম; সতীর সেই মধুর হাসি, রত্নাম্বুজড়িত কর্ণাবলম্বী কেশদাম, পদের অলক্তক-প্রভা ও নূপুর-শিঞ্জন আমার সর্ব্বদা মনে পড়িত। আহারের পর যে আমার ভুক্তাবশেষ খাইয়া তৃপ্ত হইত, নিদ্রায় যে শিয়রে বসিয়া আমায় ব্যজন করিত, কোথায়ও যাইতে হইলে পাদুকাদ্বয় ও উষ্ণীষ লইয়া আমার পার্শ্বে ভৃত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিত, যাওয়ার কালে দিদিদের জন্য এবং আমার জন্য এই জিনিষ

১৩

আনিবে বলিয়া কানে কানে কত কহিয়া দিত, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার জন্য, কাঙ্গালীর জন্য, কত সামগ্রী চাহিয়া লইত, প্রাতে সদ্যঃস্নাত হইয়া মূর্ত্তিমতী উষার ন্যায় দেবপূজার জন্য ফুল কুড়াইত, ঐ পথ দিয়া নিত্য নিত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত, সেই সতীকে ঐ পথ দিয়াই কৈলাসপুরীতে বিদায় করিয়া দিয়াছি। এই উৎসবে আজ ত্রিজগৎ নিমন্ত্রিত, যে আসিলে আমার গৃহ আনন্দময় হইবে, সেই আনন্দময়ীকে বাদ দিয়াছি—তথাপি আসিয়াছে। একবার বক্ষের ধনকে বক্ষে লইতে পারিলে যেন হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইত; আজ এই উৎসবের দিনে কেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।

কিন্তু সহসা শিবের সেই নিশ্চেষ্ট প্রশান্ত উপেক্ষা ও নন্দীর ভ্রূকুটি-কুটিলানন মনে পড়িল, চিন্তাস্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইল—"আমি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর, সর্ব্বভূতের কর্ত্তা ও অধিনায়ক, আমাকে

ধুস্তুরসেবী ভাঙ্গড় অপমান করিয়াছে—সতীকে সেই ভূতপ্রেতসেব্য বিরূপাক্ষের হস্তে দিয়াছি! আমি সতীকে আর দেখিতে চাহি না। সতী পিতৃগৃহে তাহার পিতার বৈভব দেখিয়া যাক্ এবং সে যে উপেক্ষিতা, তাহার স্বামী যে নগণ্য, এ কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া যাক।"

এই সময় পূষা ঋষি বলিলেন, "সেই শিবদূত নন্দীটার মতো কালো একটা বীভৎস আকৃতি দেখা যাইতেছে, অন্তঃপুরের দ্বারের পার্শ্বে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

দক্ষের ক্রোধাগ্নিতে এইবার আহুতি পড়িল। "কি ভাঙ্গড় বেটা সেই দুরাত্মা অনুচরকে সতীর সঙ্গে পাঠাইতে সাহসী হইয়াছে? আজ সতীকে আমি উচিত শিক্ষা দিব।"

ভগদেবের দিকে বক্র-দৃষ্টিপাত করিয়া দক্ষ বলিলেন, "সতীকন্যা এসেছে; এত বড় উৎসবটা, ভাঙ্গড় আর না পাঠাইয়া কি করে। যা হোক দুষ্টের শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমি সতীকে যজ্ঞস্থলে আনিয়া এইখানে সেই মর্কটাক্ষ যোগীর ইতিহাস কীর্ত্তন করিব, সভাস্থলে এই সকল কথা হইলে তাহার অপমানের চূড়ান্ত হইবে।"

ভৃগু ও পূষার উৎসাহে স্পর্দ্ধিত দক্ষ সতীকে অন্তঃপুর হইতে সেই যজ্ঞশালায় ডাকাইয়া আনিলেন। প্রসূতি বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় অন্তঃপুরে কম্পিত দেহে রহিলেন, আজ কি ঘটিবে ভাবিয়া তাঁহার মুখখানি বিশুষ্ক হইয়া গেল।

ধূসর তমিস্রাবৃত গোধূলির ন্যায় বল্কলবসনা, অক্ষবলয়া সতী সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া, নতচক্ষে দক্ষ এবং অপরাপর পূজনীয়বর্গকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পাদপদ্মের প্রভায় হোমাগ্নি জ্যোতিষ্মান্

হইল, তাঁহার নিশ্বাসে যজ্ঞকর্ম্ম নির্ম্মলতর হইল, তাঁহার জটাবদ্ধ রক্তবর্ণ জবা শিবের ক্রোধের ন্যায় যেন ধবক্ধবক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই অপূর্ব্ববেশী কন্যাকে দেখিয়া মদগর্ব্বিত দক্ষ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "সতি! তোর কপালে যা ছিল তাহা ঘটেছে, এখন তুই মনে কর যেন তুই বিধবা, সধবা হইয়াও ত বিধবার বেশেই আছিস, মনে করিতে বিশেষ কষ্ট-কল্পনা করিতে হইবে না। তুই কি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রিয়তম মানসপুত্র দক্ষের কন্যা, না সেই ধুস্তুরসিদ্ধিসেবী, কুম্ভাপ্রিয় ভাঙ্গড়ের স্ত্রী? তুই এই বেশে এখানে আসিতে লজ্জা বোধ করিলি না! ভৃগুর যজ্ঞসভায় সমস্ত দেবমণ্ডলীর সমক্ষে আমি তাহাকে প্রহার করিতে বাকী রাখিয়াছিলাম, সেই অপমানসত্ত্বেও তোকে আবার পাঠাইল কোন্ মুখে? ভূতপ্রেতের সঙ্গী, চিতাভস্মপ্রিয় জন্তুর হস্তে তোকে দিয়াছি, শুধু পিতৃইচ্ছায়। এখন তুই মরিলে আমার এ লজ্জা দূর হয়। তুই নাকি বড় পতিব্রতা! তবে কি জানিস্ না যে, দুরাত্মা বৃষারূঢ় শিবকে আমি দেব-সমাজ হইতে নিষ্কাষিত করিয়া দিয়াছি; যজ্ঞভাগে তাহার কোন অধিকার নাই; তথাপি তুই কেন এসেছিস্? এই কি তোর পতিভক্তি? সে সাপুড়ে, পার্ব্বত্যরাজ্যের অসভ্য, জাতি-কুলের বিচারহীন, বর্ণাশ্রম মানে না; তাহার লঘুগুরুভেদ নাই। আমি তোকে আমার আলয়ে স্থান দিতে পারি, যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৈলাসে আর কখনও যাইতে পারিবি না বলিয়া অঙ্গীকার করিস্।"

ভৃগু এই নিন্দাবাদে পরম প্রীতিলাভ করিয়া শ্মশ্রু দোলাইতে লাগিলেন, এবং মহাহর্ষে পূষা ঋষির সমস্ত দন্তপংক্তি কেতকীকুসুমের ন্যায় বিকশিত হইয়া পড়িল। অপর অপর ঋষিরাও দক্ষের কথা অনুমোদন-পূর্ব্বক ক্রমাগত শিবের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে

ধিক্কার দিতে লাগিলেন। দেবতাদের মধ্যেও অনেকে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিতে সাহসী না হইলেও দক্ষের প্রবল শক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে দক্ষের নিন্দাবাদ শুনিতে কৌতূহল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

দেবী আর শুনিতে পারিলেন না। শিবনিন্দা শুনিতে শুনিতে কর্ণের শক্তি চলিয়া গেল, সেই নিন্দা উচ্চারণকালে পিতৃমুখের ভ্রূকুটি দেখিতে দেখিতে তাঁহার দর্শনশক্তি তিরোহিত হইল। সেই শিবহীন যজ্ঞভূমিতে দাঁড়াইয়া পদদ্বয় নিশ্চল হইয়া গেল, হোমাগ্নির অশিব দ্যুতি-স্পর্শে প্রাণের স্পন্দন রুদ্ধ হইতে উদ্যত হইল। শিবনিন্দকের দেহ হইতে তিনি জাত হইয়াছেন, এই ঘৃণায় সেইস্থলে চিতার ন্যায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, সেই অগ্নি তাঁহার কটিবিলম্বিত বল্কলাগ্র লেহন করিয়া প্রজ্বলিত হইল। বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ করিয়া মহাদেবী যোগবলে দেহত্যাগে সংকল্পারূঢ় হইলেন। তাঁহার মহিমান্বিত মূর্ত্তি দ্বিগুণ প্রখর হইয়া উঠিল। পিতৃরক্ত যে ধমনীতে প্রবাহিত, সেই ধমনী যোগপ্রভাবে রুদ্ধ করিয়া মহাযোগিনীর বেশে তিনি নিশ্চল চিত্রপটের ন্যায় স্থির রহিলেন। নির্ব্বাণকালে দীপশিখার ন্যায় যোগিনীর অঙ্গরাগ অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সান্ধ্যগগনের শোভার ন্যায় একটি মৃদু প্রভা সেইস্থানে বিকীর্ণ হইয়া ধূমময় জ্যোতিঃশিখায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল—সেই জ্যোতিঃশিখা দক্ষপুরী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষণ পরে দেখা গেল, সতীর মৃতদেহ সেই স্থানেই পড়িয়া আছে। মহাদেব সেই চিহ্ন দেখিবেন এজন্য তাহা দগ্ধ হয় নাই।

নন্দিকেশ্বর সেই সভার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সে সতীর সঙ্গে সঙ্গে

অন্তঃপুরের দ্বার ছাড়িয়া আসিয়াছিল; যখন দেখিল সতী দেহত্যাগ করিলেন, তখন ভীষণ শূল লইয়া সে যজ্ঞশালাকে আক্রমণ করিল। কৃতান্তের ন্যায় তাহার মূর্ত্তি ভীষণ হইল, তাহার মস্তকের অসংস্কৃতজটা-কলাপ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় প্রধূমিত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, দেহ হইতে জ্বালা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। যজ্ঞ নষ্ট হয় দেখিয়া হোতা ভৃগু অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন, তাহাতে ঋভু নামক এক খড়্গহস্ত দেবতা হোমানল হইতে উদ্ভূত হইল, সে নন্দীর শূল কাড়িয়া লইল ও যজ্ঞশালা হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

৯

সতী বিদায় লইয়া যাওয়ার পরে শিব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। প্রসন্ন শিবমুখে বিষাদের রেখা পড়িল। যাইবার সময় আগ্রহাতিশয়ে সতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যান নাই—এরূপ ভ্রম তাঁহার কেন হইল? শিব মনে মনে তাঁহাকে আশিস্ করিতে লাগিলেন, আশীর্ব্বাণী আকাশের উর্দ্ধস্তরে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিল, শিব দেবীর অমঙ্গলাশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

সতী যে স্থানে স্নান করিতেন, সেখানে অলকানন্দা ও নন্দা নাম্নী নদীদ্বয় গঙ্গাধারার সঙ্গে মিশিয়াছে। তাহার পার্শ্বে সৌগন্ধিক নামক বন, সেই বনে নানাবর্ণের স্থলপদ্ম ও পুন্নাগবৃক্ষ। শিব সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার জটাবন্ধন খুলিল, কটিতে শার্দ্দূলচর্ম্ম এলাইয়া গেল, কর্ণের ধুস্তুর ফুল খসিয়া পড়িল। নন্দানদীতে গন্ধর্ব্ব-রমণীগণের স্নানকালে তাহাদের গাত্রভ্রষ্ট নবকুঙ্কুমে জল পীতবর্ণ

হয়, তিনি মনে করেন, সতীর পদ-শোভন অলক্তক প্রক্ষালিত করিয়া মন্দা রক্তবর্ণবিশিষ্টা হইয়াছে, অমনই জটা এলাইয়া নদীসলিলে তাহা সিক্ত করেন।

সতীর অঙ্গজ্যোতিঃ সৌরকিরণে অনুভব করিয়া তিনি অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন। সেই কিরণে জটা পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। মহাদেব ভাবেন, দেবীর অঙ্গপ্রভায় তাঁহার মস্তক জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে।

কখনও কখনও দক্ষের আলয় লক্ষ্য করিয়া ত্রিনেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়। ভোলানাথ সকল ভুলিয়াও সতীকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার বিহ্বলাবস্থা দর্শনে কৈলাসের শোভা মন্দীভূত হইল; মল্লিকা সুবাস হারাইয়া বসিল; বিল্বদল তরুশাখায় বিশুষ্ক হইল; চম্পক, পাটল ও দেবীর প্রিয় কর্ণিকার পুষ্প স্ব স্ব বিচিত্র বর্ণচ্যুত হইল। সুরধুনী কুলকুল স্বরে বিষাদের গান গাইয়া কৈলাসপুরীকে মুখরিত করিয়া ছুটিতে লাগিল। কখনও বিল্বমূলে কখনও দেবদারু—ক্রমনিম্নে শিব উন্মত্তের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। এক রাত্রি একদিন চক্ষের পলক পড়ে নাই—ভোলানাথের কেবলই ভুল হইতে লাগিল।

সহসা সঘন নিশ্বাসপাতে কৈলাসের শৃঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। কোন দারুণ মনোবেদনার স্বর কৈলাসের প্রস্তরে প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! এ কে আসিতেছে—যাহার অসংযত পাদবিক্ষেপে কৈলাসের পুষ্পোদ্যান বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে? কাহার হস্ত-সঞ্চালনে করকাঘাতের ন্যায় বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে? এই অসংযত, সম্ভ্রমহীন, নির্ভীক ব্যক্তি কে যে, রুদ্রের আবাসে এরূপ অসতর্ক, এরূপ উদ্ধতবেশে উপস্থিত হইতে সাহসী? বিল্বমূলাসীন শিব

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ত্রিনেত্র স্থির করিয়া অভ্যাগতের পন্থার দিকে বদ্ধলক্ষ্য হইলেন।

এ কে? এই অসংযত জটাকলাপ, শূল-বিচ্যুত নন্দী আসিতেছে। মা' মা' রবে কাঁদিয়া সে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। তাহারই উন্মত্ত, শোকার্ত্ত বিক্রুতগতিতে কৈলাসগিরির প্রকম্পন হইতেছে; ছিন্ন শালবৃক্ষ কিংবা ভগ্ন ইন্দ্রধ্বজ, অথবা ব্যোমচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় হাহাকার করিয়া নন্দিকেশ্বর শিবের পাদমূলে পতিত হইল।

শিবের কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। শান্ত সমুদ্রের ন্যায় শিব প্রলয়কালে বিশ্ব-বিনাশ করিয়া থাকেন। যখন দেবদারু-মূলে প্রফুল্ল কমলসদৃশ করদ্বয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া ইনি ধ্যানস্থ থাকেন, তখন কে বুঝিতে পারে, প্রলয় কালে এই শিবের প্রশান্ত জটাজুট ব্যোমের সমস্ত দিকে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে? তখন কে বুঝিতে পারে, ইঁহার করধৃত শূলাগ্রে দিগ্‌হস্তিগণ বিদ্ধ হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ইঁহার উচ্চ ও কঠোর হাস্যধ্বনিতে মেঘ সকল বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাঁহার রৌদ্র-তাণ্ডবে নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হয়?

আজ সেই প্রলয়কালীন বিষাণ সহসা বাজাইয়া মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার জটা জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, অট্টহাস্য করিয়া তিনি একগাছি জটা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

সেই জটা-পতনে ভয়ঙ্কর বীরভদ্র বীর সমুত্থিত হইল, তাহার মস্তকের কৃষ্ণ মেঘোপম মুকুট গগনাবলম্বী হইয়া রহিল এবং হস্তের শূল কৃতান্তনাশক তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকার্য্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১৩

সতীর মৃত্যুতে দক্ষের অন্তঃপুরীতে হাহাকার রব উত্থিত হইল। সতী যে এ ভাবে প্রাণত্যাগ করিবেন, দক্ষ এতটা মনে করেন নাই। সুতরাং সেই স্থানের সকলেই মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলেন। ভৃগু নিশ্চলভাবে যজ্ঞমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পূষা হোমানলে হব্য ঢালিতে লাগিলেন। দক্ষ মনকে প্রবোধ দিবার জন্য আত্মকর্ম্মের সমর্থন-যোগ্য যুক্তিগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল, বীরভদ্র সেইস্থানে এক বিশাল লৌহস্তম্ভের ন্যায় উপস্থিত হইয়া বেদীমূলে দাঁড়াইলেন। ভৃগু যে বক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রুরাজি দোলাইয়া দক্ষের নিন্দা অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাহা করদ্বারা মার্জ্জনা পূর্ব্বক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুনরায় যজ্ঞানলে আহুতি দিতে যাইবেন, এমন সময় বীরভদ্র তাঁহার শ্মশ্রুরাজি দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া সগ্রীব মুখমণ্ডলটি চক্রাকারে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং ধূমরেখার ন্যায় ভ্রূরোমরাজি ও গঙ্গাযমুনার মিশ্রিততরঙ্গ-নিন্দিত শ্মশ্রুরাজি উৎপাটিত করিয়া হোমানলে অর্পণ করিলেন। ভর্গদেব যে চক্ষুর্দ্বয়ের ইঙ্গিত করিয়া দক্ষকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত করিয়া সভয়ে বীরভদ্রের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, চক্ষু দু'টি বীরভদ্রের নখাগ্রে উৎপাটিত হইল। মহর্ষি পূষা যজ্ঞস্থলে বসিয়া স্রুক নামক যজ্ঞপাত্র হইতে অগ্নিতে হব্য নিক্ষেপ করিতেছিলেন। যে কোন বিষয় উপলক্ষেই তাঁহার দন্তপংক্তি বিকাশ পাইত—দক্ষের নিন্দায় পরম পরিতোষ পাইয়া সেই দ্বাত্রিংশ দন্তের সমস্তগুলিই যজ্ঞস্থলীর উপস্থিত ব্যক্তিগণের দর্শনীয় হইয়াছিল,

শিব-কিঙ্কর চণ্ডেশ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই দন্তগুলি উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। ঋষিগণ কমণ্ডলু ও অজিনাসন করে ধারণ করিয়া পলায়নপর হইলেন। রুদ্রপার্ষদ মণিমান্ সূর্য্যদেবতা ও যমকে বাঁধিয়া ফেলিলেন; সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ঊর্দ্ধমুখে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। প্রতিহারী ও সশস্ত্র সৈনিকবর্গ কে কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না; সেই যজ্ঞশালা ভূতপ্রেতের তাণ্ডব-নৃত্যে শ্মশানের ন্যায় হইয়া গেল।

দাম্ভিক দক্ষ স্বীয় দেব-শক্তি নেত্রকনীনিকায় পুঞ্জীভূত করিয়া দৃষ্টি-দ্বারা যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন, তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চণ্ডেশ দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু বীরভদ্রের দেহে যে কালানলপ্রভ দ্যুতি ছিল, তাহার স্পর্শে দক্ষের নেত্রাগ্নি মন্দীভূত হইয়া লয় পাইল। বীরভদ্র দক্ষের গ্রীবাধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পশুহননের হাড়িকাঠে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং ক্ষণপরে পশুহননের অস্ত্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।

যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল, তাঁহারা শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

৩১

মহাবাত্যার পর প্রশান্ত প্রকৃতির ন্যায় শিব বিল্বমূলে বসিয়াছিলেন। তিনি সতীর চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক ধ্যান-নিমগ্ন ছিলেন। সেই যোগানন্দ উদয়ের সঙ্গে তদীয় বিম্বাধরে পুনরায় প্রশান্ত উদাসীনের হাস্য-রেখা অঙ্কিত হইতেছিল।

ব্রহ্মার কমণ্ডলু ও বিষ্ণুর চক্র যুগপৎ তাঁহার পদস্পর্শ করাতে তদীয় ধ্যান ভঙ্গ হইল, তখন সতীর জন্য হৃদয়ে দারুণ জ্বালা অনুভব করিলেন। তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দেখিয়া বলিলেন, "দক্ষের জন্য আপনারা আসিয়াছেন, আমি নন্দীর আর্ত্তনাদে মুহূর্ত্তকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন কি হইয়াছে জানি না। যদি দক্ষ বিনষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা জগতের ইষ্টের জন্য। দক্ষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া জগতের সমস্ত বৈভব-বিতৃষ্ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যাঁহারা দৈহিক সুখের পক্ষপাতী নহেন, বিশ্ব-হিত যাঁহাদের মূলমন্ত্র, এমন সকল ঋষি যজ্ঞে উপস্থিত হন নাই। দক্ষ আমাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যে বাহ্যদারিদ্র্য না হইলে চিত্তের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সেই দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর স্ত্রীলোকের যে একনিষ্ঠ প্রেম-যোগ, সতীর মৃত্যুতে দক্ষের হস্তে তাহারই অবমাননা সূচিত হইতেছে। বিশ্বের মঙ্গল-দ্রোহী এরূপ দাম্ভিকের প্রভুত্ব ধরিত্রী সহ্য করিতে পারেন নাই।"

দেবগণ বলিলেন, "হে মঙ্গল-আলয়! জগতের ইষ্টের বিঘ্ন না হইলে রুদ্রের রৌদ্র ভাব বিকাশ পায় না, বিশ্বের প্রয়োজনেই স্বয়ম্ভুর

রুদ্রত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে। এখন ভগবন্! একবার স্বচক্ষে যজ্ঞশালা দেখিয়া আসুন, কাঞ্চনপ্রতিমা সতী যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে পড়িয়া আছেন, একবার সেই চিত্রখানি দেখুন।"

মহাদেব সতীর নাম শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কৈলাসের সমস্ত তরুর ফুল সেই নিশ্বাসে শুকাইয়া গেল।

সতীর অবস্থা দেখিবার জন্য ভোলানাথ বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সঙ্গে সেই যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যজ্ঞস্থলী রণস্থলীর ন্যায় বীভৎস-দর্শন হইয়াছে। দক্ষের মুণ্ড ও শরীর পৃথক্ হইয়াছে, ঋষিগণ দারুণ প্রহারে রক্তাক্তদেহে মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন—হোমানলে রক্ত পুড়িয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে, অন্তঃপুরে হাহাকার উঠিয়াছে। নন্দী চীৎকার করিয়া মা' মা' বলিয়া কাঁদিতেছে ও বীরভদ্র, চণ্ডেশ প্রভৃতি শিব-সহচরগণ যজ্ঞধ্বংস করিয়া রোষকষায়িত নেত্রে বসিয়া আছে। আর দেখিলেন, বেদী হইতে একটু দূরে সতীর দেহ ভূতলে পড়িয়া আছে। বিদায়কালে যে জবাটি তাঁহার কেশপাশে লগ্ন ছিল, তাহা ঠিক সেইরূপই আছে। বল্কলবাস ত্রস্ত হইয়া জানুর উপর আকুঞ্চিত হইয়া আছে। দেহের বিভূতির সঙ্গে যজ্ঞের ভস্ম মিশিয়া গিয়াছে, রুদ্রাক্ষের হার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, একটি রুদ্রাক্ষ কণ্ঠের নিকট গড়াইয়া পড়িয়াছে—আর সতী শিবের সৌগন্ধিক বনে কর্ণিকার ও স্থলপদ্মের সন্ধানে যাইবেন না! শিব ত্রিনেত্র বিস্তারিত করিয়া সাধ্বীর সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন।

তাঁহার কোন ক্রোধ হইল না, যজ্ঞাগারে নিহত ব্যক্তিগণ তাঁহার বরে বাঁচিয়া উঠিল। দাম্ভিক দক্ষের শিক্ষার জন্য তাঁহার ছাগমুণ্ড হইল! সেই স্থানে যজ্ঞেশ্বর হরি স্বয়ং সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান

করিলেন ; দক্ষ যজ্ঞের সমস্ত অবশিষ্ট ভাগ শিবকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্তুতি করিলে আশুতোষ প্রসন্ন হইলেন।

১২

সেই প্রিয়দেহ অনাবৃত যজ্ঞশালায় পড়িয়াছিল, তৎপার্শ্বে নন্দিকেশ্বর আত্মহারা হইয়া কাঁদিতেছিল ; দেবাদিদেব সেই দেহ অঙ্কে তুলিয়া লইলেন ! সেই মৃতদেহের ভুজলতা তাঁহার কণ্ঠে লগ্ন হইল। শিব জগত ভুলিয়া সেই আনন্দে সতীকে লইয়া পর্ব্বতকন্দরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সেই মৃতদেহ তাঁহার স্কন্ধে স্থাপিত হওয়াতে রৌদ্রে শুষ্ক হইল না, বাত্যাবৃষ্টিতে বিচলিত বা গলিত হইল না। একটি অম্লান কুসুমের মাল্যের ন্যায় তাহা স্কন্ধাবলম্বী হইয়া রহিল। সতীর বিধুমুখের উপর শিব-ললাটের অর্দ্ধেন্দুর জ্যোতিঃ পড়িতে লাগিল, সেই জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার কেশ-বন্ধনীতে লগ্ন জবাকুসুমটি দীপ্ত মরকতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। দেবীর বল্কলবাস শিবের ব্যাঘ্র-চর্ম্মকে আদরে স্পর্শ করিল ; শিবের বিভূতি সতীর কোমল অঙ্গে যেন সস্নেহে স্বামিস্পর্শ আঁকিয়া দিল। একি মহিমান্বিত ছবি ! চন্দ্রচূড় যেন হিমবানের ন্যায়—উন্নত দেহশ্রী, গঙ্গাধারা-নিক্কণে জটাকলাপ-নিনাদিত, তদূর্দ্ধে অর্দ্ধশশী, তাঁহার বরাঙ্গ অবলম্বন করিয়া অতসীকুসুমবর্ণা, বল্কল-বসনা দেবী নিদ্রিতার ন্যায়।

মহাদেব সেই স্পর্শসুখে উন্মত্ত হইলেন। তিনি কখনও মনে করেন, বধূবেশী সতী দক্ষগৃহ হইতে কৈলাসে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার কেশকলাপ সুগন্ধি তৈলনিষেকে উজ্জ্বলকান্তি, বেণীবদ্ধ স্বর্ণঝাঁপা পৃষ্ঠে দুলিতেছে, সিঁথীতে সিঁথীপাটী এবং বাহুতে কঙ্কণরাজিত, রক্তপট্টবাস মস্তকের উপর স্বর্ণবিন্দুসহ ঝলমল করিতেছে; চন্দনদীপ্তমূর্ত্তি সতী তাঁহার বামভাগে দাঁড়াইয়াছেন। কখনও ভাবেন, সতী কৈলাসে আসিয়া অঙ্গদ কঙ্কণ ত্যাগ করিতেছেন, যোগিনী সাজিবার জন্য রক্তপট্টবাস ত্যাগপূর্ব্বক বল্কল পরিতেছেন, সিঁথিপাটী ফেলিয়া দিয়া জবাফুল পরিতেছেন, স্বর্ণ-কুণ্ডল ফেলিয়া কর্ণিকার পুষ্পের কুণ্ডল গড়িয়া পরিতেছেন এবং সরসী-তীরে দাঁড়াইয়া আপনার যোগিনীর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বিধুমুখে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। কখনও ভাবেন, যেন দেবী নন্দীর হস্ত হইতে সিদ্ধি ঘোটনদণ্ড নিজে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি ঘুটিতেছেন, কখনও বা সৌগন্ধিক বনের ফুল আনিয়া তাঁহার পদে অর্পণপূর্ব্বক মৃদুহাস্য করিতেছেন, কখনও তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতে ক্ষীণাঙ্গে শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে,—বিধুমুখে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি বিকশিত হইতেছে ও এক হস্তে বায়ু চালিত অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেছেন। কখনও দেখেন, সতী যেন স্নিগ্ধস্পর্শে তাঁহার পদসেবা করিতেছেন, সেই সুখ-স্পর্শে যোগানন্দ টুটিয়া যাইতেছে; কখনও বিল্বমূলে বসিয়া তিনি তাঁহাকে জয়ন্ত ও শবরের কাহিনী শুনাইতেছেন, সতী একাগ্র হইয়া শুনিতেছেন। কখনও দেখেন, কাষ্ঠের বোঝা হস্তে করিয়া নন্দী দাঁড়াইয়া আছে, সতী রন্ধনশালায় তাহা হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন; কখনও বা বিজয়া তাঁহার আগুল্‌ফলম্বী মুক্ত-কেশপাশ আঁচড়াইয়া দিতেছেন। কখনও রন্ধন-স্থালীর কালী পদে লগ্ন হইয়াছে, অলকানন্দার তীরে বসিয়া তিনি বল্কলের খুঁট দিয়া তাহা মার্জ্জনা করিতেছেন; কখনও

উদ্‌গ্রীব হইয়া শিবের থলিয়াতে ধুস্তুর ফল আছে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতেছেন, কখনও মৃদু মনোরম বাক্যে শিবের কর্ণে অমৃত-নিষেক করিয়া পার্ব্বত্যোৎসবে মিলিত হইবার জন্য নন্দীর নিমিত্ত এক দিনের বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন।

শিব নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন, পাহাড় নদী সরিয়া যাইয়া তাঁহার পথ করিয়া দিতেছে। শিব সতীর স্পর্শে বিরহব্যথা ভুলিয়া গিয়াছেন, অপূর্ব্ব মিলনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া পড়িতেছেন। শিব দেখিলেন, সতীর স্পর্শ তাঁহার বাহু-বল, সতীর প্রেম তাঁহার যোগবল, সতীর সৌন্দর্য্য তাঁহার ত্রিনেত্রের বিলাস—আকাশের মেঘ-মালায় সতীর কেশপাশ মুক্ত, সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে সতীর বল্কলবসনের ভঙ্গী, পর্ব্বতের গাত্রে সতী বল্লরীরূপে, পুষ্পরূপে নয়নাভিরাম।

এই জগৎ তিনি আপনার ও সতীর প্রকাশ বলিয়া বুঝিলেন; তিনি নিশ্চেষ্ট, অচল—সতী ক্রীড়াশীল, গতিময়ী ও তাঁহাকে কার্য্যের প্রেরণা দিতেছেন। তাঁহার রূপ নাই, গুণ নাই, তিনি অক্ষয়, অদ্বিতীয়। সতী রূপবতী, গুণবতী, তাঁহাকে নিরন্তর মুগ্ধ রাখিতে শক্তিশালিনী। সতীই তাঁহার সুখ—সতীই তাঁহার দুঃখ। সতীকে বাদ দিলে ত্রিজগতের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধরহিত হইয়া পড়েন, অপর দুই চক্ষু দৃষ্টিহারা হইয়া পড়ে,—কেবল ললাটের নেত্র কোন ঊর্দ্ধ রাজ্যে লক্ষ্যবদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া যায়। ত্রিজগৎ তাহার কোন সন্ধান বলিতে পারে না।

এই আনন্দে বিহ্বল, প্রিয়তমাস্পর্শ-সুখে উন্মত্ত শিব নৃত্য করিয়া চলিতেছেন। যুগ যুগ চলিয়া গেল এই নৃত্য—এই পর্য্যটনের বিরাম নাই। যোগী ভোগী হইয়া পড়িলেন, শিব মায়াযুক্ত হইলেন। জগৎ আবার অকল্যাণ গণনা করিল।

।

তখন বিষ্ণু সূক্ষ্মরূপে অধিষ্ঠান করিয়া চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

যেখানে ভারতীয় উপসাগর গুর্জ্জর-দেশের শৈল-কঠিন তটদেশে তরঙ্গাভিঘাত করিতেছে, সেই করাচির উত্তরস্থিত হিঙ্গুলায় সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হইল।

পঞ্চনদের তীরে আম্বালার সন্নিহিত চিত্রিত মেঘমালার ন্যায় পর্ব্বত-শ্রেণীর উপান্তে জ্বালামুখীতে বিষ্ণুচক্রকর্ত্তিত হইয়া সতীর জিহ্বা পতিত হইল।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত, বঙ্গোপসাগর-চুম্বিত তালখর্জ্জুর-নিষেবিত বাকলাপরগণান্তর্গত শিকারপুর সন্নিহিত সুগন্ধায় দেবীর নাসিকা পতিত হইল।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত আমোদপুরের সন্নিহিত লাভ-পুরে দেবীর ওষ্ঠ,—সীতাবিরহ-খিন্ন রামচন্দ্রের পদচারণপুণ্য জন-স্থানে দেবীর চিবুক, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে দেবীর কণ্ঠ, কালীঘাটে অঙ্গুলী, বারাণসীতে কুণ্ডল, এই প্রকার ৫১ ভাগে বিভক্ত দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন স্থানে পতিত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সেই পুণ্য দেহাবশেষ বিক্ষিপ্ত হইয়া তত্তৎস্থান-সমূহকে পীঠস্থানে পরিণত করিল। সেই পুণ্যে ভারতবর্ষে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পাইল। এদেশে যে রমণী স্বামী-প্রেমে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি অদ্যাপি সতীর নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের শত শত অজ্ঞাত পল্লীতে যজ্ঞাগ্নির ন্যায় পবিত্র চিতাগ্নিতে যুগে যুগে মহিলাগণ স্বামীপ্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়া 'সতী' নামে পূজা পাইয়াছেন।

এখনও স্বামী-নিন্দাসহনাক্ষম সাধ্বীর নিশ্বাস এদেশের অন্তঃপুরকে

পবিত্র করিতেছে ; প্রিয়তমার শব স্কন্ধে ধারণ করিয়া ভোলানাথ যে উন্মত্ত অবস্থায় ভূপর্য্যটন করিয়াছিলেন, সহধর্ম্মিণীর প্রতি এই প্রগাঢ় অনুরাগের আদর্শ এদেশের চিত্রকরগণ আঁকিয়া ও কবিগণ বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

সহসা মহাদেব বুঝিলেন, তাঁহার স্কন্ধে আর সেই স্পর্শ নাই। চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইয়া কণ্ঠে ও স্কন্ধে হস্ত-প্রদানপূর্ব্বক দেখিলেন—তাহা শূন্য। অকস্মাৎ তাঁহার ফুল্লারবিন্দতুল্য যুগ্ম নেত্র নিমীলিত হইল এবং ললাটনেত্র তীক্ষ্ণ বর্চ্চিঃ বিস্তার করিয়া হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—কামনার শেষ সেই নেত্রের দৃষ্টিতে পুড়িয়া গেল। তিনি সূক্ষ্মতত্ত্বে আরূঢ় হইয়া যোগানন্দে নিমগ্ন হইলেন। ত্রিজগতের সঙ্গে তখন আর তাঁহার কোন সম্বন্ধ রহিল না। আবার কত যুগ যুগান্তর পরে সেই সমাধি ভঙ্গ হইবে—দেবতারা সম্ভ্রমের সহিত তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফুল্লরা

ভূমিকা

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা বহু প্রাচীন। শাক্তধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছিলেন, মঙ্গলচণ্ডীর পূজক ব্রাহ্মণগণের সেই সময়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন ছিল। এই পূজা উপলক্ষে যখন উৎসবাদি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন সমাগত ভক্তগণের মনোরঞ্জনের জন্য ব্রতকথার উপাখ্যান ভাগ ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইল। দ্বিজ জনার্দ্দন প্রভৃতি কবিগণের বহু প্রাচীন ব্রতকথা পরবর্ত্তী সময়ে অমরকবি মুকুন্দরামের হস্তে বিচিত্র রাগরাগিণীসমন্বিত কাব্যগীতিকায় পরিণত হইল। বৃন্দাবন দাসের সময়েও মঙ্গলচণ্ডীর গৌরবসূচক সুদীর্ঘ কাব্য বিদ্যমান ছিল এবং উহার পালা সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া পূজোপলক্ষে গীত হইত, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা উল্লিখিত আছে। মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী বলরাম কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডীর অনেকাংশের উদ্ধার হইয়াছে।

১৫৭৯ খৃঃ অব্দে ত্রিবেণীর তীরবাসী পরাশর নামক ব্রাহ্মণের পুত্র মাধবাচার্য্য যে চণ্ডী প্রণয়ন করেন, কয়েক বৎসর হইল চট্টগ্রাম হইতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই চণ্ডীও মুকুন্দরামের সুবিখ্যাত চণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শেষোক্ত কবি মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে অবাধে ভাব ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর

মধ্যভাগে লালা জয়নারায়ণ সেন আর একখানি চণ্ডী প্রণয়ন করেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক কবি রচিত চণ্ডীকাব্যের পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত চণ্ডী মুকুন্দরামের অপূর্ব্ব প্রতিভায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে। সুদূর ইংলণ্ড হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত কাউয়েল সাহেব কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর অনেকাংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় কবিকে চসার এবং ব্লেক প্রভৃতি কবির ন্যায় প্রতিভাশালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানের ন্যায় চণ্ডী-বর্ণিত উপাখ্যানও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এত বেশী প্রচারিত হইয়াছিল যে, কাব্যনায়ক শ্রীমন্ত সদাগর প্রভৃতির লীলাক্ষেত্র এদেশে অনেক স্থলে কল্পিত হইয়াছে। যে কথা শত শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী-মাত্রেরই মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করিয়াছে, তাহার সারবত্তা প্রমাণের জন্য আমাদিগকে কাউয়েল সাহেবের মত নজীর স্বরূপ উদ্ধৃত করিতে হয়, ইহা বড়ই লজ্জার বিষয়।

এই পুস্তকের বর্ণিত গল্পের মূল কোন সংস্কৃত পুস্তকে বাঙ্গালী কবিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না জানি না। তবে একখানি চণ্ডী কাব্যের প্রাচীন পুঁথিতে পদ্মপুরাণোক্ত বলিয়া এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি।
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা॥"

পদ্মপুরাণে বাস্তবিক এই শ্লোক আছে কি না তাহা আমরা খুঁজিয়া দেখি নাই।

ভূমিকা

আমি অপর চণ্ডীগুলি হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিলেও মূলতঃ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়াই এই গল্প লিখিয়াছি। ইহা দ্বারা সেই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবির মূল গ্রন্থপাঠের কৌতূহল ও স্পৃহা যদি কথঞ্চিৎ উদ্রিক্ত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

১৯, কাঁটাপুকুর লেন.
বাগবাজার, কলিকাতা
৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৩

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে পুস্তকখানি আমূল পরিশোধিত হইল।

বেহালা ২৪শ পরগণা
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ফুল্লরা

৮

ব্যাধ-বালকগণের মধ্যে যখন কালকেতু দাঁড়াইত, তখন তাহাকে তাহাদের মণ্ডল বলিয়া মনে হইত। কালবর্ণ—কিন্তু বড় পরিষ্কার কালবর্ণ—যেন কৃষ্ণ হরিণীর একগুচ্ছ চামর ; তাহার গতিবিধি ও স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াশীলতায় তাহাকে একটি হস্তি-শাবকের মত দেখাইত ; মাথায় জালের দড়ি বাঁধা, কণ্ঠে ব্যাঘ্র-নখ। ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে মল্লযুদ্ধই বালকের প্রিয়, কাল-অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখিয়া সে বয়োজ্যেষ্ঠগণের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ছাড়িত না ; একবার যাহাকে আঁকড়িয়া ধরিত, সে ভাবিত এ ত শিশু নহে—এ শিশুদের যম। ভয়ে বালকগণ তাহার মল্লখেলায় স্বীকৃত হইত না। সুতরাং কালকেতু অপ্রতিহত তেজে তাহাদের সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইয়াছিল, বালকগণের সে দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা ছিল।

বনে বনে এই বালকগণ ছাগ, মেষ, এমন কি মহিষ পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া বেড়াইত। শ্যেন, চিল, শকুনিকে বাঁটুল ছুড়িয়া মারিত। কালকেতুর অব্যর্থ সন্ধানে পক্ষীগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া মরিত। একদিন বালকেরা ধর্ম্মকেতুর গৃহ-প্রাঙ্গণে একটা মৃত শার্দ্দূল টানাটানি করিয়া লইয়া আসিল, ধর্ম্মকেতু দেখিল বাঘটার ঠিক কপালে বাঁটুলের ঘা লাগিয়াছে। সে বলিয়া উঠিল, "বাহবা শিকারী, এই বাঘ যে মারিয়াছে তাহার বাহাদুরী আছে!" বালকেরা বলিল, "তোমার পুত্র কালকেতুই এই বাহাদুর শিকারী!" এত বড় বাঘকে এরূপ নিপুণভাবে তাহার দ্বাদশবর্ষীয় বালক শিকার করিয়াছে শুনিয়া ধর্ম্মকেতু সেই ক্ষুদ্র মেঘমণ্ডলের মত জমাট, শক্তিশালী বালকটিকে কোলে লইয়া চুম্বন করিল

এবং বলিল, "আমি সমবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ছিলাম, কিন্তু বার বৎসর বয়সে এরূপ বাঘ শিকার করা দূরে থাকুক, ইহাকে দেখিলে আমি ভয় পাইতাম।"

বালকটির কর্ণে জননী স্ফটিকের কুণ্ডল এবং কণ্ঠে ব্যাঘ্র-নখের সঙ্গে একগাছা স্ফটিকের হার দোলাইয়া দিয়াছিল। সেই হার এবং কুণ্ডল সঞ্চালিত করিয়া যখন বালক গৃহের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইত, তখন ব্যাধগৃহে যেন মেঘখণ্ডে বিজুলী ঝলসিত হইত; সেই কালরূপের বাহার দেখিয়া মাতা নিদয়া ধূলিমাখা বালকটিকে কোলে জড়াইয়া ধরিত, তখন মনে হইত যেন মা যশোদা তাঁহার কালমাণিকটিকে অঞ্চলে ধরিতেছেন। কিন্তু যখন কালকেতু আহার করিতে বসিত, তখন হাঁড়িতে হাঁড়িতে ক্ষুদ, শিকপোড়া নেউল ও মৃগমাংস, একটি মাটিয়া পাথরপূর্ণ পুঁইশাক, সে মুহূর্ত্তের মধ্যে শূন্য করিয়া রন্ধনের স্থানের দিকে লোলুপ ভাবে দৃষ্টিপাত করিত; মা নিদয়া বলিত, "বাছা! আর লোভ করিলে বুড়াটির জন্য কিছু থাকিবে না।" কালকেতু মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টমনে উঠিয়া যাইত।

কখনও বালক-দলের মধ্যে কালকেতু রাজা সাজিত, তাহারা নানাবিধ বন্য কুসুম আনিয়া তাহার মুকুট রচনা করিয়া দিত; বিচিত্র পল্লবে কুসুম-খচিত করিয়া তাহার মালা গাঁথিয়া দিত; ইহার মধ্যে যদি কেহ জবাফুল ছিঁড়িয়া আনিত, তবে সে তাহার গণ্ডদেশে বিষম চাপড় মারিত। পল্লবের সঙ্গে বিল্বদল পাইলেও সে বিল্বপত্রচ্ছেত্তার প্রতি সেই ব্যবস্থা করিত। জবাফুলের অধিকারিণী চণ্ডিকা মাতা, বিল্বদলের মালিক মহেশ্বর, "তাঁহাদের সামগ্রীতে হাত দিলি কোন্ সাহসে" এই বলিয়া সে সারাদিন ব্যাঘ্রবৎ গর্জ্জন করিত। তাহাকে রাজা করিয়া

বালকগণ ব্যাঘ্রচর্ম্মের সিংহাসন প্রদান করিত, সে তুষ্ট হইয়া উপবেশন করিত ; কিন্তু যদি কেহ সিংহের চর্ম্ম আনিয়া দিত, তবে তাহার গণ্ডেও সেই বিষম চাপড় পড়িত ; চণ্ডীর বাহন সিংহের চর্ম্মে সে বসিবে এরূপ কথা কে কবে শুনিয়াছে ? তাহার ক্ষুদ্র রাজত্বে জবা, বিল্বদল ও সিংহের চর্ম্মের অত্যধিক মর্য্যাদা। শিবে, নেড়া প্রভৃতি দলের সকলেই স্বীকার করিত। এবার কলিঙ্গরাজার গৃহে চণ্ডী-পূজার জন্য সেই বন হইতে জবাফুল সংগ্রহ করিতে পাইকগণ আসিয়াছিল, কালকেতুর অনুচরগণ তাহাদিগকে বাটুল ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল।

সেই বনে দীর্ঘকাল বাস করিয়া ধর্ম্মকেতু বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। নিদয়াও বৃদ্ধাবস্থায় একা সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। এদিকে হরিণ ও ছাগের মাংস মাথায় লইয়া পশরা করিতে করিতে নিদয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত, আর গৃহে ফিরিয়া রান্নার ক্লেশ তাহার সহ্য হইত না, এখন কালকেতুকে বিবাহ না করাইলেই চলে না।

সোমাই ওঝা সপ্তপুরুষ যাবৎ কুলপুরোহিত ; ধর্ম্মকেতু তিন সের গুড়, পাঁচটা গুবাক ও একটা হরিণ ভেট স্বরূপ লইয়া সোমাই ওঝার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে গড় করিল এবং বলিল, "ঠাকুর, আমার কালকেতুর জন্য পাত্রী ঠিক করিয়া দাও।" সোমাই ওঝা বলিল, "এই কিরাত-নগরেই কালকেতুর যোগ্য পাত্রী আছে, আমি তোমার কহিবার আগেই একরূপ ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। সঞ্জয়কেতুর কন্যা ফুল্লরাই তোমার পুত্রের বধূ হইবে ; ফুল্লরা বড় চমৎকার মেয়ে—সে হাটের সকল সামগ্রীর দর জানে, পশরা কাঁখে ও মাথায় করিয়া বেচিতে পারে, তাহার হাতের রাঁধা অন্নব্যঞ্জনের প্রশংসা সঞ্জয়কেতুর কুটুম্বদের মুখে আমি শুনিয়াছি, নিদয়ার আর কোন চিন্তা করিতে হইবে না, সে

পায়ের উপর পা রাখিয়া বেটার বউ-এর দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া লইতে পারিবে। আমি মেয়েটিকে নিজে দেখিয়াছি, তাহার দুইটি ডাগর চোখে ও কচি মুখ খানিতে যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ভাগ্যের রেখা আঁকিয়া রাখিয়াছেন।" ধর্ম্মকেতু আহ্লাদে আটখানা হইয়া এই খবর নিদয়াকে দিল, নিদয়া সোমাই ওঝাকে ধরিয়া পারে ত সেই দিনই বিবাহের লগ্ন ঠিক করিয়া লয়। শিকারান্তে কালকেতু বাড়ীতে আসিয়া ফুল্লরার রূপগুণের যে ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিল, তাহাতে শুক্লপক্ষের চন্দ্রলেখার ন্যায় বিবাহ করিবার সাধ তাহার মনে ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

খুব ধুমধামের সহিত বিবাহ হইয়া গেল; কিরাতনগরের ব্যাধগণ একদিনের জন্য শিকার করা ছাড়িয়া দিযাছিল। শিবে, নেড়া, রামাই প্রভৃতি কালকেতুর খেলার সাথীগণ, কেহ ঢোল, কেহ দগড়া পিটিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী লোকদিগের কর্ণে তালি লাগাইয়াছিল। বাকী সরঞ্জামের অপ্রতুল ছিল না, আম্র-পল্লব ও কদলীতরু দ্বারা ধর্ম্মকেতুর বাড়ীর প্রাচীর রচনা হইয়াছিল, ব্যাধবালকেরা হরিণের ছালের উপর বসিয়া বন্য কুসুম-মাল্যভূষিত দেহে বিবাহ-লগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছিল, কেবল জবাফুল ও বিল্বপত্র সেই উৎসবে সংগৃহীত হয় নাই।

ফুল্লরা বিবাহ-বাসরে সভার সকল কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইল। মেয়ের মুখ চোখ অনিন্দ্য, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে যেন একটা দুঃখের ভাব জাগ্রত। দুঃখিনী ফুল্লরা ব্যাধগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে শাপভ্রষ্টা ইন্দ্রের পুত্রবধূ, তাহা যেন ভুলিতে পারে নাই, সেই জন্য কি ভ্রমরকৃষ্ণ অক্ষি-পত্রে, শ্যাম ললাটে একটা অকথ্য ব্যথা চিত্রিত রহিয়াছে? কুমারীর এই দুঃখময় সৌন্দর্য্য কালকেতুর বড় ভাল লাগিল। যখন তাহার

উত্তরীয়ের সঙ্গে ফুল্লরার অঞ্চল আবদ্ধ হইল, তখন কি অস্ফুট স্মৃতি যেন বিদ্যুতের ন্যায় কালকেতুর মানসক্ষেত্রে চলিয়া গেল—যেন সে কোন দিব্য অম্লান কুসুমের রাজ্য হইতে কণ্টকপূর্ণ ধরাধামে, এই জীর্ণ ব্যাধগৃহে পড়িয়াছে,—কেন তাহার সাশ্রুনেত্র হইল—হৃদয় কম্পিত হইল, সে বুঝিতে পারিল না।

ফুল্লরা এখন ধর্ম্মকেতুর গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফুল্লরা কি ক্লেশ-সহিষ্ণু! গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রতাপে সে হরিণের মাংস বেচিতে কিরাতনগর ছাড়িয়া দূর গ্রামান্তরে চলিয়া যায়—শূকরের মাংস, হস্তি-দন্ত, চামরীর লেজ প্রভৃতি কালকেতু নিত্য আহরণ করিয়া আনে। মহিষের শৃঙ্গ শিঙ্গাদারগণ একপণ কড়ি মূল্যে ফুল্লরার নিকট ক্রয় করে, ব্যাঘ্রছাল ভণ্ড-সন্ন্যাসীরা আগ্রহের সহিত লইয়া যায়, শিশুদিগের কণ্ঠহারের জন্য জননীরা ব্যাঘ্রনখ ক্রয় করিয়া লয়, গণ্ডারের খড়্গা তর্পণের জন্য ব্রাহ্মণদিগের প্রয়োজনীয় হয়; এই সমস্তই শীত গ্রীষ্মে এক ভাবে ফুল্লরা পসার করিয়া বেড়ায়। কখনও মন্দার-কুসুম নিন্দিত শরীর স্বেদ-জলে, কখনও বা বৃষ্টি-জলে সিক্ত হয়, কখনও রৌদ্রতপ্ত বালুকায় পদযুগ দগ্ধ হয়, ফুল্লরা শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া কিরাতনগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। ফুল্লরা দর করে না, কোন পুরুষের মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলে না, তাহার আগমনে গৃহস্থের বাড়ীর ছেলেদের আনন্দ-কলরব উত্থিত হয়—যেন লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান, ফুল্লরা কখনই রিক্ত-হস্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ফুল্লরা বাজারে খাদ্যাদি ক্রয় করিয়া আনে। কোনও দিন ফুল্লরাকে কেহ বলিয়া দেয় নাই, তথাপি ধর্ম্মকেতু যে নটেশাক ভালবাসে তাহা সেই গৃহে

পদার্পণের দুই দিন পরেই ফুল্লরা বুঝিয়াছে; বৃদ্ধ ব্যাধ নটেশাক পাইয়া তাহার এক একটি পর্ণ দ্বারা তে-আঁঠিয়া তালের মত এক একটা বড বড় অন্নের গ্রাস তুলিয়া মুখে লয়, ফুল্লরার রান্না অমৃততুল্য, খাইয়া ধর্ম্মকেতু তাহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে। কালকেতু খাদ্যসম্বন্ধে কখনই কোন মতামত প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত নহে, যেহেতু উদরপূর্ত্তির দিকেই তাহার বেশী লক্ষ্য থাকে, তথাপি ভোজনের শেষ অধ্যায়ে সে প্রায়ই বলিয়া থাকে—"রন্ধন ক'রেছ ভাল, আর কিছু আছে?"

ফুল্লরার রান্নার আর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, যেদিন পরিবারের যে কোন ব্যক্তির যাহা খাইতে সাধ যাইত, ফুল্লরা অন্তর্যামীর মত তাহা বুঝিতে পারিত—সে সাধ কহিবার পূর্ব্বেই গৃহ-লক্ষ্মী পূর্ণ করিয়া দিত।

এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল, কালকেতুর বাহুবল ও ফুল্লরার গৃহস্থালী সেই কিরাতনগরে প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় ছিল। তাহারা আহারের সন্ধানে দিবাভাগ কর্ত্তন করিত, তখন কিছু মনে হইত না, কিন্তু যখন গৃহ-কার্য্যের অবসানে শুইতে যাইত—পরদিনের গৃহস্থালীর চিন্তা তখনও মনে হয় নাই, সেই সময়ে সহসা যেন কোন অস্পষ্ট স্মৃতি মনে জাগ্রত হইত, এই আহার-চেষ্টাই তাহাদের শেষ উদ্দেশ্য নহে; কোন্ গূঢ় অভিপ্রায়ে কোন্ দেব-মহিমা প্রচারার্থ যেন তাহারা ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুঃখময় সংসারের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহারই কথা অস্পষ্টভাবে মনে হইত। তখন কালকেতু শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় স্বীয় মোহবন্ধন ভাঙ্গিবার জন্য সচেষ্ট হইত, ফুল্লরা ধীরা ও গম্ভীরা হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া কি জানি ভাবিত, কিন্তু এই ভাব বিদ্যুতের মত মানস-ক্ষেত্রে খেলিয়া চলিয়া যাইত।

২

ক্রমে এই ভাব বদ্ধমূল হইল, কালকেতু ও ফুল্লরা উভয়ের সঙ্গে উভয়ের দেখা হইলেও যেন কি অপার দুঃখের কথা তাহাদের মনে হয়, এক বাণ-বিদ্ধ পক্ষিমিথুনের ন্যায় সেই ব্যথার তীব্রতা তাহারা উভয়ে সমভাবে অনুভব করে।

এই ভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাংসারিক অবস্থার বিপর্য্যয় হইল। নিদয়া ও ধর্ম্মকেতু কাশীধামে গমন করিল এবং তথায় যাওয়ার ছয়মাস পরে কালকেতুর নিকট সংবাদ আসিল, তাহাদের দেহত্যাগ হইয়াছে। এদিকে সে বৎসরের সমস্ত ধান্য রৌদ্রতাপে শুকাইয়া গেল। কিরাত-নগরে অন্ন বিনা হাহাকার উঠিল। কালকেতু বনে গেলে পশুগণ ত্রস্ত হইত, তাহারা প্রাণের ভয়ে কে কোথায় ছুটিয়া পলাইবে, তজ্জন্য নিভৃত স্থান খুঁজিয়া পাইত না। কালকেতু পশুদিগের এই ত্রাস উৎপত্তি করিয়া নিজে মর্ম্মপীড়িত হইত, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভ্যাস-বশতঃ ধনুর্গুণ লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিত এবং শিকার করিয়া লইয়া আসিত—কিন্তু মনে সোয়াস্তি পাইত না। এইভাবে পশুহনন ব্যাপার অনেকটা শিথিল হইল। কোন কোন দিন কংসনদীর তীরে সে বিশ্রামের জন্য তরুতলে শায়িত হইত, তখন ব্যাধ-জীবন অতি ঘৃণিত মনে মনে স্থির করিয়া সে ক্ষুণ্ণ হইত, বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া খাইত ও কংসনদীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। এদিকে উপবাসী ফুল্লরা নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া স্বামীর আগমন-বিলম্ব-জনিত দুশ্চিন্তায় পথে একবার আসিয়া দাঁড়াইত, পুনরায় ঘরে যাইয়া স্থির থাকিতে পারিত না। তাহার

সেই কাতরতা-জনিত অশ্রু উৎকৃষ্ট জবা, বিল্বদলের ন্যায় চণ্ডী গ্রহণ করিতেন ; সেই অশ্রু-ফুল্লরার উপবাসে ও একাগ্রতায় পবিত্র হইয়া থাকিত।

ক্রমে ব্যাধ গৃহকে নিদারুণ দারিদ্র্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। দম্পতীর পূর্ব্ব-জন্মের বার্ত্তা একটা অস্পষ্ট আভাস বা স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়। নীলগগন ভেদ করিয়া যখন শত শত নক্ষত্র উদিত হয়, তখন ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য্যের প্রভা চকিতের ন্যায় তাহাদের মনের উপর চলিয়া যায়, দিবাভাগে সূর্য্যের জ্বলন্তপ্রভা দেখিয়া তাহাদের মনে দেবরাজের ললাটের সমুজ্জ্বল মণির স্মৃতি স্বপ্নের ন্যায় উদয় হয়, কি জানি সর্ব্বস্বরত্ন হারাইয়া তাহারা দীনহীন পর্ণকুটীরবাসী হইয়াছে, তাহাই আভাসে মনে পড়ে। এই ভাবে সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন শিথিল হইয়া গেল, দুঃসময়ে দারিদ্র্য-দুঃখ তাহাদিগকে বিষম নিপীড়ন করিতে লাগিল। কালকেতু সপ্তাহে দুই এক দিন একবারে উপবাসী থাকে ; কিন্তু ফুল্লরার নিত্যই উপবাস, কচিৎ অর্দ্ধাশন ; সে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। স্বামীর যেদিন উদর তৃপ্তি হয়, সেই দিন তাহার সেই বিশীর্ণ মুখমণ্ডল পরম তৃপ্তিতে প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

একদিন কংসনদীর তীরে ব্যাধনন্দন চিন্তা করিতেছে "এ আমার কি হইল! কেন অজ্ঞাত সুখের সন্ধানে মন আকৃষ্ট হয়! আমি ব্যাধ, আমাকে ঈশ্বর যে কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা কেন অবহেলা করিতেছি? ফুল্লরা না খাইয়া শুকাইয়া মরিতেছে, ব্যাধগণ বলিতেছে আমাকে দানায় লাগ পাইয়াছে ; ছিঃ—আমি যে ব্যাধ সেই ব্যাধ, শিকার করাই আমার ধর্ম্ম, সোমাই ওঝার মুখে শুনিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে আত্মীয়গণকে বধ করিতে বলিয়াছিলেন—কেহ কাহাকে

মারিতে পারে না, ভগবান্ স্বয়ং মারেন। আমাদের যাহা উপস্থিত কর্ত্তব্য, তাহা না করা মহাপাপ।"

তখন কালকেতু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শরাসন গ্রহণ করিল, সে কাননের পশুকুল নির্ম্মূল করিতে দাঁড়াইল। শজারু, শৃগাল, শূকর, মহিষ, যাহা পায় তাহাই বধ করে, লম্ফ দিয়া ব্যাঘ্ররাজ তাহার মস্তকের উপরে পড়ে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সে তাহাকে লেজের অগ্রভাগ ধরিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে ফেলে, কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ব্যাঘ্ররাজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণত্যাগ করে। রোষ-কষায়িত অগ্নিতুল্য দুইটি চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া পশুরাজ তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইল, একটি বাণে পশুরাজ খোঁড়া হইয়া গেল। দেবীর বাহন বলিয়া কালকেতু তাহাকে বধ করিল না, কিন্তু সিংহ এমনই চোট পাইল যে, তৃষ্ণাতুর হইয়া কেবলই কংসনদীর জলপান করিতে লাগিল।

মৃত পশুর ভার স্কন্ধে করিয়া আবার কালকেতুকে স্বগৃহ-মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কুটুম্বগণেরা হৃষ্ট হইল, তাহারা তাহার অপূর্ব্ব দৈহিক প্রশংসায় কিরাত-নগর পুনরায় সজাগ করিয়া তুলিল। মলিনা ও উপবাস-কৃশা ফুল্লরা পুনরায় মাংসের পশরা মাথায় লইয়া বাজারে ও গ্রামের পথে পথে ঘুরিতে লাগিল।

এদিকে পশুগণ একত্র হইয়া বনে জঙ্গলে ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল। মূকের ক্রন্দন বড় শক্তিশালী; তাহাতে দেবতার আসন না টলিয়া যায় না। চণ্ডীদেবীর সত্য সত্যই আসন টলিল, তাঁহার বাহন সিংহ তাঁহাকে লইয়া যখন কৈলাস-পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরণ করে, তখন তিনি তাহার শরীরে একটা আকস্মিক কম্প অনুভব করেন; কখনও চণ্ডীদেবী গণেশের হাত ধরিয়া যখন হিমালয়ের

গল্প বলিতে থাকেন, মেনকারাণীর স্নেহের কথা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না, তখন সহসা সিংহের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে তিনি দেখিতে পান, সিংহ যেন কি গভীর মনোবেদনায় ক্রমাগত হাই তুলিতেছে ও তাহার শ্মশ্রু বাহিয়া অশ্রুবিগলিত হইতেছে। দেবী আদরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিংহ! তোমার দুঃখের কারণ কি?" সিংহ কাতরভাবে বলিল, "স্বজাতির কষ্ট স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে; মা! কালকেতুর অত্যাচার হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করুন।"

দেবী কিরাতনগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী জঙ্গলে উপনীত হইলেন। সিংহ তাহাকে পরমানন্দে বহিয়া আনিল। তিনি সেই জঙ্গলে যাইয়া দেখিলেন, পশুগণ তিন দিবস উপবাসী থাকিয়া কেবল 'মা, মা' বলিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতেছে, হস্তীর বিপুল দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, গণ্ডার স্বীয় খড়্গ হেঁট করিয়া অশ্রুপাত করিতেছে, গণ্ডারী পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হইয়া মাটিতে মাথা খুঁড়িতেছে, ব্যাঘ্র স্ত্রী হারাইয়া পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। মহিষ, ছাগ, হরিণ, শজারু প্রভৃতি পশুগণ উপবাস-কৃশ ও ভয়-বিহ্বল, সামান্য শব্দে কালকেতুর জ্যা-নিনাদ কল্পনা করিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছে—অদূরে লজ্জাবনত রোষ-কষায়িত-নেত্র বিমর্ষ-বদন পশুরাজ আশ্রিতদিগকে রক্ষা করিতে না পারিয়া নিদারুণ-ক্ষোভে চণ্ডীমাতাকে স্মরণ করিতেছে।

অভয়ার আগমনে কিরাত-বনে সমস্ত কুসুম ফুটিয়া উঠিল; অকালে জলে পদ্ম ফুটিল ও চতুর্দ্দিক্ হইতে তরুগণ সুরভি নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল—পশুগণ দেখিল, বরাভয়দায়ী হস্ত প্রসারণ করিয়া জগজ্জননী মহিমান্বিত মূর্ত্তিতে প্রভাসিত হইতেছেন—তাহারা পরমানন্দে মাকে

প্রণাম করিল। হস্তী, গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি বিশালকায় পশুগণ মাতৃ-সন্নিহিত ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় আনন্দে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, স্বয়ং পশুরাজ লাঙ্গুল উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিতে লাগিল। চণ্ডী বলিলেন, "সিংহ! তোমার গর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্তর কম্পিত হয়, এই বিশাল রাজ্য তোমার অধিকৃত; ব্যাঘ্র! তুমি আদি-ক্ষত্রিয় পবনের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, তুমি নখাগ্রে পাষাণ বিদীর্ণ করিতে পার; গণ্ডার! তোমার ললাটের খাণ্ডা অভেদ্য, তুমি ক্রুদ্ধ নেত্রে যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেদিকে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; এত বড় শৃঙ্গ, এরূপ দৈহিক শক্তি লইয়া মহিষ! তুমি কি করিতেছ? এই বিপুল দন্ত ও পদের আঘাতে বহু-সংখ্যক প্রাণী এক সময় হত হইতে পারে, হস্তী! তোমার রূপই ভয়াবহ; এই সাহসী, বিক্রম-শীল পশুগণ দূরাগত একটা সামান্য মনুষ্যের ভয়ে কাতর হইয়া পড়িয়াছে, বড় আশ্চর্য্যের কথা।"

তখন পশুরাজ পশুদিগের পক্ষ হইতে উত্তর করিল—"আমরা যে প্রণালীতে যুদ্ধ করিয়া থাকি, কালকেতু সে ভাবে যুদ্ধ করে না; সে দূর হইতে সন্ধান করে; এই সকল নখ, খড়্গ ও সুতীক্ষ্ণ দন্ত প্রয়োগের সুযোগ কোথায়? সে অব্যর্থসন্ধানী, এক বাণে সে জঙ্গল উজাড় করিয়া ফেলে; মা! আমাদিগের হস্তে সেরূপ অস্ত্র নাই। তাহাকে সম্মুখে পাইলে হত্যা করিতে পারি, কিন্তু চতুর্দ্দিকে বাণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকি,—এ বিপত্তিতে কে রক্ষা করিবে? তারপর পশুদিগের ঐক্য নাই। ব্যাঘ্র ও মহিষকে একস্থানে রাখিতে পারি না; হাতী মাথায় মাহুতের পদরজঃ মাখিয়া স্বজাতির প্রতি বিদ্রোহাচরণ করে। পোষা হাতী স্বজাতীয়দিগকে মানুষের হস্তে ধরাইয়া দেয়। গণ্ডার নিতান্ত একগুঁয়ে, সে কাহারও কথা শুনিবেনা, পশুজগৎ অভি-

বিরাট্ কিন্তু রেষারেষি ও পরস্পরের প্রতি হিংসাবশতঃ আমরা একেবারে উচ্ছন্ন যাইতেছি। তারপর, মাতা! তুমিই আমাদিগের স্বজাতির মাংস আহার্য্য করিয়া নিয়োজিত করিয়াছ। রাজা হইয়া প্রজার মাংসেই আমি জীবন যাত্রা করিতেছি। আজ আমরা একত্র হইয়াছি; কোন কার্য্য এক সঙ্গে করিতে গেলে মতদ্বৈধের জন্য তাহা হইয়া উঠে না; কিন্তু বিপদে পড়িলে বাঘ ও মেষ একত্র দাঁড়ায়, আজ আমাদের সেই অবস্থা। আজ কালকেতুর হস্তে আমাদের সকলের প্রাণ যাইতে উদ্যত, এই জন্য আজ হিংসা নাই। আজ আমরা সমবেত ভাবে তব পদাম্বুজে অশ্রুনিবেদন করিয়া তোমার করুণা প্রত্যাশা করিতেছি। আমরা এত হীন যে তুমি আমাদিগের আহ্বানে আসিবে, তাহা ভরসা ছিল না। মা! তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আমাদের আর ভয় নাই। আমরা স্বচেষ্টায় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি নাই, তোমার প্রসাদে আমরা দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করিতে পারিব। মা দশভুজে! তোমার কোন হস্তে বিষ্ণুর চক্র, কোন হস্তে শিবের শূল, কোন হস্তে যমের পাশ, কোন হস্তে বরুণের অঙ্কুশ—তুমি কালকেতুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পার। তোমার গলে যে অম্লান পদ্মকুসুমের মাল্য, তাহা জলধি তোমায় দান করিয়াছেন, তাহার সুগন্ধে কাননভূমি সুবাসিত হইয়াছে। আমাদের আশা পূর্ণ হইবে, চতুর্দ্দিকে তাহারই শুভলক্ষণ দেখিতেছি।"

চণ্ডী বলিলেন, "তোমরা অনৈক্য ও স্বজাতি-হিংসা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কর্ম্ম-গৌরবে তোমরা আমার অনুকম্পা প্রত্যাশা করিতে পারিতে না, আজ শিশুর ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া পরম বিশ্বাসে "মা" বলিয়া ডাকিয়াছ, তাই আমি তোমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই। আজ তোমাদের

জাতিভেদ ঘুচিয়াছে, সিংহের ও ছাগ-শিশুর মুখে তুল্য রূপই নির্ভরের ভাব অঙ্কিত হইয়াছে, তাই আমি আসিয়াছি। তোমরা আশ্বস্ত হও। অদ্য হইতে কালকেতু আর তোমাদিগের উপর কোন উৎপাত করিতে পারিবে না।"

অপূর্ব্ব প্রভামণ্ডিতা জগজ্জননীর মুকুটস্থিত মণির আভা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় সেই বনরাজির শীর্ষে খেলিতে লাগিল, বনপ্রদেশে আশ্চর্য্য শান্তির হিল্লোল প্রবাহিত লাগিল।

সিংহবাহিনী অভয়প্রদ হস্তে আশিস প্রদান করিতে করিতে অন্তর্হিত হইলেন, কুসুমস্তবক সহ তরুগণ জগজ্জননীকে আনম্র হইয়া প্রণাম করিল। তাঁহার দেহের স্বর্গীয় সুগন্ধামোদিত সমীরণ দিগ্‌দিগন্তরে সেই মহা আনন্দের কথা প্রচার করিয়া ছুটিল।

৩

প্রাতে কালকেতুর নিদ্র ভঙ্গ হওয়া মাত্র সে শুনিল কোথা হইতে শঙ্খনিনাদ হইতেছে, তাহার শুভ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে—শয্যায় ফুল্লরা ঘুমাইয়াছিল, তাহার মুখখানি দেখিয়া কালকেতু মনে ভাবিল, আজ আমার যাত্রা শুভ; যে দিনই ফুল্লরার মুখখানি দেখিয়া বনে যাই—সে দিনই আমার দিনটা শুভ হয়। অনেক দিন সে প্রাতে উঠিয়া গৃহকার্য্যে লিপ্ত থাকে, আমি ব্যাকুল চক্ষে আমার ফুল্লরার মুখখানি দেখিতে খুঁজিয়া বেড়াই, তাহার মুখখানি দেখিতে পাই না। আজ ফুল্লরার মুখ প্রফুল্ল, যেন কোন স্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছে। হাসিবার কি আছে? সেপ্রায়ই উপবাসে দিন যাপন করে, এই কুটীরে

কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া যদি সুখী হইয়া থাকে সেই স্বপ্ন আমি ভাঙ্গিব না। ফুল্লরা! তুমি ঘুমাও।

সে হস্তে শরাসন তিনটি বাণ ও একটি তূণীর তুলিয়া লইল। গণ্ডারের চর্ম্মের একটা অঙ্গরাখা পরিল, ধুতি মল্লবেশে বাঁধিয়া পরিল। কর্ণে স্ফটিকের কুণ্ডল, দুই গোঁপ মুচাড়িয়া কর্ণে বাঁধিল। কালকেতু গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় গোয়ালিনী "দধি দধি" বলিয়া ডাকিয়া গেল। সম্মুখে দেখিল কদলী-বৃক্ষশ্রেণীর উর্দ্ধে নারিকেল-বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে। কালকেতু এ সমস্তই শুভ লক্ষণ মনে করিয়া প্রীতির সহিত যাত্রা করিল।

কালকেতু হৃষ্ট মনে কাননের দিকে যাইতে লাগিল। যেই নিবিড় কাননে প্রবেশ করিবে, অমনি দেখিল স্বর্ণবর্ণ, চিত্রিতদেহ, স্বর্ণপুচ্ছ একটা গোধিকা একটি নিম্ববৃক্ষের শাখা হইতে বৃক্ষমূলে অবতরণ করিতেছে।

সোমাই ওঝা বলিয়াছিলেন—গোধিকা অতি অশুভ চিহ্ন। কালকেতু মনে ভাবিল, এত যে শুভ লক্ষণ দেখিলাম, এই গোধিকাটি সকল মাটি করিয়া ফেলিল। আজ যদি ভাল শিকার জোটে তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা এই গোধিকাটিকেই শিকপোড়া করিয়া খাইতে হইবে। কালকেতু গোধিকাটি ধরিয়া একটি অপরাজিতা পুষ্পের লতা দ্বারা তাহাকে নিম্ববৃক্ষের শাখায় কষিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

বনে যাইতে যাইতে কালকেতু দেখিল, সহসা সমস্ত বন হিমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষ, জীব, জন্তু, পথ কিছুই নেত্রগোচর হয় না। দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকা পরিয়া কাননভূমি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আছে—কালকেতু কোথায় বা বৃক্ষশাখায় আঘাত পাইয়া উছট খাইতে লাগিল, কোথায় বা হরিণের শৃঙ্গ তাহাকে ঢুঁ দিয়া চলিয়া গেল, হাত বাড়াইয়া সেই ঈপ্সিত শিকারটি সে খুঁজিয়া পাইল না, চক্ষু তাহাকে কোন সন্ধান

বলিয়া দিল না। কালকেতু ভাবিল, আমার পক্ষে এই মৃগটি রামচন্দ্রের মায়ামৃগ হইল।

ক্ষণে ক্ষণে সে শুনিতে পাইল, তাহার পাদক্ষেপে চকিত ভগ্ন-নিদ্র পশুরাজ দন্ত কড়মড় করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে, অন্যদিন সেই গর্জ্জনে ভীতির আর্ত্তি থাকে, কিন্তু আজিকার গর্জ্জন মেঘমন্দ্রের ন্যায়—আজ পশুরাজ তাহার সম্পূর্ণ রাজশক্তির গৌরবে গর্জ্জন করিতেছে। বিস্মিত হইয়া কালকেতু গর্জ্জন অনুসরণ করিয়া শূল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ছুটিল, কিন্তু সে খুঁজিয়া ক্লান্ত হইল, সিংহের সাক্ষাৎকার লাভ করিল না।

শিবদূত নন্দীর ন্যায় ব্যাধনায়ক শূলহস্তে। যদি আকাশে সূর্য্য থাকিত তবে দেখিতে পাওয়া যাইত, কালকেতুর বদনমণ্ডলে অলৌকিক দীপ্তি, বিদ্যুৎপ্রভ মেঘের ন্যায় সেই দীপ্তিতে কাল মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল; তাহার হস্তের শূল পিণাকীর পিণাকের ন্যায় ধ্রুব; গণ্ডার-চর্ম্মের আচ্ছাদনে কপাটের ন্যায় বক্ষঃস্থল আবৃত; সে পশুকুলের যম-স্বরূপ, তাহার দুই বিরাট ভ্রূ কুঞ্চিত—সেই কুঞ্চনে যে রোষ সূচিত হইতেছে, তাহাতে কত শত সিংহ ব্যাঘ্র পুড়িয়া মরিতে পারে।

কালকেতু বিফল প্রয়াসে পশু সন্ধানে ব্যস্ত। সে সহজে ছাড়িবার লোক নহে। যে বিষয়টি সে ধরে তাহা তাহারই ধনুর ন্যায় সে আঁকড়িয়া ধরে। সে এই কুজ্ঝটিকা-সমুদ্রের একটা কিনারা করিয়া আজ যাইবে, এই তাহার পণ। যদি তৃতীয় প্রহর বেলাও হয়, তথাপি সে ক্ষান্ত হইবে না, ইহার মধ্যে সূর্য্যদেব অবশ্যই উঠিবেন।

ইত্যবসরে আমরা পশুজগতের একটা চিত্র প্রদর্শন করিব। পিতামহীর অঙ্কে একটি শুভ্রজটাবিশিষ্ট খর-চক্ষু সিংহশাবক শুইয়াছিল।

সে রাত্রির গল্পের শেষটুকু পিতামহীর মুখে শুনিবার জন্য আব্দার করিতে লাগিল। পিতামহী ত্রিজটা সিংহী, বয়স ত্রিশহাজার বৎসর, চণ্ডীর বাহন সিংহের মাতা, এবং চণ্ডীর বরে অমর।

ত্রিজটা সিংহী বলিতে লাগিল, "সে অনেক কথা, মানুষ যে কি করিয়া সিংহের উপরে গেল, সে ইতিহাস অতি দীর্ঘ। প্রথমতঃ মানুষগুলি আমাদের মত ছিল, দাঁতগুলি ঠিক আমাদের মত না হইলেও এখন যে কচি কচি ইন্দুরের দাঁতের মত দাঁত—তাহা অপেক্ষা মানুষের দাঁত ঢের বড় ছিল। নখগুলি তীক্ষ্ণাগ্র ছিল, অনেক সময়ে সিংহের সঙ্গে মানুষ হাতাহাতি যুদ্ধ করিত, সেই যুদ্ধে শতকরা নব্বুইটি মানুষ মারা পড়িত, দুই দশটা সিংহও মানুষের হাতে মরিতে দেখিয়াছি। অনেক সময় গাছের ডাল ও পাথর লইয়া তাহারা সিংহের সম্মুখীন হইত, কিন্তু সিংহের তাড়া খাইয়া হাতের পাথর ও বৃক্ষশাখা খসিয়া পড়িত, আমরা অনায়াসে তাহাদিগকে মারিয়া খাইতাম। বানরগুলির মধ্যে এক জাত আছে, তাহারা এখনও মানুষের মত লাঠি ঘাড়ে করিয়া তাড়িয়া আসে; আমাদের দাঁতখিঁচুনী দেখিলে তাহাদের হাতের লাঠি খসিয়া মাটিতে পড়ে।"

সিংহশাবক—"আমাদের এত বড় প্রতাপ থাকিতে মানুষগুলি পৃথিবী অধিকার করিল কিরূপে?"

ত্রিজটা—"সে একদিন দৈবাৎ। মর্ত্ত্যলোকে ব্রহ্মা আসিয়াছিলেন। আমরা চণ্ডীর প্রজা, অপর দেবতাদের বড় মানিতাম না। আমাদের কর্ত্তারা নাকি ব্রহ্মাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান নাই; বলিয়াছিলেন, তুমি যেই হও ঠাকুর, আমরা তোমার পরিচয় জানিতে চাই না—আমরা উঠিতে পারিব না, তুমি অন্য পথ দিয়া চলিয়া যাও। ব্রহ্মা ভারি রাগ

করিয়া গেলেন। তারপর দিন শুনিতে পাইলাম, মানুষগুলি আনন্দ-কোলাহলে আকাশ ফাটাইয়া দিতেছে; ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম, তাহারা নাকি আগুনের বীজ পাইয়াছে।"

সিংহশাবক—"আগুনের বীজ কি প্রকার?"

ত্রিজটা—এই যে দাবাগ্নি হয়, তখন আমরা বন ছাড়িয়া ভয়ে পলাইয়া যাই, সেই অগ্নির বীজ। দুইখানা কাঠ ঘষিয়া নাকি তাহারা সেই বীজ পাইয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই সেই দাবাগ্নির মত প্রবল অগ্নির উৎপত্তি করিতে পারে। কি সর্ব্বনাশ! দেখিতে দেখিতে আমরা ভয়ানক বিপদে পড়িয়া গেলাম। দেখিলাম শুকনা কাঠগুলিতে আগুন ধরাইয়া দলে দলে মানুষগুলি ছুটিয়া আসিতেছে, ব্রহ্মা যেন তাহাদের আগে আগে আসিতেছেন। প্রজ্বলিত অগ্নি সম্মুখে করিয়া মানুষগুলি আমাদিগকে তাড়া করিতে লাগিল। কর্ত্তারা কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের লম্বিত কেশর ও গোঁফে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহারা জ্বালায় অস্থির হইয়া বাপীনীরে ডুবিয়া রহিলেন। তখন বিজয়োন্মত্ত মানুষগুলি বনের সমস্ত পশু তাড়াইয়া দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জমি দখল করিয়া বসিল, শুকনা খর-কাঠে আগুন জ্বালাইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ আগুনের প্রাচীর তুলিয়া তাহারা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট স্থান সকল অধিকার করিয়া লইল। মনুষ্য-জাতির ভাগ্য সেই দিন হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।"

সিংহশাবক—"আচ্ছা, সেই অগ্নির বীজের সন্ধান করিয়া আমরা লাভ না করি কেন?"

ত্রিজটা—"তাহার জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে; কত পাথর ও কাষ্ঠ লইয়া সিংহদল চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সেই বীজ, সেই স্ফুলিঙ্গ উৎপত্তি

করিতে পারে নাই। জটিল নামক সিংহ সেই বীজের সন্ধানে উত্তর মেরুতে যাইয়া তপস্যা করিয়া প্রাণ দিয়াছেন। অলক্ষ্য নামক সিংহও এই চেষ্টায় দেহপাত করিয়াছিলেন। কখনও কখনও আমাদের দন্তাঘাতে প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ হইবার সময় সেইরূপ একটা স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া তড়িতের ন্যায় চলিয়া যায়—কিন্তু তাহা ব্রহ্মার ঠাট্টা মাত্র। মহিষদল যখন শৃঙ্গে শৃঙ্গ ঠেকাইয়া ভীষণ ক্রোধে পরস্পরকে আঘাত করে, তখন শৃঙ্গ-সঙ্ঘাতে সেই স্ফুলিঙ্গের মত কি একটা উত্থিত হইয়া নিবিয়া যায়, বাস্তবিক উহা ব্রহ্মার ঠাট্টা মাত্র; ব্রহ্মা পশুজগৎকে উহা দিবেন না। মানুষ যেদিন এই অগ্নিমন্ত্র-সিদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন সমস্ত পশুর উপর উঠিয়াছে।" এই কথা শেষ না হইতে হইতে ত্রিজটা সিংহী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ঐ যে কালকেতু আস্‌চে, তুই শীঘ্র পালা, আমি এই গাছটার আড়ালে থাকি।" কালকেতু কুজ্ঝটিকায় কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না; সে কুজ্ঝটিকা—দেবীর মায়া। ত্রিজটাসিংহী যে গাছটার আড়ালে দাঁড়াইয়া রোমাঞ্চিত হইতেছিল, কালকেতু হাত বাড়াইয়া সেই গাছটা ধরিল—তাহা অন্ধের যষ্টি-ধারণের ন্যায়। ত্রিজটা ভাবিল, চণ্ডী তাহাকে যে অমর বর দিয়াছেন, তাহা বুঝি এইবার মিথ্যা হয়; সে ভয়ে একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং কালকেতুর কর-নিক্ষিপ্ত বাণ মাথায় বা বুকের পাঁজরে আসিয়া না পড়ে, সেই উদ্দেশে সম্মুখের দুই পায়ের থাবা বাড়াইয়া দিল। কালকেতু সিংহীর গর্জ্জন শুনিয়া তীর মারিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পায় নাই; বাণটা শন্ করিয়া সিংহীর কাণের কাছ দিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, তথাপি রৌদ্রের সঙ্গে দেখা নাই। মেঘ থাকিলে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তাহাতে পথ দেখা যায়; রাত্রে চাঁদ না

উঠিলেও তারা থাকে, তাহাদের ক্ষীণপ্রভায় পথ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু একি! রাত্রিও নহে—দিনও নহে! মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, আকাশে শুধু জোর কুজ্ঝটিকার একটা অকাট্য প্রহেলিকা, উহা নেত্র-রোগীর নেত্রের আচ্ছাদনের ন্যায়। কালকেতু ঘুরিতে ঘুরিতে পথ হারাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই সময়ে তাহার মনে একটা অপূর্ব্ব প্রফুল্লতার উদয় হইল। তাহার চক্ষে সৃষ্টি অন্ধকার করিয়া ফেলিয়া গভীর রজনীর শেষে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় কি এক মহিমামণ্ডিত জ্যোতিঃ দেখা দিবে, তাহারই একটা অস্পষ্ট পূর্ব্বাভাস যেন তাহার মনে উদয় হইল।

ক্লান্ত অথচ উদ্যমশীল, বিফল-মনোরথ অথচ আশ্চর্য্য সাফল্যের প্রত্যাশী, শিকারলুব্ধ অথচ সদয়-বৃত্তি কালকেতু ব্যাধ তৃতীয় প্রহর-কালে কংস-নদীর তীরে উপস্থিত হইল। তরঙ্গের শব্দে সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার ক্রীড়ার নিকেতন, চিরপরিচিত কংসনদী সম্মুখে। সে সেই শব্দ লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল, হিমাবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া সূর্য্যদেব আকাশে উঠিয়াছেন। শিকার-ভূমি সে বহুদূরে ফেলিয়া আসিয়াছে, প্রদীপ্ত সূর্য্য-কিরণে সেই দূরবর্ত্তী নিবিড় কাননের শীর্ষভাগ যেন উজ্জ্বল কিরীট পরিয়া হাসিতেছে।

একবার ভাবিল, ফিরিয়া আবার বনে যাই, কিন্তু তখন নিম্ব-শাখে আবদ্ধ গোধিকাটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। "এই গোধিকাই আজ আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবে", বলিয়া সে গোধিকাটিকে অপরাজিতা পুষ্পলতার দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া নিজ ধনুর্গুণে বাঁধিয়া গৃহাভি-মুখে চলিল।

স্বামীর রিক্তহস্ত দেখিয়া ফুল্লরাসুন্দরীর মুখ শুকাইয়া গেল। আজ

তাহাকে কি খাইতে দিবে, স্বামীর উপবাসের আশঙ্কায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কালকেতু তাড়াতাড়ি ধনুর্গুণে বাঁধা গোধিকাটিকে মাটিতে ফেলিয়া, বলিল, "আজ এইটাকে শিকপোড়া করিয়া খাইব। তোমার বিমলা সইএর বাড়ী হইতে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া লইয়া এস। নিত্যকার খাওয়া সমান হয় না, তজ্জন্য তুমি এত দুঃখিত হইয়াছ কেন? আজ সারাদিন ঘুরিয়া শিকার পাইলাম না। বাসি মাংস তুমি বেচিতে পার না। তিন দিন হয় যে হরিণটা মারিয়াছিলাম, তাহার গোড়ালীর কতকটা মাংস আছে; হরিণের মাংস বাসি হইলে একবারে অখাদ্য হয় না। কৃষ্ণমুদি হরিণের মাংস বড় ভালবাসে, তুমি আজ এদিক্‌কার কার্য সরবরাহ কর, আমি গোলাঘাটে মুদির দোকানে এই বাসি মাংসটুকুর বদলে কিছু লবণ আনিতে পারি কি না সেই চেষ্টায় যাই; তুমি রাজপুকুরের পাড় হইতে পুঁইশাক সংগ্রহ করিয়া আনিও। ক্ষুদের জাউ, দুই হাঁড়ি পুঁইশাক ও এই গোধিকাপোড়া—ইহাতেই আজকার ব্যবস্থা হইবে। আমি বাসি মাংস লইয়া গোলাঘাটের দিকে চলিলাম।"

ফুল্লরা বিমলার বাড়ীতে যাইয়া দুইসের ক্ষুদ ধার করিয়া আনিল।

এদিকে সহসা ধনুর্গুণ ছিঁড়িয়া গোধিকা-রূপিণী চণ্ডী অপূর্ব্ব নারী-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

বিধুবদনে যুথিকা-কুসুমের শুভ্রতা হরণ করিয়া হাসিচ্ছটা ফুটিয়া উঠিল, নিবিড় কাদম্বিনীর ন্যায় মুক্ত অলকজাল পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িল, অতসীকুসুমের বর্ণ বরাঙ্গে খেলিতে লাগিল, শ্রীচরণ-সরোজের পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুব্রতেরা ঝঙ্কার করিতে লাগিল—"মুনিজনের ধ্যান ভাঙ্গে দেখি সে চরণ," চক্ষুর্দ্বয় দিব্যজ্যোতিঃ লুকাইয়া বক্রাক্ষপুটের

নিম্নভাগ হইতে মৃদু কৃষ্ণরশ্মি পাত করিতে লাগিল, সরোরুহের উপর ক্রীড়াশীল কৃষ্ণভ্রমরের ন্যায় মুখমণ্ডল শোভা করিয়া চঞ্চল কৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় খেলিতে লাগিল। যেখানে দেবীর তৃতীয় নেত্র, সেই স্থানে উজ্জ্বল সিন্দুর-রশ্মিকে মন্দীভূত করিয়া শ্বেতচন্দনের ফোঁটা শোভা পাইতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া অপূর্ব্ব কাঁচুলী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গেলেন,—সেই কাঁচুলীতে শিব-লীলা অঙ্কিত। কোথাও শিব ধুস্তুরবীজ গলাধঃকরণ করিয়া স্তিমিত-নেত্রে বসিয়া আছেন ; কোথাও বা ভিখারী শিবকে ঘেরিয়া কুচুনীপাড়ার বালকগণ দাঁড়াইয়াছে—তাহারা তাঁহার অঙ্গে মুষ্টি মুষ্টি ভস্মক্ষেপ করিতেছে, ভস্ম-ভক্ত হর মৃদু হাস্য করিতেছেন ; কোথাও মেনকারাণী অগ্রসর হইয়া হৈমবতীকে বক্ষে গ্রহণ করিতেছেন,—বিরহে অশক্ত শিব ছদ্মবেশে লুকাইয়া দেবীর হাসি দেখিয়া আমোদিত হইতেছেন ; দেবীর রক্ত-পট্টাম্বরে স্বর্ণসূত্রের দ্বারা শিবের বিবাহসভা অঙ্কিত হইয়াছে। ভোলানাথ বিবাহ-পীঠের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, পার্ব্বতীকে হাতে ধরিয়া মেনকারাণী তাঁহার পার্শ্বে লইয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এই উপলক্ষে শূন্য পথে সমাগত হইয়াছেন। ইন্দ্রের বক্ষস্থ পারিজাত-কুসুম খসিয়া পড়িতেছে, নন্দী-ভৃঙ্গীরা তাহা কুড়াইয়া লইয়া ঘ্রাণ লইতেছে, আর আনন্দে ধেই ধেই নৃত্য করিতেছে।

দেবীর পদে অপূর্ব্ব রত্নমঞ্জীর। কণ্ঠে মণিহার, মুখশোভায় সে মণি মলিন হইয়া গিয়াছে ; করে বিচিত্র মণিখচিত বলয় ও অঙ্গদ, কর-নখের জ্যোতিতে উহারা ম্লান হইয়া গিয়াছে। কর্ণে মণিময় কর্ণিকার পুষ্প, কৃষ্ণকেশ উহার জ্যোতিঃ বাড়াইয়া দিয়াছে।

চণ্ডী এই বেশে ব্যাধের দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ক্ষুদের চুপড়ি-কক্ষে ফুল্লরা আসিয়া এই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল ; সে চুপড়ি ভূমিতে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ গৃহে আপনি কে? কি হেতু আসিয়াছেন?" দেবী মৃদু হাস্যচ্ছটায় সেই কুটীরখানির দৈন্য ঘুচাইয়া—তাহা উজ্জ্বল করিয়া বলিলেন, "আমি ইলাব্রত দেশের রাজকুমারী। আমার স্বামী ভাঙ্‌ ও সিদ্ধি খাইয়া পাগল হইয়াছেন, সতিনীকে মাথায় রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি। কালকেতুকে আমি বড় ভালবাসি, সে আমার ভক্ত, আমি তাহার দুঃখ মোচন করিতে আসিয়াছি। আমি এইখানেই থাকিব।" "কালকেতুকে ইনি ভালবাসিতে যাইবেন কেন, সেই বা ইঁহার ভক্ত কবে হইল?" এই ভাবিতে ফুল্লরার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও রন্ধনের ত্বরা সে ভুলিয়া গেল,—

"পেটে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা॥"

সে সুধাইল—"স্বামী পাগল হইলেই কি তাহাকে ছাড়িতে আছে? সতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধিলে তাহাকে দ্বিগুণ শুনাইয়া দিবে, অভিমানে ঘর ছাড়িতে আছে?"

"শুন, সীতার ইতিহাস। সীতা এক সাধ্বী ছিলেন ; তথাপি তিনি কয়েকমাস পরগৃহে বাস করিয়াছিলেন, এজন্য রামচন্দ্র তাঁহাকে অগ্নিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; তাহাতেও সীতা সন্দেহ হইতে মুক্তি পাইলেন না ; অযোধ্যায় ফিরিয়া যাওয়ার পর প্রজাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। স্ত্রীলোকের স্বামীই সার ধন, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে শেষে পরিতাপের শেষ থাকে

না। দেখ, রেণুকা ভৃগুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইয়া স্বীয় পুত্র পরশুরামের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সতিনীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া যদি অন্যায় পথ অবলম্বন করা যায়, তাহাতে বড় অশুভ ফল হয়, কৈকেয়ী এইরূপ করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছিল।"

দেবী বলিলেন, "যার যে ভালমন্দ তাহা সেই ভাল জানে, আমি তোমাদের এখানেই থাকিব, তাহাতে তোমাদের কষ্টের কারণ কি?"

ফুল্লরা বলিল, "তুমি এখানে কি করিয়া থাকিবে, আমি বার মাসে কত কষ্ট সহ্য করি, তুমি নবনীত-কোমলা, তুমি তাহা কেমন করিয়া সহিবে? এই দেখ তাল-পাতার ছাউনি, ভাঙ্গা কুঁড়ে, মধ্যে ভেরাণ্ডার থাম, বৈশাখী ঝড়ে তাহা প্রায় প্রত্যহ ভাঙ্গিয়া যায়,—তুমি কেমন করিয়া এ ঘরে থাকিবে? জ্যৈষ্ঠে পশরা করিতে কত কষ্ট, খরতর রবি-কিরণে পথের বালু উত্তপ্ত হইয়া যায়,—হাঁটিতে শরীর ঘর্ম্মজলে সিক্ত হয়। প্রায়ই জ্যৈষ্ঠমাসে বইচির ফল খাইয়া আমি উপবাস করিয়া থাকি। আষাঢ়ে আকাশ নব-মেঘে পূর্ণ হইয়া যায়, বড় বড় গৃহস্থের তখন সম্বল টুটিয়া যায়, মাংসবিক্রয় হওয়া কষ্টকর হয়;—পশরা ছাড়িয়া যদি তৃষ্ণায় একটু জল খাইতে যাই, তবে দেখিতে দেখিতে চিলে অর্দ্ধেক সাবাড় করিয়া ফেলে। শ্রাবণ মাসে পথ ঘাট জলে একাকার হইয়া যায়, কচুর ঝাড় ও সেওলা ভাঙ্গিয়া এক হাঁটু জলে পথে পশরা মাথায় লইয়া যাই, তখন কত জোঁকে আসিয়া পায়ের রক্ত খায়, আমার কর্ম্মদোষে সাপে দংশন করে না। ভাদ্র মাসের দুরন্ত বাদলে কুঁড়ে ঠেলিয়া বান আসিয়া পড়ে, গাত্রে আচ্ছাদন নাই, বৃষ্টির জলেই স্নান করি। 'মাটিয়া পাথর' খানাও জুটে না,—ঐ দেখ, কুঁড়ের ভিতর গর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছি, ইহাতে আমানি রাখিয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করি। আশ্বিন মাসে

ঘরে ঘরে দেবী চণ্ডিকার পূজা হয়। নববস্ত্রপরিহিত যুবক-যুবতীগণের আনন্দের সীমা নাই, অভাগিনী ফুল্লরা হরিণের ছড় পরিয়া দিন যাপন করিয়া থাকে। আশ্বিন মাসে মাংস-বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, দেবীর প্রসাদ-মাংস সকলে পাইয়া থাকে, এই আনন্দের সময় আমরা নিরানন্দে কাটাই। কার্ত্তিক মাসে হিম পড়িতে আরম্ভ হয়, কুজ্‌ঝটিকায় শিকার দেখা যায় না, আমাদের নিত্য উপবাস। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন, তখন চাউলের মূল্য সুলভ হয বটে, আমরা নিত্য উপবাসী থাকি না, মাঝে মাঝে পেট পূরিয়া দু'টা খাইতে পাই; কিন্তু পুরাণ ছেঁড়া দোপাটায় শীত ঘুচে না। মাঘ মাসে শীতে থর থর করিয়া কাঁপিয়া খড়ের আগুন জ্বালিয়া শীত নিবারণ করি, তখন বনে একটি শাকও থাকে না। তুমি কি করিয়া এই গৃহে থাকিবে? তুমি রাজ-নন্দিনী, আমরা ভিখারিণী। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মন্দমারুতে কাননে নানা-প্রকার পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠে, দম্পতীগণ প্রেমোৎসবে, বসন্তোৎসবে মত্ত হয়; অভাগিনী ফুল্লরা তখন ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতে থাকে।"

দেবী বলিলেন, "এই জন্যই ত আমি আসিয়াছি। তোমাদের বারমাসী দুঃখের পালা আজ হইতে শেষ হইবে। দেখ না, আমার অঙ্গের আভরণ; ইহার একটা মণির মূল্যে একটা রাজ্য কিনিতে পারিবে। আর দুঃখ নাই। আর আমি কি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি, তোমার স্বামীর গুণে আমি বাঁধা পড়িয়াছি।" স্বামীর ধনুর্গুণের কথা দেবী বলিলেন, কিন্তু দুঃখিনী ফুল্লরা তাহা বুঝিবে কিরূপে? তখন তাহার প্রাণে যেন একটা শেল বিঁধিল।

যে সকল দৈন্যের কথা সে বলিয়াছে, তাহা সে একদিনের জন্যও কি

গণ্য করিয়াছে? যখন উপাধানের অভাবে কালকেতুর বিশাল ভুজে শির রাখিয়া সে শয়ন করিয়াছে, তখন কি উপাধানের অভাবে প্রকৃতই সে কোন কষ্ট পাইয়াছে। শৈত্যাধিক্যে তাহাকে সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট স্বামিদেহের সংস্পর্শে আনয়ন করিয়াছে, তখন কি সত্য-সত্যই সে উষ্ণ বস্ত্রের অভাবকে বড় একটা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করিয়াছে? যখন তাহার হাতে রাঁধা জাউ, পুঁই শাক ও মাংস খাইয়া কালকেতু তৃপ্তির সহিত বলিয়াছে, "রান্না চমৎকার হইয়াছে, তুমি খাও গিয়ে" তখন তাহার খাইবার জন্য যে কিছুই অবশিষ্ট নাই, সে কষ্ট কি তাহার একবারও মনে হইয়াছে? স্বামীর পরিতৃপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখিয়া তখন কি তাহার চক্ষে দু-এক বিন্দু আনন্দাশ্রু বহির্গত হয় নাই? পশরা বিক্রয় করিয়া তাহার স্বামীর জন্য রাঁধিতে বসিবে, সেই আনন্দে তাহার শত শ্রমকে সে কি কিছু মাত্র গণ্য করিয়াছে? স্বামীর প্রেম তাহার মূলধন; সেই গৌরবে সে তাহার পরিধেয় হরিণের ছড়্‌কে কি রাজেন্দ্রাণীর পট্টবস্ত্র অপেক্ষা মহার্ঘ মনে করে নাই? সিন্দুর কিনিতে না পারিয়া যে গৈরিক মৃত্তিকার ফোঁটা কপালে পরিয়াছে, তাহা কি স্বামি-প্রেম ও সতীত্বের গৌরবে আয়তের শ্রেষ্ঠ চিহ্নের ন্যায় বরণীয় হয় নাই? তাহার হস্তের লৌহ-বলয়কে যে-যত্নে সে রক্ষা করিত, যে-স্পর্দ্ধার সহিত সে দেখিত, রাজেন্দ্রাণী কি তাঁহার রত্নময় ভাণ্ডার সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন?

সেই কাল বিশালবপুঃ, কুঞ্চিতললাটাগ্রকেশ, খরজ্যোতিঃ ধনুহস্তে ব্যাধতনয় তাহার সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়াছিল—শুধু তাহা নহে, তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়া রাখিয়াছিল, সেই মূলধন অপহরণ করিতে কে আসিল?—ইনি কি তাহার প্রতিপক্ষ হইবেন?

স্বামীকে রক্ষা করিতে যে পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়, ইহা ত তাহার একদিনও মনে হয় নাই। হায়, ফুল্লরা যে দীনা হীনা, তাহার দেহের শ্রী সাংসারিক কষ্টে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে—সে যে নিতান্ত গুণহীনা, এই বরণীয়া উজ্জ্বল-রূপসীর সঙ্গে প্রতিপক্ষতা করিয়া তাহার নিজের স্বামীকে রাখিতে হইবে! ফুল্লরার বক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। স্বামী ইহাকে স্বগুণে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন, এও কি প্রত্যয়যোগ্য কথা! তাহা না হইলেই বা ইনি সে কথা বলিবেন কেন? এরূপ রূপবতী, গুণবতী বড় ঘরের কন্যা কি এমন একটা মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিবেন?

বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে ফুল্লরা রূপসী।
নয়নের জলেতে মলিন মুখ-শশী॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন।
শীঘ্রগতি গোলাঘাটে দিল দরশন॥

তখন অপরাহ্নে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়া আছেন। গোলাঘাট হইতে কালকেতু প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে ফুল্লরাকে দেখিতে পাইল। স্বামীকে দেখিয়া ফুল্লরা কাঁদিতে লাগিল, এমন স্বামী নাকি তাহার পর হইবে, এই মনে হইয়া তাহার চক্ষে অবিরল জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেন শৈল ভেদ করিয়া নদীনীর ছুটিল। ফুল্লরা এই দুঃখের কথা স্বামীকে কহিবে কোন্ মুখে? লজ্জায় জিহ্বা আড় হইল। শিশু যেরূপ দারুণ আঘাত পাইয়া মায়ের নিকট কাঁদিতে থাকে, ফুল্লরা স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তেমনই কাঁদিতে লাগিল।

ফুল্লরার এমন দুঃখ-বেগ কালকেতু কোন দিন দেখে নাই; ব্যাধ-বধূ

সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, এ সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিল কিসে? বিস্মিত হইয়া কালকেতু জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শাশুড়ী ননদী নাই, সতিনী নাই, কা'র সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া এরূপ দুঃখ পাইয়াছ?"

ফুল্লরা কাঁদিয়া বলিল, "আমার ননদী কি সতিনী নাই। বন্ধু হইলেও তুমি, শত্রু হইলেও তুমি। আজ আমার প্রতি বিধাতা বিমুখ হইয়াছেন। তুমি কাহার সুন্দরী কন্যা ঘরে লইয়া আসিয়াছ? তোমার নিষ্পাপ চরিত্র, আজ হতে তুমি পাপে মন দিয়াছ, পিঁপ্ড়ার পক্ষ মৃত্যুর জন্য হয়, তুমি কি এই কার্য্যে সুখী হইবে? কলিঙ্গরাজার বড় কঠোর শাসন, তিনি শুনিলে এখনি তোমাকে হত্যা করিয়া আমার জাতি নষ্ট করিবেন।"

কালকেতু এইবার ক্রুদ্ধ হইল, সে ফুল্লরার এই মিথ্যা সন্দেহে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, এই কি রহস্যের সময়? সে বলিল, "সত্য কথা বল। কাহার কন্যা আবার আমি ঘরে লইয়া আসিব? মিথ্যা কথা বলিলে এখনই চোয়াড়ে তোমার নাসিকাচ্ছেদ করিব।"

ফুল্লরা স্বামীর এই ক্রোধ দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল, অপরিচিতা সুন্দরী যে তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারণা করিয়াছে, তাহা অতি স্পষ্ট ভাবে বুঝিল। মনে ভাবিল সন্দেহ অমূলক প্রতিপন্ন করিবার জন্য যদি সত্যই আমার নাসিকা ছেদন করিতে হয়, তাহাতে আনন্দের সহিত সম্মত আছি। কালকেতুর ক্রোধ দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া ফুল্লরা বলিল, "চল গৃহে যাই, আমি তোমাকে সেই রূপসী কন্যাকে দেখাইব।"

কুঁড়ের সন্নিহিত হইয়া তাহারা দেখিল,—অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক মাণিক্যহার ও মালতী মালা-বিজড়িত ঘন মেঘ সদৃশ নিবিড় কুন্তলরাজি এলায়িত করিয়া দেবী দাঁড়াইয়া

আছেন। সেই অস্তগামী সূর্য্য যেন কুন্তলরাজিকে বারংবার প্রণাম জানাইয়া উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে,—ডুবন্ত রৌদ্রের আলোকে স্বর্ণসূত্র-চিত্রিত মণিবিজড়িত রক্তপট্টবস্ত্রাঞ্চল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে; দেবীর মরাল-গ্রীবা ঈষৎ বক্রভাবে কুন্তলভার বহন করিতেছে, দেহশ্রীর সমুন্নত সৌন্দর্য্য বিশ্বের নমস্য ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। সন্ধ্যাদেবী যেন সেই সূর্য্যাস্তের হোমাগ্নি-পার্শ্বে পর্য্যাপ্ত ধূম্রপটলের ধূপ করে লইয়া সেই বরাননার আরতি করিতেছেন।

কালকেতু সেই রূপ দেখিয়া ভীত হইল, সৌন্দর্য্যের প্রখর তেজে তাহার মস্তক নত হইল,—সে বলিল, "আপনি আমার এ গৃহে কে? এ কি আমার চক্ষুর বিভ্রম?" চণ্ডী কালকেতুর দিকে কৃপা-দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ঈষৎ হাসির রেখায় পক্কবিম্ব সদৃশ ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া মৌনমুখী হইয়া রহিলেন।

কালকেতু এই ললনার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "আমি ব্যাধ, এই কুঁড়ে শ্মশান-সদৃশ, ইহা অতীব অশুচি। ইহার চতুর্দ্দিকে পশুর হাড়, এ স্থানে কেহ প্রবেশ করিলে তাহাকে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতে হয়, এমন স্থানে আপনি কেন? আপনি যদি স্বগৃহের পথ ভুলিয়া হেথায় আসিয়া থাকেন, তবে বলুন—আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব, আমি একা যাইব না,—কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া যাইব। ফুল্লরাও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং আমি ধনু ধারণ করিয়া আপনার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইব।"

দেবী কোনই উত্তর করিলেন না,—চক্ষু অবনত করিয়া সেই কুঁড়ের পার্শ্বে স্থির সৌদামিনীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি যে সে স্থান ত্যাগ করিবেন, তাঁহার ভাবে সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কালকেতু আবার বলিল,—"আপনার অভিপ্রায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পুরাতন বস্ত্র এবং স্ত্রীলোকের জাতি বহুকষ্টে রক্ষা পাইয়া থাকে। আপনি এগৃহে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিবেন না। এখনও রাত্রি হয় নাই, রাত্র হইলে দুষ্ট লোকেরা নানা কথা রটনা করিবার সুযোগ পাইবে। কলিঙ্গরাজের শাসন অতি কঠোর, তাঁহার কর্ণে কোন কথা পঁহুছিলে আপনার পক্ষে বড়ই অশুভকর হইবে। আপনি বড় লোকের কন্যা, বড় লোকের বধূ—আপনাকে আমি আর কি বলিব।"

দেবী স্বীয় বিশাল আলুলায়িত কুন্তলরাজি বামহস্তে পৃষ্ঠ হইতে আনয়নপূর্ব্বক দক্ষিণ করাঙ্গুলী দ্বারা তাহা মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন, শুভ্র অঙ্গুলীগুলি নিবিড় মেঘসদৃশ কৃষ্ণ-কেশদামে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিতে লাগিল। তাঁহার গণ্ডে সূর্য্যের শেষপ্রভা পড়িয়া একটা সকৌতুক সুমধুর হাসির অস্পষ্ট কুঞ্চনকে ব্যক্ত করিয়া দেখাইতে লাগিল। কালকেতুর উক্তিগুলি যে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, এমন কোন লক্ষণই বোঝা গেল না।

তখন কালকেতু ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, সে বলিল, "আপনার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমার কুটীর পরিত্যাগ করুন। আমরা স্ত্রীপুরুষ সমস্ত দিনের উপবাসী, আপনার রহস্য অসহ্য হইয়াছে, আপনি গৃহ ছাড়ুন।"

চণ্ডী তথাপি মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল যেন কালকেতু অপর কাহাকেও সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছে।

তখন ব্যাধ-তনয় অস্তগামী সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তুমি সাক্ষী, আমার কোন অপরাধ নাই।" সে তাহার ধনুখানি গ্রহণ করিয়া

দেবীকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে একটা খর বাণ মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু এ কি! বাণের সঙ্গে হস্ত আবদ্ধ হইয়া রহিল! অকস্মাৎ নিগূঢ় অজ্ঞাত কারণে তাহার শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, দরদর ধারে চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ্‌ হইল; কাহার মহামায়া তাহাকে অধিকার করিয়া চিত্তভাবের বিপর্য্যয় ঘটাইল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। সে হাত হইতে ধনু ফেলিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু শর-ধনু হাতে আট্‌কাইয়া রহিল। বিস্মিত হইয়া ফুল্লরা বীরের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

কালকেতুকে বিপন্ন দেখিয়া চণ্ডী বলিলেন, "ব্যাধ-তনয়! আমি চণ্ডিকা,—তোমার ও ফুল্লরার ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর।"

কালকেতু গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "আমার মনে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইতেছে, আজ সকালবেলা যখন শিকার করিতে যাত্রা করি, তখনও এইরূপ একটা আনন্দের পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলাম; কিন্তু আনন্দ-ময়ী কেন আমার এ গৃহে পদার্পণ করিবেন? আমি হিংসামতি ব্যাধ, অতি নীচজাতি, চণ্ডীর এ গৃহে আসা কি সম্ভব পায়? আপনি শরস্তম্ভ বিদ্যা জানেন, এজন্যই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছেন: আপনি যদি সত্য সত্যই চণ্ডী দেবী, তবে একবার দশভুজারূপে আমাদিগকে দর্শন দান করুন, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যয় হইবে।"

তখন সহসা সেই রূপসী মূর্ত্তি বিশালতরা হইয়া গগন চূড়াবলম্বী হইল; মস্তকের বহুকারু-খচিত মুকুট মেঘস্পর্শ করিল; মুখ-মণ্ডল বৃহৎ সুব্যক্তরূপে মাতৃভাবব্যঞ্জক অথচ রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় মহিমান্বিত হইল; পৃষ্ঠদেশের কেশপাশ সূর্য্যকরোদ্ভাসিত মেঘ-শলাকার ন্যায় দশদিক্‌ব্যাপী

দশহস্তের অন্তরাল হইতে প্রকাশিত হইল, দশবাহু বিচিত্র আভরণ-ভূষিত হইয়া আয়ুধরাশিতে শোভমান হইল ; বাম দিকের পঞ্চ হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, খেটক ও ধনু এবং দক্ষিণদিকের পঞ্চ হস্তে অসি, চক্র, শূল, শক্তি ও শর—এই দশ প্রহরণ উজ্জ্বলপ্রভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

সেই মহামূর্ত্তির দক্ষিণ পদতলে সিংহ, বাম পদতলে অসুর এবং ঊর্দ্ধে স্তিমিত নেত্রে শিব। ব্যাধ-তনয় ও ফুল্লরা দেখিতে পাইল, এই মহামূর্ত্তি যেন জগদ্ধাত্রী, মহাশক্তিরূপে—অপূর্ব্ব করুণায় এবং কঠোর শাসনে জগৎকে পালন করিতেছেন; তাঁহার দীপ্ত মূর্ত্তির নিকট কুসুমস্তবকমণ্ডিতা ধরণী যেন বিরাট নৈবেদ্যের ন্যায় পড়িয়া আছে—যেন সেই শক্তি অযাচিত করুণায় ও মহিমায় দিগ্-দিগন্তের মাতৃক্রোড় ও বলদৃপ্ত বাহু প্রসারণ করিয়া আছে। রাজরাজেশ্বর ও পথের ভিখারী সেই শক্তির তুল্যরূপ আশ্রয়লাভ করিতেছে। কালকেতু দেখিল, দুর্ব্বল বলিয়া কেহ ঘৃণার্হ নহে ; কারণ সেই শক্তি অপার করুণায় দুর্ব্বলের সহায় হইয়া আছেন। যাহা অশুচি, কুৎসিত—তাহারও অণুতে অণুতে সেই শক্তি, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছেন,—তাঁহার সমুজ্জ্বল কারু-কার্য্যখচিত মণিরত্নময় পটাঞ্চল জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। পার্থিব শোভা-সম্পদ তাঁহারই বিম্বাধরের কৃপাহাস্তে পলকে পলকে বিকাশ পাইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে জগৎ জুড়িয়া চণ্ডিকা-মূর্ত্তি বিরাট্‌ভাবে প্রকাশিত হইলেন, অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্য তাঁহারই মুকুটের মত দেখা যাইতে লাগিল,—দূরবনের প্রস্ফুট চম্পকরাজি এবং অতসীকুসুমগুচ্ছ তাঁহারই গণ্ডের দীপ্তির সঙ্গে মিলাইয়া গেল। বিপুল কেশরাজি নিবিড় মেঘমণ্ডলের সঙ্গে এক হইয়া গেল।

পাদপদ্মের অলক্তকরাগ জল-স্থলের শত শত পদ্মপুষ্পের প্রভার সঙ্গে মিশিয়া গেল। দশ হস্তের দশ প্রহরণ বজ্র, বিদ্যুৎ, পর্ব্বতধাতু ও বনকণ্টকে লীন হইয়া গেল। শুধু সিংহ ও অসুরের পাশব শক্তি—ব্যাধ-তনয় নিজের দেহে অনুভব করিল, তাহাদের একজন দেবীর প্রসাদ-মাল্য কণ্ঠে পরিয়া জগতে তাহারই আদেশে কার্য্য করিতেছে—অপরটি তাঁহার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া দেবী-নিক্ষিপ্ত শূল বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে জগতের সঙ্গে দেবীর অপূর্ব্ব রূপ মিশিয়া গেল। কালকেতু ও ফুল্লরা দেখিতে পাইল, দেবী সেই সুন্দরী রমণী-বেশে কুঁড়ের পার্শ্বে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন ব্যাধ-পুত্র সস্ত্রীক সেই বরবর্ণিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল ও বলিল, "সার্থক আমার ব্যাধ-জন্ম, আমি তোমায় দেখিলাম।"

দেবী বলিলেন "এই অঙ্গুরীটি তোমায় দিলাম এবং দাড়িম গাছের নীচে সাত ঘড়া মাণিক্য আছে, তুমি তাহা তুলিয়া লও। তুমি কলিঙ্গ-রাজ্যের অদূরে দ্রাবিড়-দেশে জঙ্গল কাটাইয়া রাজত্ব স্থাপন কর। আর পশুহিংসা করিও না, ফুল্লরাসুন্দরী অগ্রসর হইয়া দেবী-প্রসাদ অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিল, কালকেতু ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে মূক হইয়া রহিল। যখন দেবীর রূপ ক্রমেই স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হইয়া সান্ধ্য গগনের শেষ আলোর সঙ্গে একবারে মিশাইয়া অদৃশ্য হইতে উদ্যত হইল, তখন যেখানে দেবীর পাদ-পদ্মের ছটা পড়িয়াছিল, সেইস্থানে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া কালকেতু সকাতরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "মা আমি অঙ্গুরীয়ক চাই না, সাত ঘড়া মাণিক্য চাই না, আমি তোমার জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি আর একবার দেখিব।"

৫

রাত্রে কোদালী, খন্‌তা ও ঝুড়ি লইয়া স্বামী স্ত্রী দাড়িম গাছের নীচের মাটী খুঁড়িয়া সাত ঘড়া মাণিক্য পাইল। এই বিপুল অর্থ তাহারা রাখিবে কোথায়? কালকেতু উহা যেখানে পাইয়াছিল সেইখানে মাটী চাপা দিয়া রাখিল ও দূর্ব্বাপূর্ণ মৃত্তিকা উহার উপর চাপাইয়া স্থানটী গোপন করিয়া রাখিল।

পর দিন প্রভাতে কালকেতু অঙ্গুরীটি ভাঙ্গাইবার জন্য মুরারিশীলের বাটীর দিকে গমন করিল। কিরাতনগর ছাড়িয়া পদ্মালয়া-পল্লীতে মুরারিশীল বাস করে। কালকেতু তথায় যাইয়া 'খুড়া খুড়া' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মুরারিশীল কালকেতুর মাংসের বাবদ আড়াই বুড়ি কড়ি ধারিত, কালকেতুর স্বর শুনিয়াই বেণে অন্তঃপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। মুরারির অসংখ্য অর্থ, অথচ একটি ভৃত্য নাই। বেণেনী বাহিরে আসিয়া বলিল, "তোমার খুড়া প্রাতে উঠিয়া খাতক-পাড়া গিয়াছে, মাংসের দামটি এখন পাবে না। আজ বন থেকে একভার কাঠ ও এক ঝুড়ি কুল লইয়া আসিও; কাল তোমার হাল-বাকী শোধ করিয়া দিব। পোদ্দার বাড়ী আসিলে তাহাকে তোমার কথা বলিব।"

কালকেতু বলিল, "আজি বাকী কড়ির জন্য আসি নাই,—একটি অঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার জন্য আসিয়াছিলাম, তা কা'ল বাকী কড়ি দিও, আজ এখন আসি খুড়ি, তোমাকে নমস্কার করি।" অঙ্গুরীর কথা শুনিয়া বণিক-নিতম্বিনীর মুখে একটা সকৌতুক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল সে বলিল, "বাছা, অঙ্গুরীটি একবার দেখাইয়াই যাও না।" এদিকে ঘরের এক ছিদ্র পথে কাণ পাতিয়া মুরারি এই কথোপকথন শুনিতেছিল; সে

ধনের লোভে নিক্তি, ওজন করিবার তাম্র-খণ্ড, কতকগুলি কড়ি, ধান ও কুঁচ লইয়া খিড়্কীর পথে বাহির হইল।

মুরারির বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে। সে শাস্ত্র-কারদের শাসন মানিয়া বনে যায় নাই; যখন ডাক পড়িবে, তখন একবারে শ্মশানঘাটে যাইবে, মাঝামাঝি কোথাও থাকা তাহার অভিপ্রেত নহে। তাহার মুখে ও ললাটে শতগ্রন্থি জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় বহু কুঞ্চনের রেখা পড়িয়াছে; অর্থই তাহার একমাত্র উপাস্য: এই অর্থে তাহার কোনই সুখভোগ হয় নাই, কেবল দিন রাত্রি সেই অর্থ রক্ষা ও বৃদ্ধির চেষ্টায় দুশ্চিন্তা লভ্য হইয়াছে; —তাহাতেই সে একান্ত জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যখন ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে যায়, তখন উহা ভাত কি মাটি তাহার দিকে লক্ষ্য থাকে না, কোন্ খাতকের নিকট কত সুদ প্রাপ্য হইয়াছে, তাহারই চক্রবৃদ্ধি করিতে থাকে এবং দীন দুঃখী মূর্খ পল্লীবাসী তাহার নিকট যে কড়ি ধার নিয়াছে, তাহার কতকাংশ শোধ দেওয়ার সময় সে যে চতুরতা করিয়া খাতায় প্রদত্ত কড়ির সিকি মাত্র জমা দিয়াছে—ইহাই মনে ভাবিয়া তাঁহার জটিল কুটিল গোঁফের মধ্য দিয়া একটা হাসির বিজলী-রেখা খেলিতে থাকে।

মূর্ত্তিটি বেঁটে মত, গায় অনেক লোম আছে। পরিধেয় বস্ত্র অতি মলিন ও স্বেদ-সিক্ত। খিড়কী-পথে বাহির হইয়া মুরারি বলিল, "এই যে ভাইপো, আমি এই বাড়ী ফিরিলাম, একেবারেই যে দেখা সাক্ষাৎ কর না, ব্যাপারখানা কি?"

কালকেতু বলিল, "দিনটা মৃগয়া করিতেই কাটিয়া যায়, কোন্ সময়েই বা দেখা করি? তা' যাক্, আমি এই অঙ্গুরীটা ভাঙ্গাইব, খুড়া, তুমি ইহার উচিত মূল্য দিলে বড়ই উপকৃত হইব।"

বেণে নিক্তিটাকে প্রণাম করিয়া সূত্রগুলি লাগাইয়া কতকগুলি ধান ও কুঁচ রাখিয়া অপর দিকে অঙ্গুরীটি স্থাপন করিল, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নিক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "ওজনে ত ষোল রতি দুই ধান হইল। কিন্তু এই অঙ্গুরী স্বর্ণও নহে রৌপ্যও নহে, কাঁসারিটোলার যে সরস পিত্তল—ইহা তাহাও নয়, বেঙ্গা পিত্তলটা ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিয়াছ। প্রতি রতির মূল্য দশ গণ্ডা হিসাবে অষ্ট পণ হয়, আর দুই ধানের দাম পাঁচ গণ্ডা; অঙ্গুরীয়ের মূল্য অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা,—তুমি মাংসের দাম বাবদ্ দেড় বুড়ি পাইবে, একুনে অষ্ট পণ আড়াই বুড়ী তোমার প্রাপ্য; সবই কড়ি নিলে চলিবে কেন? কিছু চাউল, ক্ষুদ্ ও কিছু কড়ি হিসাব করিয়া লও।"

কালকেতু জানিত—দেবীর প্রসাদ-চিহ্ন এই অঙ্গুরীয়ক বহুমূল্য। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "খুড়া, এ অঙ্গুরী তুমি কিনিবে না বুঝিয়াছি, ফিরাইয়া দাও, চলিয়া যাইতেছি।" মুরারি কর্ণের প্রান্তভাগে কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "আরও পাঁচবট বেশী দিব, আমার নিকট কপট ব্যবহার পাইবে না, তোমার পিতা ধর্ম্মকেতু-ভায়ার সঙ্গে আমার লেনা-দেনার কারবার ছিল,—তুমি দেখিতেছি, তাহাকেও হিসাবে ছাপাইয়া উঠিয়াছ।" কালকেতু বলিল,—"খুড়া, তোমার সঙ্গে ঝগড়া হইবে দেখিতেছি, আংটী ফিরাইয়া দাও, আমি অন্য বণিকের বাড়ী যাই।" তখন বেণে আগ্রহের সহিত বলিল,—"পাঁচবট আরও বেশী দিব। চাউল ও ক্ষুদ যদি না লইতে চাও, ভাল, আমি সমস্তই কড়িতে দিতেছি।"

সেদিন আর অঙ্গুরী বিক্রয় করা হইল না। বেণের হাত হইতে অঙ্গুরী কাড়িয়া কালকেতু প্রস্থান করিল। নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধির মত বেণে

বসিয়া রহিল। বেণেনী বলিল, "ভাবছ কি? অঙ্গুরীয়ের মধ্যে যে হীরা-খানি আছে, এত বড় হীরা আমি দেখি নাই। তুমি একেবারে বিনামূল্যে উহা হস্তগত করিতে চাহিয়াছিলে, তাহা কি কখন হয়? এখন নিধিবেণে ও শঙ্খদত্ত উহা টের পাইবার পূর্ব্বে তুমি যাইয়া এক কোটি টাকা দিয়া উহা কিনিয়া আন। কলিঙ্গরাজা এরূপ হীরা পাইলে যে দাম চাহিবে, তাহাই দিবেন।"

অনেক দর কষাকষির পর শঙ্খদত্ত সাতকোটি টাকায় কালকেতুর নিকট হইতে অঙ্গুরীটি ক্রয় করিলেন। কালকেতু দ্রাবিড়-দেশের এক বিপুল ভাগে জঙ্গল কাটাইয়া রাজ্যস্থাপন করিল।

এই সময়ে কলিঙ্গরাজ্য বন্যার জলে ভাসিয়া গেল। তথাকার প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দ্রাবিড়ে আসিয়া বাস স্থাপন করিল। দেখিতে দেখিতে কালকেতুর অধিকার ঐশ্বর্য্য ও ধনধান্যশালী হইয়া একখানি সুখের চিত্রপটের মত দেখা যাইতে লাগিল। তাহার রাজ্যে বিচিত্র কারুখচিত দেবায়তন, জলদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ প্রভৃতি চতুর্বিধ কৃত্রিম দুর্গ, নৃত্য-গীতমুখর রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র শিল্পশালা প্রভৃতি দেখিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে হইতে লোকগণ সমাগত হইত।

ব্রাহ্মণগণ কালকেতুর কুলজীতে তাহাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। সুতরাং মুখর্টি, চাটুতি, গাঙ্গুলী, ঘোষাল, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল প্রভৃতি শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ তাহার সভার শোভাবর্দ্ধন করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। সোমাই ওঝাকে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে চালাইয়া লইলেন। রাজপুত সৈন্যগণ ব্যাধনৃপের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিল। মাথায় উষ্ণীষ ও কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা পরিয়া ভিষক্‌গণ রাজগৃহের এক বিভাগে

নানা প্রকার ঘৃত, মোদক ও তৈল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কর্ণে কলম ও ছাতি-হস্তে বহুসংখ্যক কায়স্থগণ খাজাঞ্চিখানা, তোষাখানা প্রভৃতি নানা বিভাগে হিসাবপত্র ও দলিল লইয়া আনাগোনা করিতে লাগিলেন।

রাজা স্বয়ং ভাস্করগণের উৎসাহার্থ নানা প্রকার অনুষ্ঠানে তৎপর রহিলেন। তাঁহার উৎসাহে তন্তুবায়গণ এরূপ উৎকৃষ্ট সূত্র বয়ন করিতে শিখিল যে, তাহার অস্তিত্ব ভালরূপ অনুভব করিতে হইলে চক্ষে কাচ পরিতে হইত। সেই সূত্রে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, তাহা কোন স্বপ্নময় পরী-পুরীর সামগ্রীর ন্যায় সুন্দর ও সূক্ষ্ম হইত। একদিন কালকেতুর অশ্ব একখানি বিস্তৃত বস্ত্রের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, বস্ত্রখানি অশ্বের খুরে জড়াইয়া গিয়াছিল অথচ তাহা কেহই টের পায় নাই, তন্তুবায় চীৎকার করিয়া আবেদন জানাইলে অশ্বটি থামাইয়া তাহার অশ্বের খুরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে পূর্ণ মাপের একখানি বস্ত্র আবিষ্কৃত হইল। তাহা তন্তুবায় ঘাসের উপর শুকাইতে দিয়াছিল, হিম পড়াতে তাহা ঘাসের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছিল। এই বস্ত্র জগতের সর্ব্বদেশের লোকেরা উন্মত্তবৎ অপ্রমেয় মূল্যে ক্রয় করিত এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোন দেশের রুচি-পরায়ণ সতর্ক বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই অক্ষেপ করিতেন যে, উক্ত বস্ত্রে মহিলাগণের নগ্নতা কোন ক্রমেই আচ্ছাদিত হয় না, এরূপ বস্ত্র-ব্যবহার দুর্নীত,—যতই তাঁহারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেন, সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে এই বস্ত্রের বিক্রয় ততই বৃদ্ধি পাইত।

দ্রাবিড়-রাজ্যে অনেক স্থলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের নানা প্রকার থালা ও পাত্র বিক্রীত হইত। স্বর্ণ-থালায় যে কারুকার্য্য থাকিত, অন্য কোন

দেশে তাহার অনুকরণ হইত না; এমন সূক্ষ্ম সুন্দর কার্য, এমন মার্জ্জিত শিল্প জগতের অন্যত্র দুর্লভ ছিল।

কালকেতুর উপর প্রজাগণের অপার ভক্তি ছিল। কালকেতু পূর্ব্বের অভ্যাস ঠিক রাখিয়া তৃতীয় প্রহরে আহার করিত, আহারের পূর্ব্বে কিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিত, "আমার রাজ্যে অভুক্ত কেহ আছে কি না?" ইহা নির্ণয় করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই শত শত দৌবারিক রাজ্যের সর্ব্বত্র সন্ধান করিয়া সংবাদ আনয়ন করিত, একটি প্রজা অভুক্ত থাকিলেও কালকেতু অন্ন গ্রহণ করিত না, আর কালকেতুর প্রসাদ ভিন্ন ফুল্লরার কোন প্রকার খাদ্যে রুচি ছিল না।

৬

কিন্তু বিশালপুরীর এই ঐশ্বর্য, এই আশ্চর্য্য অবস্থার পরিবর্ত্তনে কালকেতুর কি কোন স্বভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে? যতই ঐশ্বর্য্য বাড়িতেছে, কালকেতুর ততই পৃথিবীর প্রতি উপেক্ষার ভাব আসিতেছে; সে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে পুরীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে চিন্তান্বিত হয়।

ফুল্লরার রূপেও ত ভাটা পড়িয়াছে। বসনে, ভূষণে, ও পরিচ্ছদের প্রাচুর্য্যে সে ভাটার মুখ বন্ধ হয় না। এই কি আমার সেই ফুল্লরা, কুঁড়ে ঘরে মলিন বস্ত্র পরিয়া যে রূপের ডালির ন্যায় ছিল, এই কি সেই ফুল্লরা?

এ দেশে সূর্য, উঠিয়া অস্ত যায়, চন্দ্রকে রাহুতে গ্রাস করে, যে ফুলটি যত রূপের ও সুরভির ঘটা করিয়া ফোটে, তাহা তত শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

নিত্য, অপ্রমেয়, ধ্রুব কি জিনিষ তাহার ছিল, সে তাহা কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে, সে যে শাপভ্রষ্ট ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বর, ফুল্লরা যে দেব-রাজ্যের পুত্রবধূ ছায়াবতী, এ কথা স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে না ;—কিন্তু যতই তাহারা শাপের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল, ততই তাহাদের পার্থিব সুখ যেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হইতে লাগিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী ক্রীড়াশীল বালক যেরূপ সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে শব্দ শুনিয়া ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই আহ্বান শুনিতে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়ায়, কালকেতুও সেইরূপ সাংসারিক সুখ-ভোগের মধ্যে অকস্মাৎ চিন্তান্বিত হইয়া কোন অজ্ঞাত দেশের আহ্বান শুনিতে ব্যস্ত হইত!

ফুল্লরার মনেও সেইরূপ ভাব সময় সময় উপস্থিত হয়, কিন্তু পরস্পরের নিকট তাহারা তাহা ব্যক্ত করে না।

একদিন কালকেতু ফুল্লরাকে বলিল, "যখন কিরাতনগরে ছিলাম, তখন জীবনের প্রতি একটা আগ্রহ ছিল। শিকারান্তে তুমি যাহা খাইতে দিতে, তাহা কত তৃপ্তির সহিত খাইতাম ; এখন নিজের সুখলালসায় তদ্রূপ আগ্রহ নাই ;—যখন অনাথমণ্ডপে অনশন-কৃশব্যক্তিদিগকে তৃপ্তির সহিত খাইতে দেখি, তখন একটা আনন্দ হয়, নিজে আহার করিয়া আর সেরূপ তৃপ্তি পাই না। এই সকল পরিচ্ছদের ও মণিমুক্তার বাহুল্য আমার অসহ্য হইয়াছে। রাস্তায় যে সকল বস্ত্র-প্রত্যাশী দিগম্বর ব্যক্তি ঘুরিয়া বেড়ায়, অনেক সময় আমি স্বহস্তে এই সকল উজ্জ্বল পরিচ্ছদে তাহাদিগকে সাজাইয়া দেখিয়াছি—তাহাতে অনেকটা আরাম পাইয়াছি, কিন্তু আমার আর এ সুখভোগ ভাল লাগে না। আমি তোমায় কি বলিব, কোন বিস্মৃত কথা নিরন্তর আমার মন স্মরণ করিতে চাহে, তাহা সম্পূর্ণ স্মরণে না পড়ায় আমার মনে অহর্নিশ একটা খেদ

বিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জীবন ভরিয়া আমি যেন কি হারাণো জিনিষ খুঁজিয়া মরিতেছি;—ফুল্লরা আমায় বিদায় দাও, আমি বনে যাইয়া তপস্যা করিব।"

তখন ফুল্লরার গ্রাবা উন্নত হইল, তাহার বিধুমুখ শুকাইয়া গেল, লম্বিত কেশরাজি গণ্ডের এক পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল—সে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাকে ফেলে কোথায় যাইবে, তোমার সঙ্গে কি আমার এ জন্মের মাত্র সম্বন্ধ? ঐ যে আমি ঠিক দেখিতেছি, সে কি দিব্যধাম, কোথা হইতে আমরা কোথায় পড়িয়াছি?" ফুল্লরার অক্ষিতারা নিশ্চল হইয়া মেঘ-মালার দিকে আবদ্ধ হইয়া রহিল। অঙ্গুলী-সঙ্কেতে সে যাহা দেখাইতে চাহিল, সেই মুহূর্ত্তে কালকেতু তাহা স্পষ্ট দেখিল। উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া তথায় পড়িয়া রহিল।

৭

যখন দ্রাবিড়ে রাজ্যের পত্তন হয়, তখন, ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর কতকটা সহায়তা করিয়াছিল, সে কপালে ফোঁটা পরিয়া লম্বমান কোচা ও কর্ণে বংশ-কলমসহ যে মূর্ত্তিতে কালকেতুর দরবারে প্রথম দেখা দিয়াছিল, তাহাতে অনেকের প্রথম হইতে বিশ্বাস হইয়াছিল, সে ধূর্ত্তের সেরা। নিজ কুলের সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। আমলহাঁড়ার দত্তগোষ্ঠীর কায়স্থ-সমাজে স্বীয় প্রতিপত্তির অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রদানপূর্ব্বক নিজের দুই বিবাহের কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিল,—তাহার প্রথমা পত্নী ঘোষ-কন্যা, দ্বিতীয়া বসু-কন্যা এই—কৌলিন্য সম্বন্ধসূত্রে গঙ্গার দুই তীরবর্ত্তী সমস্ত কায়স্থেরা তাহার বাটীতে খাইয়া থাকেন। মিত্রকুলে

তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, সুতরাং এমন কায়স্থ কেহ নাই, যিনি বলিবেন তাঁহার গৃহের পক্কান্ন তিনি খাইবেন না,—স্বয়ং রাঁধিয়া খাইবেন।

কুলশীলের বড়াই করিয়া সে তাহার বৈষয়িক বুদ্ধির প্রশংসা যথেষ্ট করিয়াছিল। তাহার প্রত্যেক কথায় সায় দিবার জন্য তাহার শ্যালক রামনন্দী তথায় উপস্থিত ছিল।

কালকেতু তাহাকে কাজের লোক মনে করিয়া খুব খাতির করিল, এমন কি পাত্রের পদ তাহাকেই দিয়া ফেলিল। ফুল্লরা কিন্তু বলিয়াছিল "মিন্সের প্রকৃতিটা ভাল বলিয়া বোধ হয় না।" কিন্তু যখন ভাঁড়ুদত্ত বুলান মণ্ডলকে হাত করিয়া কলিঙ্গের অর্দ্ধেক প্রজা ভাঙ্গাইয়া আনিল এবং উচ্চ নিরিখে জমি বিলি করিতে লাগিল, তখন ফুল্লরাসুন্দরী চুপ হইয়া গেল এবং কালকেতু ভাঁড়ুর উপর অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করিল।

ক্রমেই যত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, ততই ভাঁড়ুর নিজমূর্ত্তি যথাযথ-বর্ণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে রাজধানীতে এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিল যে, প্রজাগণের দুঃখের পরিসীমা রহিল না,—তাহারা রাজার নিকট আবেদন করিতে গেলে ভাঁড়ুদত্তের আদেশে দৌবারিকগণ প্রজাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক তাড়াইয়া দেয়। কোন ক্রমেই রাজার কর্ণে তাহাদের দুঃখের কথা পৌঁছাইতে পারে না।

একদিন সায়ংকালে কালকেতু উদ্যানে বেড়াইতেছে, এমন সময় শত শত প্রজা তাহার উদ্যানবাটী ঘিরিয়া ফেলিল। ভাঁড়ুদত্ত তাড়িয়া যাইয়া রাজার নিকট তাহারা বিদ্রোহী প্রজা বলিয়া রটনা করিল এবং তাহারা তাহাকে হত্যা করিতে জড় হইয়াছে, নানা ছন্দে ও

বাক্যকৌশলে এই কথা বুঝাইতে লাগিল। "রাজাবাহাদুর, আপনি পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করুন, আমি এখনি আমাদের দুর্জ্জয় চাঁড়াল সৈন্য লইয়া দুষ্ট প্রজাদিগকে উচিত শিক্ষা দিব।"

কালকেতু সেদিন ভাঁড়ুর কোন কথা শুনিল না। প্রজারা কেন আমায় হত্যা করিবে? প্রজারঞ্জনের জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, আমি মুহূর্ত্তেকের জন্যও তাহাদের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট কামনা করি নাই, তাহারা কেন আমাকে বধ করিতে চাহিবে? ঐ দেখ কেহ কেহ কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার দিকে সকাতর ভাবে চাহিতেছে, উহাদের ব্যথিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যদি সত্যই কেহ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, তবে কালকেতু-ব্যাধ একাই সহস্রকে শাসন করিতে জানে। ভাঁড়ুর বাক্য-কৌশল ব্যর্থ হইল, কালকেতু কোন প্রকার আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া নির্ভীক ভাবে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইল।

এখন তাহারা এক বাক্যে ভাঁড়ুর প্রতি আক্রোশ জানাইতে লাগিল। ভাঁড়ু রোজ হাটে তোলা তুলিয়া লয়; ভাঁড়ুর এক রাঁড়ী ভগিনী আছে, সে বিক্রেতাগণের হাঁড়ি কাড়িয়া লইয়া যায়, রাজার পাইকগণ দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে। ময়রার গুড়, গোপের পশরা কিছুই হাটে থাকিবার উপায় নাই। চাউল-বিক্রেতার মাথা হইতে থলিয়া কাড়িয়া লয়, ভাঁড়ুর নিকট মূল্য চাহিতে গেলে সে উল্টিয়া মারিতে আসে। আর ভাঁড়ুনন্দন, ততোধিক। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, গৃহস্থের বধূগণ পুকুরে জল আনিতে গেলে, গাছ হইতে ঢেলা মারিয়া উপদ্রব করে। এ রাজ্যে আর বাস করিলে জাতি কুল ধন মান রক্ষা পাইবে না। আমরা হুজুরের নিকট হইতে বিদায় লইতে

আসিয়াছি। দরবারে দৌবারিকগণ আমাদিগকে ঢুকিতে দেয় না, এজন্য এভাবে সকলে একত্র হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি।"

কালকেতু ক্রোধে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। ভাঁড়ুদত্তকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, সে তাহার পরিবারবর্গ লইয়া পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল। কালকেতু অতি মিষ্টবাক্যে প্রজাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিযা যাহার যাহা ক্ষতি হইয়াছিল রাজভাণ্ডার হইতে তাহার দ্বিগুণ দেওয়ার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়া দিল। প্রজাগণ রাজার শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিল।

৮

ভাঁড়ু যাইয়া কলিঙ্গ রাজ-দরবারে উপস্থিত হইল। রাজা গির্দ্দের উপর ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার পায় মকমলী উপানহ এবং মাথায় রেশমী চীরের পাগড়ী, তাহাতে একটা বৃহৎ মাণিক্য সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছিল, হুজুরে শ্বেত চামরের ব্যজন হইতেছিল; এমন সময় সেই দরবারগৃহে প্রবেশ লাভ করিয়া ভাঁড়ু গড় হইয়া প্রণাম করিল। রাজার পাত্রকর্ত্তৃক দরবারে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভাঁড়ুদত্ত বলিল, "ধর্ম্মকেতু-ব্যাধের পুত্র কালকেতু-ব্যাধ হুজুরের রাজ্যের সীমান্তে রাজধানী স্থাপন করিয়াছে এবং হুজুরের রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজা ভাগাইয়া লইয়া গিয়াছে। বেটা কিরাতনগরে বনে বনে শূকর মারিয়া বেড়াইত এবং তাহার স্ত্রী ফুল্লরা হাটে হাটে মাংসের পশরা করিয়া ফিরিত। তাহার এতদূর স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে হুজুরের আদেশ গ্রহণ না করিয়া কিংবা কোন কর প্রদান না করিয়া সরকারের জায়গায় অধিকার স্থাপন

করিয়া মহল লুটিয়া খাইতেছে ও প্রজা ভাগাইতেছে। ইহাই নিবেদন করিতে আসিয়াছি।"

রাজা আসন হইতে ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তদ্দণ্ডে কোটালকে সংবাদ লইতে প্রেরণ করিলেন। সংবাদের সত্যতা নির্দ্ধারণ করা পর্য্যন্ত ভাঁড়ুদত্ত নজরবন্দী হইয়া রহিল। এক রাজ্যে দুই রাজা, এরূপ কথা কে শুনিয়াছে? দুশ্চিন্তায় সে রাত্রে কলিঙ্গরাজার নিদ্রা হইল না।

দুই দিন পরে সংবাদ আসিল, ভাঁড়ুদত্তের কথা ঠিক, অমনই যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ হইল।

সর্ব্বাগ্রে সেনাপতি রামচন্দ্র ভুঞে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া চলিলেন। তাঁহার বিশাল দেহের ভারে প্রমত্ত গজরাজও যেন কতকটা নুইয়া পড়িল। বাগ্দী ও চাঁড়াল সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের পরিধানে রক্তবস্ত্র, মাথায় জালের দড়ি, অঙ্গে রাঙ্গামাটি লিপ্ত, পায় নূপুর, খরসান রায়বাঁশ হস্তে, সোণার টুপি মাথায় পরা এবং হস্তস্থিত উচ্চ বংশদণ্ডে চামর ও নিশান লগ্ন। আশীগণ্ডা ঢোল বাজিতে লাগিল। দামামা ও দগড়ার শব্দে যোদ্ধৃ-হৃদয় মত্ত হইল। উটের উপর ডঙ্কা তুলিয়া বাদ্যকারগণ আড়াই হাত কাটী দিয়া বাজাইয়া দশদিক্ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। হর-সিকদার দশহাজার বন্দুকীর অগ্রে অগ্রে বক্ষঃ স্ফীত করিয়া চলিল এবং কমল-নিষাদ সঙ্গীনধারী পাইকের সর্দ্দার স্বরূপ তীর ও ধনু লইয়া যাত্রা করিল। 'মার' 'মার' করিয়া তীরন্দাজগণ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া চলিল, —স্বয়ং কলিঙ্গরাজ তাঁহার লক্ষ সৈন্যের পশ্চাৎভাগে দ্রাবিড়-রাজধানীর অদূরে শিবির স্থাপন করিলেন।

কালকেতুর সৈন্য-সংখ্যা অল্প ছিল না, তাহার নিজের অপ্রমিত বল ও দুর্জ্জয় সাহস ছিল। কিন্তু তাহার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হইল না—সহস্র সহস্র পশুহনন করার পর নরহনন-ব্যাপার তাহার চিত্তকে আর আকর্ষণ করিল না। ফুল্লরাকে নিভৃতে আনিয়া কালকেতু বলিল, "কলিঙ্গরাজ রাজ্যভার গ্রহণ করুন, আমাদের জীবনের যবনিকা এইস্থানে পতন হউক।"

তাহারা উভয়ে অন্তর্যামীকে সাক্ষী করিয়া প্রতিশ্রুত হইল, যতদিন এই দুঃখময় ধর‍্যাধামে থাকিবে, ততদিন আর সংসারের কোন বিষয়ে লোভ করিবে না।

সেই মুহূর্ত্তেই কালকেতু স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সে ইন্দ্রপুত্র ও ফুল্লরা তাহার সহধর্ম্মিণী ছায়াবতী ; মহাদেবের শাপের কথা মনে হইল। তখন ফুল্লরাসুন্দরী সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায়, সহিষ্ণুতার চিত্রপটের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইল এবং কালকেতু বিগতস্পৃহ সিদ্ধপুরুষের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া রহিল।

"এই যুদ্ধে আমার প্রজাবৃন্দের রক্তপাত হইতে দিব না" এই বলিয়া সে অশ্বারোহণে কলিঙ্গরাজার শিবিরে উপনীত হইল। সৈন্যগণ রাজার বিপদ্ আশঙ্কায় আকুল হইয়া আবদ্ধ সিংহের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

কলিঙ্গাধিপ দেখিলেন—কালকেতু-ব্যাধ দীর্ঘদেহ। তাহার মস্তকে রাজমুকুট, তাহা তাঁহার দণ্ডায়মান সচিববৃন্দের উষ্ণীষের দুই হস্ত উপরে বিরাজমান। তাহার বপুঃ সুগঠিত, কৃষ্ণবর্ণ ও জ্যোতিম্মান্। তাহার মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব প্রতিভা-দীপ্ত এবং বলশালী বাহুযুগ্ম শালপ্রাংশু, তাহা কোদণ্ড ধারণ করিয়া আছে—সেই কোদণ্ড যমদণ্ডের ন্যায় দেখাইতেছে।

তাহার কটিতে পীত কৌষেয় বস্ত্র, তাহা রত্ন-খচিত পটুয়াতে আবদ্ধ। সে ধীর ও ধ্রুব পাদক্ষেপে সেই সভায় উপনীত হইলে সকলের মনে সম্ভ্রমের ভাব জাগ্রত হইল। রাজা আশঙ্কায় স্বীয় কটিবদ্ধ কোষ হইতে অসি নিষ্কাসনের উদ্‌যোগ করিলেন। কালকেতুও রাজাকে যুদ্ধের রীতিতে নমস্কার করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনার কলিঙ্গ-রাজ্যাধিকারস্থ কিরাতনগরের প্রজা, আমি রাজদ্রোহী নহি, সুতরাং আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না। আপনি এই দ্রাবিড়-রাজ্য অধিকার করুন, প্রজাদিগের উপর কোন অত্যাচার না হয়—ইহাই প্রার্থনা।"

তখন চতুর্দ্দিকে সচিবগণ টিটকারী দিয়া উঠিল। ভীত হইয়া ব্যাধের পুত্র আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছে, অশক্ত হইয়া সাধু সাজিয়াছে। এত সাধুত্ব থাকিলে আদেশ ভিন্ন সরকারের এতটা জায়গা অধিকার করিয়া প্রজা ভাগাইয়া আনিয়াছিল কেন?

কালকেতু সচিবগণের প্রতি সঘৃণনেত্রে তাকাইয়া রাজার প্রতি দৃষ্টি-বদ্ধ করিল।

তখন রাজা বলিলেন, "তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ এজন্য প্রাণদণ্ড দিলাম না, কিন্তু তুমি আজন্ম শৃঙ্খলিত হইয়া বন্দীশালে থাকিবে, এই আমার আদেশ।"

যমদূতের ন্যায় কয়েকটা পাইক আসিয়া কালকেতুর হস্তপদ লৌহ-নিগড়ে বদ্ধ করিল। তিনহাত প্রস্থ, দুইশত হস্ত দীর্ঘ একটা পাষাণের ঘর, তাহাতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঢুকিতে হয়,—তথাপি মাথা ছাদে ঠেকে। সেই গৃহবরের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার,—তুষের ধূম্রে সেই ঘরখানি সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকে। ইহারই নাম বন্দীশালা। কালকেতুকে পাইকগণ ইহার মধ্যে পুরিয়া প্রস্তরখণ্ড বুকে চাপাইয়া দিল।

কালকেতু এই অবস্থায় চণ্ডীকে স্মরণ করিতে লাগিল। "আমার পশুহননের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমায় উদ্ধার কর, আমাকে ফুল্লরার সঙ্গে আনিয়া মিলাও। আমি এই শৃঙ্খল এখনই ভাঙ্গিতে পারি, এখনই কলিঙ্গরাজের পাইকগণকে হত্যা করিতে পারি, কিন্তু আমি আর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বসুন্ধরাকে রক্তরঞ্জিত করিতে চাহি না, আমার দৈহিক বল তুমি গ্রহণ কর। আমাকে জগতের এই বিষম যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর। আমি ব্যাধের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিয়াছি —কোন সুখ নাই। আমি রাজ্যেশ্বর হইয়া দেখিয়াছি—কোন সুখ নাই। এই আমার জীবন তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, আমাদের দুইজনকে এ ভবক্লেশ হইতে মুক্তি প্রদান কর।"

তখন কালকেতু বুঝিল সহসা অপূর্ব্ব পদ্মগন্ধে বন্দীশালা আমোদিত —কাহার রূপ কোটী চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা বিকীর্ণ করিয়া তাহার অঙ্গের জ্বালা ঘুচাইল? কিন্তু এ কি! চণ্ডীদেবী কাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আসিয়াছেন? তাঁহাব মুখপঙ্কজে পার্থিব ক্লেশের শেষ চিহ্ন বিরাজিত, দুইটি কৃষ্ণ বক্রাক্ষিপুট নিমীলিত। জন্মেব তরে ফুল্লরা চলিয়া গিয়াছে। তাহারই দেহ ক্রোড়ে লইয়া দেবী সমাগত।

কালকেতু উঠিয়া বসিল। মত্ত হস্তীর বলে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিল। মুষ্টির আঘাতে ছাদের কতকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সে মুক্ত আকাশের নীচে দেবীর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আমি চিনিয়াছি। আমার বিরহে ফুল্লরা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ব্যাধ হইয়া যখন বনে বনে শিকার করিতাম, তখন ছায়াবতী ফুল্লরা হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। যে দিন গৃহে খাইবার কিছু থাকিত না, তখন ছায়াবতী রন্ধনশালে ফুল্লরারূপে অন্নপূর্ণার কৃপায় আমার অন্ন-হাঁড়ী পূর্ণ করিয়া

রাখিত। আমি অভিশপ্ত হইয়াছিলাম, তথাপি ছায়াবতী স্বেচ্ছায় স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল,—আমাকে ছাড়া ছায়াবতীর অমরাবতী অসহনীয়। আমাকে ছাড়িয়া সে আজ স্বর্গে থাকিবে কিরূপে ?"

দেবী বলিলেন, "তোমারও দিন আসন্ন। অলকায় ছায়াবতী অগ্রে গমন করিয়া ভৃঙ্গ ভরিয়া মন্দাকিনীর জল রাখিতেছে, তুমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত, তাহা পান করিবে। পৃথিবীর বাসি ফুলের মালা তোমার কণ্ঠে ভাল লাগে নাই, সেইজন্য অম্লান পারিজাত-পুষ্পের মালা গাঁথিয়া রাখিতেছে।"

সেই রাত্রে কলিঙ্গ-রাজা স্বপ্নে দেখিলেন, কালিকা লোলরসনা হইয়া ক্রুদ্ধ কটাক্ষে তাহাকে দগ্ধ করিতেছেন। তাঁহার দানাগণ মুষল ও মুদ্গর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতেছে। ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি ভাবিলেন ইহা স্বপ্ন মাত্র, অমনি তন্দ্রায় আবার অট্টহাস্যকারিণী, শবশিশুমালিনী, ভীষণ-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উত্থিত হইল, তাঁহার তৃতীয়-নেত্রসম্ভূত-অগ্নি তাহাকে দগ্ধ-বিদগ্ধ করিতে লাগিল। দানাগণ বলিতে লাগিল—"তুই ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে ব্যাধ ভাবিয়া দণ্ড দিয়াছিস্, এখনই তাহাকে মুক্তি দে"—রাজা স্বপ্নে বলিলেন "মুক্তি দিব"। অমনি তাথৈ তাথৈ রবে দানবগণ নৃত্য করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "এখনই মুক্তি দে।" রাজা জাগিয়া চক্ষু মার্জ্জনাপূর্ব্বক স্বর্ণপালঙ্কে বসিয়া রহিলেন! ভয়ানক অন্ধকার নিশি, ঘোর মেঘরাশি করাল বেশে বিদ্যুৎ-দন্ত উদ্ঘাটন করিয়া পৈশাচিক রবে অট্টহাস্য করিতেছে। সেই বিদ্যুতের প্রভা শিবিরের গবাক্ষ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া কালিকার নেত্রাগ্নির ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। ভীমবেগে প্রভঞ্জন তাঁহার শিবির কাঁপাইয়া যেন উৎকট রবে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল ;—"এখনই মুক্তি দে।" ক্রমে রাজা জাগ্রত অবস্থায়ই দেখিতে লাগিলেন, প্রভঞ্জন

যেন পুঞ্জীভূত হইয়া দানারূপে তাঁহার গ্রীবা ধারণ করিয়া পীড়ন করিতে [illegible]। বিদ্যুৎ যেন শিবিরে প্রবেশ করিয়া পৈশাচিক স্বরে শুধুই বলিতে লাগিল,—"এখনই মুক্তি দে।"

এমন সময় প্রতিহারী রাজশিবিরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"মহারাজ, আপনার সৈন্যদিগকে দানায় মারিতেছে। কে মারিতেছে দেখা যায় না, কিন্তু বিষম প্রহারে তাহারা 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাকিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে।"

রাজা সেই রাত্রেই কালকেতুকে আনাইয়া বলিলেন,—"তোমাকে দ্রাবিড়-রাজসিংহাসনে আমি স্বয়ং অভিষিক্ত করিব। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

কালকেতু রাজার সমীপে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মাথায় মুকুট নাই, কিন্তু রাজা দেখিলেন দুইখানি অদৃশ্য হস্ত একখানি আশ্চর্য্য মুকুট তাহার মাথার উপর লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত, কিন্তু তাহা মার্জ্জনা করিবার জন্য শত শত দেবহস্ত অজ্ঞাতসারে ভৃঙ্গ লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহার কৃষ্ণদেহের জ্যোতিঃ ক্রমেই যেন অমল শশধরের ধবল কান্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। আরও দেখিলেন, কালকেতুর দুইটি নিশ্চল চক্ষু ঊর্দ্ধে একলক্ষ্যে নির্ণিমেষ হইয়া আছে—সেদিকে একটা অপূর্ব্ব রূপের প্রভা পড়িয়াছে। কালকেতুর কর্ণ একাগ্র হইয়া কি শুনিতেছে,—তথায় অমৃতকণ্ঠের ধ্বনি যেন ভাসিয়া আসিতেছে,—উহা কি ফুল্লরারূপিণী ছায়াবতীর রূপ ও কণ্ঠস্বর ?

দেখিতে দেখিতে কালকেতু অদৃশ্য হইলেন। একটি ছিন্ন মন্দার-কুসুম সেইখানে নিদর্শন-স্বরূপ পড়িয়া রহিল,—নতুবা সমস্ত কাহিনীটিকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত।

পরদিন রাজা দ্রাবিড়-রাজধানীতে যাইয়া দেখিলেন, তথায় প্রজাবৃন্দ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে। ফুল্লরারাণীর মৃত্যুতে সমস্ত নগরী ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সে মৃত্যুকালে স্বর্গধামের একটি নিদর্শন ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীতে ফেলিয়া গিয়া প্রজাদিগের প্রতি ভালবাসা জানাইয়াছে,—তাহা তাহার পুত্র পুষ্পকেতু। রাজা সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুটির মস্তকে রাজদণ্ড ধরাইয়া তাহাকে দ্রাবিড়ের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং হতভাগ্য ভাঁড়ুদত্তের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চাপাইয়া নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন, কুলের বধূরা তাহার মস্তক-উদ্দেশ্যে কাল হাঁড়ী ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ভাঁড়ুদত্তের প্রকৃত চরিত্র জানিতে রাজার বাকী রহিল না।

দ্রাবিড়াধিষ্ঠিত চণ্ডীকে দেশদেশান্তর হইতে ভক্তগণ আসিয়া পূজা দিতে লাগিল।

৮

ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর কেন অভিশপ্ত হইয়াছিলেন?

লোমশ মুনি সমুদ্রতীরে তপস্যা করিতেন। শীতকালে সমুদ্রতরঙ্গ-স্নাত বায়ু তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিত, যমসদৃশ শীত সিন্ধু-তীরে জীবজন্তুকে নিপীড়িত করিত; মুনিবরের ভ্রূক্ষেপ নাই।

গ্রীষ্মকালে দোর্দ্দণ্ড মার্ত্তণ্ড-তেজে সিন্ধুতীরের সিকতারাশি অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইত, সুতীব্র দাহনে তাঁহার দেহ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া যাইত; মুনিবরের ভ্রূক্ষেপ নাই।

বর্ষাকালে কখনও কখনও সপ্তাহ-ব্যাপক বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা সমুদ্রতীরে

প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত, সেই মুষলধার বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা তাঁহার দেহে অবিরত প্রহার করিত। তথাপি মুনিবরের ভ্রূক্ষেপ নাই।

সিন্ধুর সিকতাভূমিতে নিশ্চল চিত্রপটের ন্যায় তপস্বিবর বিরাজমান। জড়জগৎ কখনও মৌন, কখনও মুখর ক্রোধে তপস্বীর হৃদয়বল পরীক্ষা করিত।

কিন্তু যোগী নিশ্চেষ্ট। তাঁহার অতিমাত্র উপেক্ষার নিকট বজ্র, বিদ্যুৎ, মেঘ, রৌদ্র, হিম সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল।

তিনি ভ্রূমধ্যে নেত্রদৃষ্টি বদ্ধ করিয়া অচিন্ত্য, অব্যক্ত ধ্যানরহস্যে সুস্থিত রহিলেন।

ইন্দ্রদেব আকাশের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া ধ্যাননিরত যোগিবরকে যোগ-ভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। এবার বুঝি ইন্দ্রত্ব যায়।

ইন্দ্রপুত্র-নীলাম্বর পিতার অগোচরে লোমশ-মুনিকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

যোগী যখন ধ্যান-মুক্ত দৃষ্টিতে একবার জগতের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর যুক্তকরে তৎ-সকাশে দণ্ডায়মান।

কি অভিপ্রায়ে আসা হইয়াছে, মুনি জিজ্ঞাসা করাতে নীলাম্বর বলিলেন,"প্রভু, এই শীত-গ্রীষ্মে আপনি অনাবৃত ভাবে সিন্ধুতীরে তপস্যা করেন, আপনি অনুমতি করিলে আমি একখানি কুটীর বাঁধিয়া দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি।" অভিসন্ধি, এই কুটীর নির্ম্মাণের অনুমতি পাইলে তিনি ধীরে ধীরে তাহা রাজ-প্রাসাদে পরিণত করিয়া নানা বিলাসের সামগ্রী দ্বারা মুনিকে প্রলুব্ধ করিবেন।

লোমশ মৃদু হাস্যের ছটায় সেই স্থান পবিত্র করিয়া বলিলেন, "জীবন

নশ্বর, আমি কেন ঘর বাঁধিব ?" নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুর আয়ু কত কাল ?" মুনি বলিলেন, "সর্ব্বদেহে লোমের বাহুল্য থাকায় আমাকে পিতামাতা লোমশ আখ্যা দিয়াছিলেন,—এক একজন ইন্দ্র লোপ পাইলে এক একটি লোম ক্ষয় হইয়া থাকে, সর্ব্ব লোম ক্ষয় হইয়া গেলে মৃত্যু নিশ্চিত, এখন হিসাব করিয়া দেখ কত কাল।" এই বলিয়া মুনি পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

সেইদিন নীলাম্বর শিবপূজা করিতে গিয়াছেন। অপূর্ব্ব মন্দার-কুসুম-রাশি সংগ্রহ করিয়া দিব্যোজ্জ্বল রক্তপট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মহাদেবের সন্নিধানে তিনি যথারীতি উপস্থিত হইলেন—মহাদেবের প্রিয় ধুস্তুরফুল-একটি নীলাম্বরের হস্তে। কিন্তু সেদিন মহাদেবের রুদ্র বেশ, ধূর্জ্জটির জটা ভেদ করিয়া কলকলনাদিনী গঙ্গা সেদিন ভীমতরঙ্গা, জটার ঊর্দ্ধে ফণীর বিস্তৃত ফণা সেদিন গর্জ্জনশীল,—বিরূপাক্ষের নেত্রকনীনিকা উগ্র, তাঁহার ললাট-বিরাজিত অর্দ্ধেন্দু তীব্রজ্বালাবিশিষ্ট ধূমকেতুর ন্যায়, বিভূতি ও হাড়মালা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতেছিল এবং তাঁহার ওষ্ঠাধরে যে ঘৃণা ও বিরক্তি ব্যক্ত হইল, তাহা নীলাম্বরকে ব্যথিত, ত্রস্ত ও ভীত করিল।

শিবের আজ্ঞায় নন্দী নীলাম্বরের হস্ত হইতে ধুস্তুরফুল কাড়িয়া লইল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শিব বলিলেন, "দেবতার অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়া দেবতাকে স্তোকবাক্যে পূজা করিতে আসা তাঁহাকে উপহাস করা মাত্র।

"লোমশ মুনি ইন্দ্রত্ব-অভিলাষী নহেন, তথাপি মিথ্যা-সন্দেহ করিয়া তোমরা তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতেছ। তিনি যে ব্রহ্মানন্দপিপাসী, অমরাবতীর দেবতারা তাহার আস্বাদ পান নাই। এই অকপট সাধুকে হিংসা করার অপরাধে তুমি মর্ত্ত্যলোকে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ কর,

হিংসাই তোমার ব্যবসা হউক। এই শাস্তিতে তোমার পিতারও প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

মহাদেব কোন কথা না বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। দূরে যেন সপ্তসিন্ধু একত্র হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড যেন একত্র উদয় হইয়া সেইস্থান দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই দাহনে ও গর্জ্জনে দেবদেহ প্রপীড়িত হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিল।

এদিকে অমরাবতীতে হাহাকার উপস্থিত হইল। ইন্দ্র শোকে অধীর হইলেন, শচী পাগলিনীর বেশে নন্দনকাননে আছাড়ি-বিছাড়ি খাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নীলাম্বরের পত্নী ছায়া মৌন-চিত্রপটের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সুনির্ম্মল ললাটের প্রান্তবর্ত্তী সুকেশান্ত একটুও বিচলিত হইল না;—তাঁহার নিশ্চল চক্ষুতারা মর্ত্ত্যের দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল, বিচিত্র মণিরাজিত পট্টাঞ্চল একটুও বিচলিত হইল না,—বিম্বাধরে কোন বৃথা পরিতাপের রেখা অঙ্কিত হইল না; যেন কোন দেব-ভাস্কর এই মাত্র পরমাসুন্দরী দেবীর বিগ্রহ গঠন করিয়া তাহা নিপুণ তুলিতে রঞ্জনপূর্ব্বক সূর্য্যের পার্শ্বে শুকাইতে রাখিয়া গিয়াছেন,—সূর্যদেব মৃদুমধুর রশ্মি ফেলিয়া সাবধানে তাহা শুকাইতেছেন।

ছায়াবতী এইভাবে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলেন? তিনি সমস্ত দৈবশক্তি উদ্বোধন করিয়া মর্ত্ত্যে ব্যাধগৃহে জন্মিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। দেবতার ইচ্ছা অক্ষুন্ন, দেখিতে দেখিতে নন্দনবনে মন্দার-বৃক্ষের পার্শ্বে তাঁহার দেবদেহ পড়িয়া রহিল, ছায়াবতী ফুল্লরা হইয়া সঞ্জয়কেতুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ধরা-দ্রোণ

ও

কুশধ্বজ

ভূমিকা

সরস্বতীর মৃন্ময় বিগ্রহের পার্শ্বে দুইটি নায়িকার মূর্ত্তি। দেবী বীণাপাণি শুভ্র-বসনা, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়না। সেই অতি-মাত্র শুভ্রশ্রী নির্ম্মল ও পবিত্র; দেবীর পরিচ্ছদ ও সেই নির্ম্মলতাসূচক, তাহাতে কোন চাকচিক্য নাই। আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন ও তিলফুলসুন্দর নাসিকা— যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যের; সেরূপ নাসিকা নরলোকের নহে। বর্ত্তমান যুগের কলা-শিল্পের নির্দ্দেশ মানিতে গেলে বলিতে হইবে দেবীর মূর্ত্তি বৈজ্ঞানিক হিসাবে শুদ্ধ নহে; মাপিয়া দেখিলেই সেই চক্ষু ও নাসিকার সঙ্গে স্বভাবের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু নায়িকা দুইটি নর-লোকের, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ জোকে দোষ নাই; তাহারা সুন্দরী ললনার প্রতিকৃতি, এবং তাহাদের বসন বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত এবং নানাভঙ্গীতে ক্রীড়াশীল ও মনোহর।

তবুও সেই স্বভাবানুগা পরিমাণ-শুদ্ধা নায়িকা-দুইটির মূর্ত্তির অপেক্ষা সরস্বতীর মূর্ত্তি যে গৌরবান্বিত, তাহার কি সন্দেহ আছে? যাঁহারা হিন্দু নহেন, পূজক ও ভক্তের চক্ষু যাঁহাদের নাই, এরূপ দর্শকের নিকট হইতেও আমরা এই মন্তব্যই পাইতে আশা করি। দেবীর দুইটি চক্ষু পৃথিবীর নহে। উহারা কোন দিব্যলোকের সংবাদ জ্ঞাপন করে; মাপে ভুল ধরিয়াও দর্শক উহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। নায়িকাদের অপাঙ্গ দৃষ্টি এই জগতের, তাহার সঙ্গে কি সেই দেবদৃষ্টির তুলনা হয়? দেবীর ইন্দুকুন্দ-তুষার-শুভ্র বর্ণ স্বাভাবিক নহে; তথাপি তাহার কাছে প্রকৃতির অনুরূপ নায়িকার বর্ণ-লাবণ্য কি দাঁড়াইতে পারে?

কৃষ্ণের নব-নীল-নীরদ বর্ণ, দুর্গার অতসী-কুসুমবর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া উহাদিগকে বৈজ্ঞানিক-নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ঢালিয়া নির্ম্মাণ কর,—দেবতা মানুষ হইয়া যাইবেন, একখানি চারুচিত্র হইতে স্বর্গের সম্পদ্ মুছিয়া যাইবে,—উহা পৃথিবীর ধূলায় কলঙ্কিত হইবে,—কাব্যের মাধুর্য্য গদ্যের কঙ্কালে পরিণত হইবে।

বর্ত্তমান উপন্যাস ও পৌরাণিক উপাখ্যান এতদুভয়ের মধ্যে আমার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। একটি স্বভাবের প্রতিলিপি, অপরটি স্বভাবের হস্তে আদৌ ধরা দেয় না। একটি মনুষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে, অপরটি অজ্ঞাত রাজ্যের সন্ধানে ব্যস্ত। একটির পথ চির-পরিচিত,—তাহা অতি সন্তর্পণে স্বভাবের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়; অপরটির পথ অপরিচিত, দুজ্ঞের্য় ও স্বভাবের গণ্ডীর বহির্ভূত। একটি দৃষ্টকে পুনঃ পুনঃ নানাভঙ্গীতে দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রীত, অপরটি অদৃষ্টের আভাস দিতে চায়;—উৎকট অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্য দিয়া স্বভাবাতীত কোন সত্যকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টিত।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের নিকট যাহা কিছু সর্ব্বদা দৃশ্যমান, তাহার মাধুরী কিছুতেই ফুরায় না; আসল ত আছেই, তাহার নকল পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তাঁহারা তৃপ্ত হন না,—রঙ্গালয়ে, সাহিত্যে, শিল্পে, তাঁহারা বার বার সেই একই দৃশ্য ভালবাসেন। আর এক শ্রেণীর লোক স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া কিছু দেখিতে, কিছু শুনিতে চান। তাঁহারা ঘটনাকে বাড়াইয়া, অতিরঞ্জন করিয়া উৎকট ও অসম্ভবকে আশ্রয় করিয়া—কোন উচ্চতর তত্ত্বের সোপান নির্ম্মাণ করেন।

উৎকৃষ্ট বাস্তব উপাখ্যানেও কখনও কখনও সেইরূপ উচ্চ তত্ত্বের

বিকাশ দৃষ্ট হয়, এবং পৌরাণিক উপাখ্যানও কখনও কখনও সেই তত্ত্ববিচ্যুত হইয়া ধাত্রী-কথিত ছেলে-ভুলানো ছড়ায় পরিণত হয়, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের বাহিরে।

সেক্স্‌পীয়ারের একখানি উৎকৃষ্ট নাটক পাঠ করিয়া, তৎপরে কোন প্রতিভাশালী কথকের মুখে প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র কিংবা অপর কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করুন,—বাস্তব এবং অ-বাস্তব কথার তারতম্য অনুভব করিতে পারিবেন।

পৌরাণিক উপাখ্যানের সৌন্দর্য্য-গৌরবে বর্ত্তমান লেখক মুগ্ধ হইলেও আশঙ্কা হয় তিনি যাহা সাশ্রুনেত্রে শুনিয়াছেন, তাহার মুখে সে কথা শুনিয়া হয়ত পাঠকগণ এই ভূমিকাকে বৃথা আড়ম্বর মনে করিবেন। প্রচারকের শক্তির অভাবে সত্যও অনেকস্থলে বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোন কবি সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কুশধ্বজের গল্পটি যেরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি উহা এই পুস্তকে লিখিয়াছি।

১লা শ্রাবণ, ১৩২০

কলিকাতা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এবার "কুশধ্বজ" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি স্থানে স্থানে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করা হইল।

১৯শে পৌষ, ১৩২১

কলিকাতা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ধরা-দ্রোণ

১

ত্র্যম্বক-শরণের ভক্তি

বিষ্ণু, শিব ও পার্ব্বতী তাঁহাদের ভক্তগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।

ইঁহাদের সকলেরই ছদ্মবেশ। বিষ্ণুর ব্রাহ্মণ-যুবকের বেশ; পরিধান ছিন্ন ধটী, পদ কর্দ্দমাক্ত। শিব ও পার্ব্বতী বিষ্ণুর পিতা ও মাতার ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা অতি বৃদ্ধ ও প্রায় চলচ্ছক্তি-রহিত।

তিনজনে কাশীধামে ত্র্যম্বক-শরণ শ্রেষ্ঠীর দ্বারে উপস্থিত। ত্র্যম্বক-শরণের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত; অতিথির জন্য নহে, ঋণপ্রার্থীর জন্য। দরিদ্রগণের ত কথাই নাই; বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপনীত হইয়া থাকেন। ত্র্যম্বক-শরণ কাহাকেও ঋণদান করিতে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহার কুশীদের পরিমাণ অত্যধিক এবং সেই অপরিমিত কুশীদের এক কপর্দ্দকও তিনি ছাড়েন না। ইহা আদায় করিতে তাঁহার রাজদ্বারে যাইবার প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। যাহাকে ঋণদান করেন, তাহার সেই ঋণশোধ করিবার কোন কালে ক্ষমতা হইবে কি না, ইহা তিনি একবারও চিন্তা করেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার চরগণ যষ্টিহস্তে বিপুল গুম্ফ স্ফীত করিয়া দরিদ্রের কুটিরদ্বারে বসিয়া থাকে; পল্লীবাসীরা ব্যাঘ্র দেখিলে যেরূপ ভয় পায়, ত্র্যম্বক-শরণের চরদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর ভয় করিয়া থাকে। নিতান্ত দরিদ্রের ছিন্ন কন্থা এবং ক্ষুদ্র কড়ির পুঁটলিটি

পর্য্যন্ত চরেরা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যায়; এই ভাবে সেই ঋণ আদায় হইয়া থাকে। বিপদের সময় ত্র্যম্বক-শরণের অর্থ পাইয়া অনেকে তৎকালের জন্য নিরাপদ্ হইয়াছে সত্য; কিন্তু জ্বরবিকার-গ্রস্তের পক্ষে অন্ন-পথ্য যেরূপ আপাত সুস্বাদু, কিন্তু পরিণামে মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়, ত্র্যম্বক-শরণের ঋণও সেইরূপ আপাততঃ শান্তিপ্রদায়ী, পরিণামে ভয়াবহ। যিনি গৃহের দু'খানি আস্বাব্ বিক্রয় করিবার কষ্ট ও লজ্জা হইতে নিজকে বাঁচাইতে যাইয়া ত্র্যম্বক-শরণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি পরিশেষে গৃহখানি বিক্রয় করিয়াও অব্যাহতি পান নাই।

ত্র্যম্বক-শরণের গৃহ সদর রাস্তার উপর, এই পথের বহুযাত্রী; কিন্তু একবার যে তাঁহার হস্তে ধরা দিয়াছে, তাহার আর মুক্তি নাই। অভিমন্যুর মত সে ব্যূহভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইল সত্য, কিন্তু ত্র্যম্বক-শরণের চরস্বরূপ সপ্তরথীর হস্তে তাহার ঘোর বিপদ্ অনিবার্য্য।

২

এদিকে ত্র্যম্বক-শরণ পরম শৈব। তাঁহার ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক-রেখা। তিনি কাশীর দশাশ্ব-মেধ, মণিকর্ণিকা, বিন্দুমাধব প্রভৃতি ঘাটে পর্য্যায়ক্রমে স্নান করেন। তাঁহার বাটীর চতুর্দ্দিকে বিল্বকানন। অক্ষত ত্রিপত্র বিল্বপল্লবে নিত্য তিনি মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন। পূজার সময় যদি প্রভূত পত্রপুষ্পের সম্ভারের মধ্যে একটি কীটদষ্ট ধুস্তুরপুষ্প বা কলঙ্কচিহ্নিত বিল্বপল্লবও তিনি প্রাপ্ত হন, তবে সেই দিন ভৃত্যবর্গের ঘোর অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকের বেতনের অংশ

কর্ত্তিত হয়। শ্রেষ্ঠীর মুখে সর্ব্বদা 'হর' 'হর' ধ্বনি; শিবপূজার সময় তাঁহার গালবাদ্যে মন্দির মুখরিত। রুদ্রাক্ষমালায় বিশাল বক্ষ শোভিত। তিনি সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই সর্ব্বদা শিবের কীর্ত্তন ও তদীয় নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। রাজা দিবোদাস যখন কাশী অধিকার করেন তখন শিব কাশীবিরহে ক্ষুণ্ণ হইয়া কৈলাসে কিরূপ ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে যাইয়া শ্রেষ্ঠীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। তাঁহার মুখে সেই কাহিনী শুনিয়া কত শ্রোতা বিমোহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি প্রায়ই ঢুণ্ঢিবিনায়ক, রত্নেশ্বর প্রভৃতি কাশীপ্রতিষ্ঠিত দেবগণের কথা অতি মধুর ভাষায় বর্ণনা করিতেন। যাহারা তাঁহার মুখে সেই কাহিনী শুনিত, তাহারা ত্র্যম্বক-শরণকে তৎসময়ের জন্য মহাভক্ত বলিয়া মনে করিত।

এরূপ দুষ্কৃতের চিত্তে ভক্তির সমাবেশ একান্ত অসম্ভব নহে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভক্তি ও কর্ম্ম অনেক সময়ে এক পথে পরস্পরের হাত ধরিয়া যায় না; যেখানে তাহা হয়, সেখানে মুক্তি। অধিকাংশ সময়ে ভক্তি কর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া যায়, এবং অভ্যাসবশতঃ ভক্ত কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া হেয় হইয়া পড়েন। ত্র্যম্বক-শরণেরও তাহাই হইয়াছিল।

ত্র্যম্বক-শরণ মহা ধুমধামের সহিত শিবপূজা করিয়া থাকেন, পুরোহিতগণকে তিনি মুক্তহস্তে দক্ষিণা প্রদান করেন। দেবতারা অনেক সময়ে পুরোহিতদের মুখেই ভক্তের পরিচয় প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের অবিরত প্রশংসাবাদে শিব ত্র্যম্বক-শরণকে স্বীয় ভক্তগণের একজন অগ্রণী মনে করিয়াছিলেন। প্রজাদের বিপদের কথা কৈলাসপুরী পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই; সেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও কথা গ্রাহ্য

হয় না; তাঁহারা ত্র্যম্বক-শরণের পক্ষপাতী, সুতরাং শিবও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন।

৩

বর্ণিত দিবসে ত্র্যম্বক-শরণ স্বীয় বহির্ব্বাটীতে বসিয়া খাতকগণের সঙ্গে তেজারতি সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবস্থার কথা উত্থাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, একটি ব্রাহ্মণ-যুবক জনৈক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার দর্শনপ্রার্থী। ত্র্যম্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?" ভৃত্য বলিল, "উদ্দেশ্য কিছুই ব্যক্ত করিলেন না।" ত্র্যম্বক—"সাজসজ্জা কি ভিক্ষুকের মত?" ভৃত্য—"ব্যবসায়ী, ভিক্ষুক বলিয়া মনে হয় না; তবে হয় ত কোন বিপদে পড়িয়া আসিয়াছেন, মূর্ত্তিতে বিপদ ও দুশ্চিন্তার লক্ষণ সুস্পষ্ট; দেখিয়া মনে হয় এক সময়ে অবস্থাপন্ন ছিলেন এখন কষ্টে পড়িয়াছেন।"

'হয়ত বাসগৃহ কিংবা জমি বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে আসিয়াছেন, তা' সেরূপ লইয়া ত আমি টাকা ধার দিয়া থাকি'—এই ভাবিয়া ত্র্যম্বক তাঁহাদিগের প্রবেশের অনুমতি দিলেন, এবং 'হর' 'হর' শব্দে রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "মহাদেবপুর বাঁধা রাখিয়া আমাকে দশ হাজার মুদ্রা ধার দিতে পারেন কি? এই বিষয় আমি পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছি; এ গ্রামের স্থিত বাৎসরিক দুই হাজার টাকা, তাহা কাগজ-পত্র দেখিলেই আপনি সমস্ত জানিতে পারিবেন। আমার বন্ধু হরদেব শাস্ত্রী এইস্থানে উপস্থিত, আপনি ইঁহাকে বিশেষরূপে জানেন, ইনি এই

ভূ-সম্পত্তি সম্বন্ধে সমস্ত অবগত আছেন।" যখন এই ব্যক্তি মহাদেবপুর গ্রামের নাম উল্লেখ করেন, তখন, শ্রেষ্ঠী স্বীয় উপাস্য দেবতার নাম-মহিমায় ভক্তি-গদ্গদ হইয়া যুক্তকরে একবার প্রণাম করিলেন; তৎপরে সকল কথা শুনিয়া হরদেব শাস্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ, উনি ঐ গ্রামের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা কি ঠিক?" হরদেব বলিলেন, "উনি মিথ্যা কথা বলেন নাই।"

ত্র্যম্বক—"তা' আমার লোক যাইয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আসিবে, এবং কাগজপত্রগুলি ভাল করিয়া অবসরমত দেখিয়া লইব। হর, হর, হর, জীবনে অর্থ অনর্থের মূল। কাশীখণ্ডের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, শৈবগণের নিকট কাচ ও কাঞ্চন সমতুল্য, একটী রুদ্রাক্ষের যে মহিমা, সমস্ত কুবেরের ভাণ্ডারেও তাহা নাই। তা, আপনি বিপন্ন। সেই মহাগ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, আত্মত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি পরকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, তিনি উৎকৃষ্ট-লোকে গমন করেন; পূর্ব্বকালে পিঙ্গাক্ষ নামক ব্যাধ এইরূপ করিয়া দিক্‌পালের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি আপনাকে অবশ্য টাকা ধার দিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন।" এই কথা শুনিয়া প্রার্থী ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুশীদের পরিমাণ কি?" কুশীদের পরিমাণ সম্বন্ধে ত্র্যম্বক কিছুকাল চিন্তা করিয়া যাহা বলিলেন, প্রার্থী বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত, সে স্থান ছাড়িতে পারিলেন না।

৪

মধ্যাহ্নকাল প্রায় অতীত। ছদ্মবেশী দেব-অতিথিত্রয় ত্র্যম্বক-শরণের সম্মুখে উপস্থিত। ঋণপ্রার্থী মনে করিয়া ত্র্যম্বক-শরণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি চাও?"

যুবকবেশী বিষ্ণু বলিলেন, "আমার পিতা ও মাতা বৃদ্ধ ও জরাতুর, স্বচক্ষে দেখিতেছেন। আমরা আপনার গৃহে অতিথি, আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন।"

এই কথায় তাঁহাদের প্রতি ত্র্যম্বক-শরণের মনোযোগ আর কিছুমাত্র রহিল না, চলন্ত ব্যক্তির কর-ধৃত আলোর ন্যায় স্থানান্তরে নিপতিত হইল। ঋণপ্রার্থী এবং ঋণদায়গ্রস্ত বহুব্যক্তির সঙ্গে তিনি কুশীদের পরিমাণ লইয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এবং বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে মধ্যে 'হর' 'হর' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কুলপুরোহিত বিষ্ণুশর্ম্মা তাঁহার ভক্তি সম্বন্ধে সুবিধা পাইলেই অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু যেরূপ নির্দ্দয়তার সঙ্গে দীনহীন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের সকাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া ত্র্যম্বক স্বীয় স্বার্থের নির্ম্মম শল্য দ্বারা তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তদীয় কণ্ঠ-উচ্চারিত অবিরাম 'হর' 'হর' শব্দ মহাদেবের কর্ণে উৎকট বিদ্রূপ-বাণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই কুশীদ ও ঋণসম্বন্ধীয় তর্ক-স্রোতের মধ্যে বিষ্ণু তাঁহার দুর্দ্দশার কথা ও প্রার্থনা দুই একবার নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহা একেবারে ডুবিয়া গেল। ত্র্যম্বক-শরণ বা অপর কেহ সেই কথায় একবারও কর্ণপাত করিলেন না।

বেলা প্রায় তিন প্রহর, ত্র্যম্বক-শরণ সভাভঙ্গ করিয়া উত্থান করিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ বিদায় গ্রহণ করিল। শেষবার ক্ষীণ-কণ্ঠে বিষ্ণু তাঁহার আবেদন জ্ঞাপন করিলেন। তির্য্যক দৃষ্টিতে ত্র্যম্বক একবার বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখন শিবপূজা করিতে হইবে, পুরোহিত বিষ্ণুশর্ম্মা এ জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কে হে তোমরা পূজার সময় এইরূপ ব্যাঘাত জন্মাইতেছে?" তখন বিষ্ণুশর্ম্মা নকীবের ন্যায় ফুকারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ইনি প্রধান ভক্ত, এখন পূজার সময় তোমরা বিঘ্ন জন্মাইতেছ কেন? দেবপূজার সময় অভাব-অভিযোগ জানাইয়া উৎপাত করিতেছ, তোমাদের ভয় নাই? চলিয়া যাও।" ব্যাঘ্রবৎ বিশাল গুম্ফধারী এক ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল, সে হাঁকিল,—"চলিয়া যাও।" তাহার উক্তিতে বলপ্রয়োগের পূর্ব্বাভাস লক্ষ্য করিয়া ছদ্মবেশী দেবতাত্রয় সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

পূজার ঘণ্টা উৎকটনিনাদে বাজিতে লাগিল; যে দেবতার জন্য বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ পূজার এত ঘটা হইতেছিল, সেই দেবতা স্বয়ং গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

৫

বিষ্ণু ও পার্ব্বতীর নিকট শিব কিছু লজ্জিত হইলেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহাদের নিকট এই ত্র্যম্বক-শরণের কত প্রশংসা করিয়াছেন! ত্র্যম্বক-শরণের মুখে যে সকল নির্ম্মম কথা তিনি শুনিয়াছেন, অর্দ্ধাশন ও অনশন ব্যক্তিদের যে কাতরোক্তি, তাহাদের

প্রতি যে নিষ্ঠুরাচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতে দিগম্বরের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা জন্মিল। তাঁহার ছদ্মবেশসত্ত্বেও বিষ্ণু ও পার্ব্বতী তাঁহাদের দিব্য কর্ণে শুনিতে পাইলেন, শিবের জটাজুটে সুরধুনী কলকলনাদে মর্ম্ম-বেদনা জানাইয়া অধীরভাবে ছুটিয়াছেন। তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিলেন, শিবের ললাটে অর্দ্ধেন্দু করুণার হিমে জড়িত হইয়াছে, এবং নীলকণ্ঠের কণ্ঠাবলম্বী বিষ-রেখা প্রবৃদ্ধ হইয়া পীড়া দান করিতেছে; মুহূর্ত্তকালের জন্য তাঁহার তৃতীয় চক্ষু নিমীলিত হইয়াছে এবং অপর দুই চক্ষু পরম দয়ায় পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছে। তখন সন্ধ্যা সমাগত, নবোদিত চন্দ্রলেখার পার্শ্বে শুক্রতারাটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে; পার্ব্বতী ও বিষ্ণুর মনে হইল, শিবললাটের অর্দ্ধেন্দু ও কপোল-লগ্ন করুণ অশ্রুবিন্দু অকাশপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিছুকাল স্তব্ধ থাকিয়া মহেশ্বর দয়ার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,—"পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট আমরা জানি না; যাঁহারা আমাদের নিকট সেই কথা পৌঁছাইবার ভার লইয়াছেন, তাঁহারা যথাযথ ভাবে তাহা জানান না। অদ্য হইতে এই সম্মান তোমাকে রাখিতে হইবে, তুমি রাজরাজেশ্বর! আর পার্ব্বতী, তুমিও গিরিরাজকন্যা, তোমারও মর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিতে পারে। দেব-সমাজে তোমাদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু আমি ভিখারী শিব, আমি শ্মশানে থাকি, ভস্ম ও চন্দন আমার পক্ষে সমান। আমি ব্রাহ্মণ মধ্যবর্ত্তী কেন রাখিব? আমি দ্বারে দ্বারে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করিব। আমার আবার মান অপমান কি? যেখানে ভক্তি, সেইখানেই আমি। গৃহস্থ, আজ হইতে দ্বার খুলিয়া রাখ, অনাহূতভাবে আমি আসিতেছি। 'হর' 'হর' শব্দ যে যেখানে করিবে, আমি সেইখানেই যাইব; ইহাতে জাতিবিচার নাই, জাতি নির্ব্বিশেষে

আজ হইতে সকলেই আমার পূজার অধিকারী হইল। হে দরিদ্র, আমি তোমাদের দেবতা, তাই আমি নিজে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়াছি। হে শোকাতুর, আমি তোমাদের জন্য নিজে বিষদগ্ধ হইয়াছি। তোমরা আশ্বস্ত হও, আমি এবং আমার জটার পাবনী সুরধুনী-ধারা সকলের জন্য। আমি এবং আমার ভক্তের মধ্যে ব্যবধান বা মধ্যবর্ত্তী কাহাকেও রাখিব না। ত্র্যম্বক-শরণের ব্যবহারে আমি মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি।"

পার্ব্বতী বলিলেন, "আমি রাজকন্যা হইতে পারি, কিন্তু আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, আজ হইতে আমি স্বয়ং নীচ হাড়ির পূজা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিব। কাশীতে অন্নপূর্ণারূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া আমি দীনদুঃখীর অন্নদাত্রী জননীর স্থান গ্রহণ করিব।"

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসে উচ্চ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। জগৎ-বাসী সকলে শুনিল, উচ্চ নীচের তারতম্য-নাশী ভক্তের প্রতি অভয় জয়বার্ত্তা কৈলাশ হইতে দূরদূরান্তরে নিনাদিত হইল। হরপার্ব্বতী দুঃখী তাপী সকলের নিজস্ব হইলেন; অলকানন্দাস্নাত মলয়পবন প্রবাহিত হইল এবং কৈলাসপুরী স্বর্গের অপরাপর পুরীর অপেক্ষা পৃথিবীর অধিকতর সন্নিহিত হইল।

বিষ্ণু বিস্মিত-চক্ষে দেখিলেন, কৈলাস বৈকুণ্ঠের মত ঐশ্বর্য্যের উচ্চতম স্বপ্নের সিদ্ধি নহে—উহা প্রীতির স্বর্গ। সেখানে হস্তী শুণ্ড দ্বারা নির্ভয়ে সিংহের গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে, এবং স্ফীত-কেশর কেশরী শরভের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছে; সেখানে হরিণ-শাবক ব্যাঘ্রশাবক-দিগকে অতিক্রম করিয়া চপলপুচ্ছে ফেনায়মান মুখে ব্যাঘ্রীর স্তন্য পান করিতেছে, এবং কার্ত্তিকেয় ও গণপতি হাস্যমুখে নন্দীর সঙ্গে এক থালায় অন্নভোজন করিতেছেন।

৬

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে শিবের ভক্ত-পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা রহিল না। কিন্তু বিষ্ণুর আগ্রহ-নিবন্ধন তাঁহাকে অন্য এক স্থানে যাইতে হইল।

কাশীর সন্নিহিত শম্ভুপুর গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে একটী অরণ্য। পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় দেবতাত্রয় আবার সেই ছদ্মবেশে অরণ্যপথে অগ্রসর হইলেন।

বিল্ব ও তুলসীতরু শৈব ও বৈঞ্চবের ন্যায় সেই বনে মিলিত হইয়া আছে। শিবপ্রিয় ধুস্তুরকুসুম, পার্ব্বতীর জবা ও অতসী এবং বিষ্ণুর প্রিয় চম্পকপুষ্প সেই বনের একখানি বিরাট থালায় যেন কেহ একত্র করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসাগত সমীরণ যেন সেই বনে একত্র প্রবাহিত হইয়া উভয় দেবতার প্রীতিসাধনে ব্যস্ত। চতুর্দ্দিকে ঘন শ্যামপত্র ভেদ করিয়া অতিশয় রক্তবর্ণ জবাপুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছে; পার্ব্বতীর লোলুপদৃষ্টি সেই দিকে। বনদেবীগণ, তোমরা অদৃশ্যকরে উঁহার পদে ঐ পুষ্পের অঞ্জলি প্রদান কর।

শিব বলিলেন, "সেই কুটীর কত দূরে?" বিষ্ণু বলিলেন,—"এই গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া যে ক্ষুদ্র পথটি দৃষ্ট হইতেছে, উহাই সেই কুটীরের পথ। ঐ দেখুন, ছোট ছোট কুন্দ, অতসী ও জবাগাছের চারা পথটির দুই ধারে; উহারা প্রকৃতির নিজহস্তে গঠিত হয় নাই, উহারা মনুষ্য-কর-রোপিত। ঐ চারাগুলির নিম্নভাগ ধৌত, যেন এই মাত্র কেহ জলসেচন করিয়া গিয়াছেন। এই পুষ্পগুলির দলে যে দুই একটি জলবিন্দু দেখিতেছেন, তাহা যিনি জলসেচন করিয়াছেন, তাঁহার

ভক্তির অশ্রু। তিনি প্রত্যেক পুষ্পে তাঁহার আরাধ্য দেবতার রূপ দেখিয়া পুলকাশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।"

৭

অবগুণ্ঠনাবৃত সুন্দরীর শ্রীমুখের ন্যায় বৃক্ষ ও লতা-বেষ্টিত একটি কুটীর আভাসে দৃষ্ট। কুটীরটি অতি পরিষ্কার, উহার আঙ্গিনা অতি পরিষ্কার, অথচ তাহা দীন-দরিদ্রের কুটীর। সেই দৈন্য ঘুচাইয়া তথায় প্রকৃতি-দত্ত অলঙ্কারস্বরূপ করবী ও সেফালিকা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঝুম্‌কাফুল গৃহটির কর্ণাভরণের ন্যায় দুলিতেছে এবং নানা ভঙ্গীতে উর্দ্ধগামী মাধবীলতার একটিমাত্র কুসুম কোন সুন্দরীর নোলকে দোদুল্যমান একটি পদ্মরাগ-মণির ন্যায় দেখা যাইতেছে। প্রাঙ্গণটি এত পরিষ্কার যেন দেবপূজার জন্য কেহ এখনই উহা মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। মধ্যাকাশে রক্তবর্ণ মেঘের মধ্য হইতে সূর্য্যদেব এই সমস্ত কুসুম ও তরু দেখিয়া হাসিতেছেন; তাম্রকুণ্ডের উপর হইতে দেব-বিগ্রহ আহৃত কুসুম-সম্ভার ও নৈবেদ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কি এইরূপ প্রসন্নভাবে হাসিয়া থাকেন?

এই গৃহের দ্বারে একটী ষোড়শী ললনা। আগুল্ফ-লম্বিত কেশ-পাশ জটায় পরিণত। তাঁর মূর্ত্তি প্রসন্নতা ও শুভ্রতার খনি; যদি বিষ্ণুপদচ্যুতা পবিত্র গঙ্গাধারা সহসা মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইত, তবে বুঝি এইরূপ দেখাইত। সেই কুটীরপার্শ্বের লতাপল্লব-কুসুম-পরিবৃতা রমণী যেন প্রকৃতিপটে অঙ্কিত একখানি সুচারু চিত্র, যেন ভক্তির সম্ভার সম্মুখে করিয়া উপাসিকা তদীয় আরাধ্য দেবতাকে সমস্ত নিবেদন করিয়া

দিতেছেন। কোন অলঙ্কার নাই, হস্তে সধবার চিহ্ন একটি রক্তবর্ণসূত্রে গাঁথা, এবং কপালে রক্তসিন্দূর ; সেই সিন্দূরলেখায় ও রক্তসূত্রে এবং তদীয় জানুলম্বিত বল্কলবাসে শুভ্রমূর্ত্তি উজ্জ্বল ও প্রভাময় হইয়া উঠিয়াছে।

৮

রমণীকে দেখিয়া ছদ্মবেশী বিষ্ণু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমরা তোমার গৃহে অতিথি, আমার বৃদ্ধ পিতা ও মাতা চলচ্ছক্তিহীন আমাদিগকে আশ্রয় দান কর।"

ধরা বলিলেন, "তোমরা অতিথি, আমার পূজা গ্রহণ কর। আমার স্বামী ভিক্ষার জন্য বাহিরে গিয়াছেন, ভিক্ষালব্ধ অন্নে তোমাদের সেবা হইবে। এখন এইস্থানে উপবেশন কর।"

এই বলিয়া সুন্দরী শালপত্রের পাত্র জলপূর্ণ করিয়া অতিথিদের পা নিজ হস্তে ধোয়াইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "আজ ধন্য হইলাম, আমরা দরিদ্র, এজন্য অতিথিসেবার সৌভাগ্য আমরা সর্ব্বদাপাই না।"

বিষ্ণু বলিলেন, "তোমার কুটীর অতি ক্ষুদ্র, এখানে আমাদের থাকিবার স্থান কোথায় ? তোমার গৃহে একটী মাত্র মৃৎপাত্র দেখিতেছি, তণ্ডুলাদি কিছুই নাই। তোমার স্বামী ভিক্ষাজীবি, ভিক্ষা করিয়া আজ যদি কিছু না হয়, তবে কি আমার বৃদ্ধ পিতা ও মাতা উপবাসী থাকিবেন ?"

ধরা বলিলেন, "তোমার কথা সকলই সত্য, কিন্তু আমার ভক্তি কি নিষ্ফলা হইবে ?"

বিষ্ণু—দেবতারাই মাত্র হৃদয়ের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া থাকেন; ক্ষুধাতুর অন্ন এবং পিপাসাতুর পানীয় কামনা করিয়া থাকে, তোমার বাহ্য সৌজন্য লাভ করিয়া আমরা কিরূপে তৃপ্ত হইতে পারি?"

ধরা—"তোমরা আমার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, তিনি এখনই আসিয়া ব্যবস্থা করিবেন।"

বিষ্ণু—"দ্বিপ্রহর প্রায় অতীত, তোমার দেহ অতি সুকুমার, এ পর্য্যন্ত কি কিছু আহার হয় নাই?"

ধরা—"আমার স্বামী ভিক্ষা করিয়া যাহা লইয়া আসিবেন, আমি তাহা সযত্নে রন্ধন করিব এবং তাহা তিনি সমস্ত গৃহস্বামীকে নিবেদন করিয়া দিবেন। তৎপরে তিনি নিজে আহার করিয়া যাহা রাখিবেন, সেই ভুক্তাবশেষেই আমার পরিতৃপ্তি হইবে; তৎপূর্ব্বে আহারের প্রবৃত্তি নাই।"

বিষ্ণু—"গৃহস্বামী আবার কে? তবে কি এই সামান্য কুটীরটিও তোমাদের নহে?"

ধরা—"গৃহস্বামী বিষ্ণু, তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব; আমরা তাঁহার প্রীতিকামনা করিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকি। স্বামী বলিয়াছেন, "আমাদের নিজের কিছুই নাই, আমরা নিজে কিছু ইচ্ছা করি না। তিনি যাহা করিবেন, আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া থাকি।"

বিষ্ণু রমণীর সরল কথায় দ্রবীভূত হইলেন, তাঁহার কণ্ঠ গদ্‌গদ হইল। শিব-পার্ব্বতীর মনে হইল, যেন সেই কুটীর হইতে কৈলাস-পর্ব্বতের হরীতকীবন-পরিশীলন-পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা মনে ভাবিলেন, এই রমণী যে উচ্চস্থানে আরূঢ়, সেখানে বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে হরি-হর ও হর-পার্ব্বতী একাঙ্গ।

একের পূজা করিলে, অপর দেবতারাও তাহার তুল্যাংশ পাইয়া থাকেন।

ধরা পুনরায় বলিলেন, "আমাদের দাম্পত্য-জীবন গৃহস্বামীকে নিবেদিত হইয়াছে, আমরা দেহ-মন তাঁহাকে দিয়াছি। আমরা সংসারের কোন চিন্তা করি না, আমাদের হইয়া বিষ্ণু আমাদের চিন্তা করিয়া থাকেন।"

বিষ্ণু—"তোমার মধুর বাক্যে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। তুমি দরিদ্র, তোমার যাহা সাধ্যায়ত্ত নহে, এমন কাজের জন্য আমরা তোমাকে দায়ী করিতে পারি না। আতিথ্য-প্রদর্শনের ইচ্ছা তোমার আছে, আমরা এজন্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমি সহ্য করিতে পারি, কিন্তু দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, আমার অতি বৃদ্ধ পিতা ও মাতা ক্ষুধায় ছটফট্ করিতেছেন, দেখিতে পাইতেছ না? আমার আশঙ্কা হইতেছে, ইঁহাদের শেষ সময় উপস্থিত; আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

ধরা—"ইঁহাদিগকে এ অবস্থায় কোথায় লইয়া যাইবে? এই অবস্থায় স্থানান্তরিত করা কি নিরাপদ?"

এই বলিয়া যুবতী পুনরায় শালপত্রের পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া নিকট-বর্ত্তী ঝরণা হইতে জল লইয়া নিজহস্তে শিব-পার্ব্বতীর মুখে প্রদান করিলেন, এবং এইরূপ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তাঁহাদিগকে আরাধনা করিতে লাগিলেন যে, যদি তাঁহারা সত্যই জরাগ্রস্ত হইতেন, তবে সেই বাক্যই বুঝি মহৌষধির ন্যায় কাজ করিত। অতিথি দেবতাতুল্য, এই বিশ্বাসে ধরা তাঁহাদিগকে যে প্রার্থনা জানাইলেন, অতিথিবেশী দেবতারা তাহাতে পরিতৃপ্ত হইলেন। শুষ্ককণ্ঠে জল পাইয়া শিব বলিয়া

উঠিলেন, "এই জলে আমার কণ্ঠের বিষ ঘুচিল, ইহা জল নয়, অমৃত।"

বিষ্ণু দেখিলেন ধরা কতকগুলি তুলসী-মঞ্জরী ও বিল্বপত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইগুলি কি পূজার জন্য ?"

ধরা বলিলেন, "ইহার দ্বারা আমার স্বামী পূজা করিবেন।"

বিষ্ণু—"তিনি কি শৈব না বৈষ্ণব ? এরূপ ত কখনও দেখি নাই যে, বিল্বপত্র ও তুলসী উভয়েই এক পূজায় ব্যবহৃত হয় ?"

ধরা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানি না ; আমি যাহা পাই, তাহাই কুড়াইয়া রাখি। যাহা দেখি সকলই গৃহস্বামীর। ইহার কোন্ জিনিষ বাদ দিতে হয় তাহা জানি না। আমি বিল্বপত্র ও তুলসীদল, কুন্দকুসুম ও জবা সকলই গৃহস্বামীর বলিয়া জানি। যাহা সুন্দর দেখি, তাহাতেই তাঁহার কথা মনে পড়ে ; আমার স্বামী আমাকে কিছুই বাদ দিতে শিখান নাই। তোমরা ত জ্ঞানী। বল দেখি, এইরূপ করায় আমার অপরাধ হয় না কি ?"

বিষ্ণু—"কিছুমাত্র নহে। তোমার স্বামী কি কোনও বিগ্রহ পূজা করেন ?"

ধরা—"তিনি সকলই গৃহস্বামীর বলিয়া জানেন। যাহা দেখেন, তাহার মধ্যেই তাঁহার রূপ স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করেন। সেই আত্ম-সমর্পণের ভাব দেখিয়া আমারও চক্ষু জলপূর্ণ হয়। ছাগ-শিশু যখন তাহার জননীর পাছে ছুটিয়া যায়, তখন তিনি বলেন, 'হে নারায়ণ, ঐ ভাবে আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও, আমাকে তোমার কাছ ছাড়া করিও না।' এই বলেন, আর চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হয়। তিনি যে দেবতাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র দেখিয়া নির্ভর-পরায়ণ হন, আমি

সে দেবতাকে তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাই।" এই বলিয়া তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে পথের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

বিষ্ণু—"আর এখানে থাকা আমাদের উচিত নহে। ঐ দেখ উঁহারা পুনরায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি কি উঁহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে?"

ধরা—"হায় নারায়ণ! আমি কি উহাদিগকে মারিয়া ফেলিব?" এই বলিতে বলিতে ধরার চক্ষু হইতে দু'টি বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত গণ্ডের উপর আসিয়া পড়িল। তৎপরে হঠাৎ প্রসন্নভাবে সোৎসাহে ধরা বলিলেন, "তুমি অপেক্ষা কর। নিকটে একটা দোকান আছে, শ্রীবৎস নামক এক ব্যক্তি তাহার মালিক। আমি তোমাদের আহার্য্য সেইস্থান হইতে লইয়া আসিব, একটু অপেক্ষা কর।"

বিষ্ণু—"দেখ বিলম্ব করিও না।"

ধরা—"আমাদের ভাগ্যে অতিথি-সেবার সুযোগ হয় না, সেই সুযোগ কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিব? আমরা দরিদ্র, কিন্তু ভর্ত্তৃদেব বলিয়াছেন,—'আমাদের গৃহস্বামীর অতুল ভাণ্ডার।' তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁহারই কৃপায় আমার জীবন দিয়াও আজ অতিথি-সেবা করিতে পারি। আমার স্বামী বলিয়াছেন, 'অতিথি নারায়ণ'।"

৯

যুবতী ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অন্যজ্ঞান নাই, কেবল চিন্তা করিতেছেন, বিফল হইয়া অতিথি যদি গৃহ হইতে ফিরিয়া

যান, তবে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। বিশেষ ইঁহাদের মধ্যে দুইটি অশক্ত, বৃদ্ধ ও জরাতুর।

সেই গৃহ হইতে এবং গৃহ-সমীপবর্ত্তী বন-পথ হইতে ধরা কখনও অধিক দূরে যান নাই ; কিন্তু মুদির দোকান বেশী দূর নহে, সেই বন-পথ হইতে তাহা দেখা যায়। ধরা যাইতে যাইতে দেখিলেন, সূর্য্য অস্তচূড়াবলম্বী, স্থল-পদ্ম হেলিয়া পড়িয়াছে, মালতী ফুটিয়া উঠিয়াছে, সূর্য্যাস্তের রক্তিমাভা কৃষ্ণচূড়া ও অশোক ফুলের উপরে পড়াতে তাহা দ্বিগুণ রক্তবর্ণ হইয়াছে, যেন সিন্দূর-চূর্ণগুলি কঠোর হইয়া ফুলে পরিণত হইয়াছে। ধরার মনে হইল, সূর্য্যাস্তের রক্তিমা পরিয়া যেন সান্ধ্য-প্রকৃতি রক্তময় হইয়া উঠিয়াছেন। ধরা সশঙ্কিত ভাবে যাইতে লাগিলেন, কারণ তিনি অপরিচিত স্থানে কখনও যান নাই। দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহু লোক মৌমাছির মত উহা ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সকলের দৃষ্টি ধরার উপর পড়িল। একত্র এত লোকের দৃষ্টির বিষয়ীভূতা হইয়া সুন্দরী লজ্জিতা হইলেন। তিনি এরূপ লজ্জা আর কখনও জীবনে বোধ করেন নাই। তাঁহার অবগুণ্ঠন ছিল না, কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় নত করিয়া তিনি মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীবৎস তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে বলিল, "কে গা তুমি ? এ যে রূপের ডালি দেখ্‌ছি! এই শম্ভুপুর গ্রামে আমরা ত তোমাকে আর কখনও দেখি নাই।"

ধরা অতি ধীরস্বরে বলিলেন, "আমার স্বামীর কুটীর এই নিকটবর্ত্তী বন-মধ্যে, তাঁহাকে তোমরা সন্ন্যাসীঠাকুর বলিয়া জান।"

শ্রীবৎস—"তুমি আমাদের সন্ন্যাসীঠাকুর দ্রোণশর্ম্মার স্ত্রী! তোমার পায়ের ধূলি পড়িয়া এই কুটীর ধন্য হইল, তুমি কেন এসেছ ?"

ধরা এইভাবের কথায় কতকটা বিরক্তি বোধ করিলেন, কিন্তু অতিথি গৃহে অভুক্ত, তাঁহার অন্য জ্ঞান নাই। জলপ্লাবনের সময় মানুষ যেরূপ একটু স্থান লাভ করিয়া সর্পের কাছেও দাঁড়ায়, ধরা বিপদে পড়িয়া সেইভাবে সেখানে দাঁড়াইয়াছেন—আর কিছু চিন্তা করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। তিনি পুনরায় দীনার্ত্তস্বরে বলিলেন, "আমার গৃহে তিনটি অতিথি অভুক্ত, আমার স্বামী ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন, এই অতিথি সেবার জন্য আমি দ্রব্যাদি চাই, তুমি আমাকে দাও, আমার স্বামী পরে তোমার প্রাপ্য শোধ করিবেন।"

শ্রীবৎস তাঁহার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, আমি আগে ইহাদিগকে বিদায় করিয়া লই।"

তখন যে ব্যক্তি মুগডা'ল চাহিয়াছিল, তাহাকে আটা মাপিয়া ঠোঙ্গাটা হাতে দিতে, সে চটিয়া লাল হইল। শ্রীবৎস ভুল সংশোধন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। "তুমি কি গাঁজা খাইয়া দোকানদারি কর?"—এই বলিয়া গালাগালি দিয়া ক্রেতা মুগডা'ল লইয়া চলিয়া গেল। শ্রীবৎস দাম চাহিতে ভুলিল, ক্রেতাও তাহা না দিয়া চলিয়া গেল। তারপর যে যাহা চাহিল শ্রীবৎস বলিল, "চালান আসে নাই, কাল প্রাতে সকল জিনিস আসিবে, তখন সকলেই পাইবে।" তৈল-প্রার্থী বলিল, "বাঃ, তোমার হাঁড়িভরা তৈল এই যে রহিয়াছে।" শ্রীবৎস বিরক্তির সহিত বলিল, "এ তেলটার পড়্‌তা বেশী পড়িয়াছে, ফিরাইয়া দিবার জন্য রাখিয়াছি, নতুবা জিনিষ থাকিতে কি বিক্রয় না করিয়া রাখিলে আমার লাভ আছে?" একজন কাঠ কিনিতে আসিয়াছিল, তাহাকেও "কাঠ নাই" বলাতে সে বলিল, "ঐ যে কাঠ সাজানো রহিয়াছে. উহা কি তোমার চিতার জন্যে?" একজন দুষ্টলোক

বলিল, "শ্রীবৎস স্ত্রীলোকটার চাঁদপানা মুখ দেখিয়া ভুলিয়াছে, দেখিতেছনা কেমন মাতালের মত কথা বলিতেছে?"

এই ভাবে ক্রেতাদলকে বিদায় করিয়া শ্রীবৎস ধরাকে বলিল, "এখন বল কি কি জিনিষ চাই।" ধরা ঘি, আটা, চিনি ও কাষ্ঠ চাহিলেন। শ্রীবৎস বলিলেন, "তুমি কি দিবে?" ধরা কাতরভাবে বলিলেন, "কি দিব? আমার কিছুই নাই যে আমি দিব? আমার স্বামী গৃহে আসিয়া যেরূপে হয় তোমার প্রাপ্য শোধ করিয়া দিবেন। আমায় এই বিপদ্ হইতে রক্ষা কর।"

শ্রীবৎস—"তোমার নিকট যদি কিছু থাকে, প্রতিশ্রুত হও, তাহা আমাকে দিবে?"

ধরা—"আমি ভগবানের নাম করিয়া বলিতেছি আমি নিঃস্ব, আমার কিছুই নাই। যদি কিছু থাকিত, অবশ্য দিতাম; যদি কিছু থাকে, প্রমাণিত হয়, অবশ্য দিব, প্রতিশ্রুত হইলাম। কিন্তু দোকানদার! আমার কিছুই নাই।"

শ্রীবৎস বলিল, "বস্, যথেষ্ট।" তখন সে একটা পূর্ণঘট ঘৃত, উপযুক্ত পরিমাণে আটা, চিনি ও কাঠ একটি সাজির ভিতর পুরিয়া সাজাইয়া রাখিল, এবং দোকানের মঞ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া ধরার নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল ও বলিল, "তোমার প্রতিশ্রুতি এই বেলা রক্ষা কর।"

ধরা বলিলেন. "আমার যদি কিছু থাকিত, তা' হইলে তোমাকে দিতাম। আমার কিছুই নাই, আমি নিঃস্ব।"

তখন মাতৃমূর্ত্তি-রমণীকুলের যাহা হইতে স্নিগ্ধ-সুধারস নিঃসৃত হইয়া নিঃসহায় অনন্ত-নির্ভরশীল শিশুকে পালন করে, যাহার ধারায় শত শত গঙ্গাধারার পবিত্রতা প্রবাহিত হয়, শিশুর সানন্দ হাসিমুখ যাহাতে লিপ্ত

হইলে সেই দৃশ্য পৃথিবীতে স্বর্গের আভাস দেয়, যাহা করুণারূপিণী রমণীর করুণার তোরণস্বরূপ, যাহার ক্ষরিত রস পরমানন্দময়ের আনন্দকণা বিতরণ করিবার সুধাভাণ্ডস্বরূপ,—রমণীর যে যুগ্ম-স্তন মানবরক্ষার জন্য অনন্ত দয়ায় ভগবান্ স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পাপ-বিকারগ্রস্ত শ্রীবৎস স্বীয় ভোগবাসনা তৃপ্তি করিবার জন্য ধরার নিকট তাহাই চাহিল। ধরা প্রথম তাহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আতিথ্য-পালনের স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, হঠাৎ যেন স্বর্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মুহূর্ত্তপরে ধরা বুঝিলেন, শ্রীবৎস কি চাহিতেছে! ধরা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই তুচ্ছ ক্ষণবিধ্বংসী দেহের জন্য তিনি কিরূপে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন? সহসা ধরা মঞ্চের পার্শ্ববর্ত্তী শাণিত ছুরিখানি তুলিয়া লইলেন, এবং স্বীয় বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দুইটী স্তন সেই ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীবৎসের নিকট ধারণ করিলেন। "এখন এই সকল দ্রব্যে আমার অধিকার হইয়াছে"—এই বলিয়া দ্রব্য-সমেত সাজি লইয়া তিনি গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৎস তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

তখনও সূর্য্যাস্তের প্রভা বিলীন হয় নাই, সেই প্রভামণ্ডিতা প্রকৃতি যেন শোণিতার্দ্রা। যেন ধরার অঙ্গের শোণিত প্রকৃতি নিজ অঙ্গে লইয়াছেন। রক্ত-রঞ্জিত-বল্কলা রমণী সেই বনপথে চলিলেন। এ কি ছিন্নমস্তা, যিনি নিজ শির নিজহস্তে কাটিয়া ত্যাগের আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠা করেন? ধরার দেহ কুসুম-সুকুমার, কিন্তু কঠোর সত্যপালনে ধরা বজ্রসম। এ কি কোমল, না কঠোর? এ কি বীণাধ্বনি, না দুন্দুভি-শব্দ? এ কি ফুলশর, না গাণ্ডীব? ধরা ভগবানকে পাইয়াছেন, তিনি উভয়ই। তিনি প্রকৃতির মত লীলাময়ী ও সুন্দরী, এবং তিনি

প্রকৃতির মত রণরঙ্গিণী, অথবা প্রকৃতি যে পুরুষের স্পর্শলাভ করিয়া লীলা করিতেছেন, তাঁহারই মত নির্ব্বিকারহৃদয়া।

১১

শ্রীমুখ পদ্মের মত, বেদনায় চক্ষু হইতে জল পড়িতেছে, সমস্ত শরীর রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে; আতিথ্যের উপকরণসহ সাজিটী লইয়া ধরা কুটীর-আঙ্গিনায় সেই ভাবে আসিয়াই পড়িয়া গেলেন। বিষ্ণু ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। ছদ্মবেশীদের জরা ঘুচিয়া গেল। তাঁহারা ধরার পার্শ্বে আসিলেন, এবং একত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ দুর্দ্দশা কে করিয়াছে?"

ধরা করুণকণ্ঠে বলিলেন, "আমি আতিথ্য ও সত্যপালন করিয়া যেন জীবনদান করিতে পারি, আমার গৃহস্বামী বিষ্ণুর নিকট এই ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। আজ জীবনপণে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিলাম। আপনারা অতিথি-নারায়ণ, আমাকে পদধূলি দিন, আমার জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমার স্বামী এখনও আসিলেন না!"

তখন বিষ্ণু চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেন; শঙ্খ-নিনাদে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল; চক্র অন্তরীক্ষে ধ্বংসের জন্য উন্মুক্ত হইল, এবং প্রভু-কর-ধৃত অনিন্দ্য পদ্মপুষ্পটি আশীর্ব্বাদের ন্যায় ধরার মস্তকের সিন্দূরের উপর পড়িয়া গেল! শিব ত্রিশূল লইয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার জটাজুটে কলনাদিনী গঙ্গা ভৈরবস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং দানবদলনী সিংহারূঢ়া হইয়া উপস্থিত হইলেন! সহসা সেই স্থান দিব্যতেজে আলোকিত হইল। ধরা যুক্তকরে বলিলেন, "আমার প্রতি আপনাদের করুণা

হইতে এই ক্রোধ সঞ্জাত হইয়াছে। সেই করুণার দোহাই দিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা বলসঞ্চার করিয়া দুর্ব্বলকে সবল করুন; সে ব্যক্তি করুণার পাত্র, তাহাকে ধ্বংস করিবেন না।”

বিষ্ণু বলিলেন, “তথাস্তু, কিন্তু তুমি তোমার স্তনদ্বয় সত্যরক্ষার জন্য আমাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছ, উহা আমার প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আমি ভূভারক্রান্তা বসুধার উৎপীড়ন নিবারণের জন্য শীঘ্র মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইব,—তখন তুমি যশোদা হইয়া বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিবে, আমি তোমার শ্রীহস্তের প্রহার সহ্য করিয়াও তোমার ঐ স্তনদ্বয়ের সুধা পান করিব।” শিব বলিলেন, “আমি যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের গাভী-রক্ষার জন্য ব্রজেশ্বররূপে তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিব।” পার্ব্বতী বলিলেন, “আমি যোগমায়ারূপে বৃন্দাবনে থাকিয়া ভগবানের বাল্যলীলার সহায়তা করিব।”

এই সময়ে কুটীর-দ্বারে এক ভিখারী তাঁহার পত্নীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সজল চক্ষে তাঁহার আহৃত ভিক্ষার পুঁটলিটি বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, “দ্রোণ, তুমি এমন স্ত্রীর স্বামী, তুমি ভাগ্যবান, তোমার পুণ্যবলে আমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পুত্রত্ব স্বীকার করিব। তোমার নাম ‘নন্দ’ হইবে, এবং তুমি ব্রজগোপকুলের শ্রেষ্ঠ হইবে।”

১১

দ্রোণ

পরীক্ষিত বলিলেন, "দেব, আপনি বলিয়াছেন, মনুষ্য নিজের কর্ম্ম-ফলানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। দ্রোণের এমন কি মহা পুণ্যবল ছিল, যাহাতে ধরার মত স্ত্রীরত্ন তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার গৃহে পুত্ররূপে বাস করিয়াছিলেন?"

শুকদেব বলিলেন, "দ্রোণ পূর্ব্বজন্মে সংসারে থাকিয়াও প্রকৃত তপস্বী ছিলেন। তিনি অকৃতদার, জীবের প্রতি পরম দয়াবান এবং ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণশীল ছিলেন। তিনি একদা স্বীয় বাসস্থান হইতে দূরে নীলগিরিতে তপস্যা করিতে গমন করেন। সেই সময়ে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন প্রখর সূর্য্যতেজে সে স্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তপস্বী পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তরুপত্র-পল্লব দগ্ধ; শত শত গো, মেষ ও অপরাপর পশু মৃত; ভীষণ দুর্ভিক্ষতাপে পল্লীগুলি মনুষ্য-শবে পূর্ণ। সেই প্রদেশ তাঁহার চক্ষে শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইল। তাপসের হৃদয় জীবকষ্টে ব্যথিত হইল এবং তাঁহার চিত্তে ত্যাগের ইচ্ছা বলবতী হইল। ক্ষুণ্ণমনে পরম কৃপাপূর্ণ চক্ষে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তিনি পার্ব্বত্যপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা সম্মুখে তিনি এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। একটা ব্যাঘ্রী তাহার তিনটী শাবক লইয়া অদূরে একটী শুষ্কপ্রায় সরিতের পার্শ্বে পড়িয়া আছে। শাবক তিনটী অনাহারে বিশীর্ণ, মৃতপ্রায়। তাহাদের চক্ষুতারা উর্দ্ধগ; ব্যাঘ্রীর বক্ষের উপরে পড়িয়া তাহারা ওষ্ঠপুট স্তনে লগ্ন করিয়া

রহিয়াছে। সেই স্তনে স্নেহসার শুষ্ক, শাবকের জন্য মাতৃভাণ্ডার শূন্য,—তাহাদের মুখ স্তন হইতে খসিয়া পড়িতেছে। অনাহারে ব্যাঘ্রীরও দেহপঞ্জর কাঁপাইয়া অন্তিম নিঃশ্বাস বহিতেছে; কিন্তু তাহার চক্ষে তখনও মাতৃ-স্নেহের মোহ ঘুচে নাই; স্নিগ্ধনেত্রে সে মধ্যে মধ্যে শাবকত্রয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, এবং স্বীয় কর্কশ ও বিশুষ্ক জিহ্বা প্রসারণপূর্ব্বক তাহাদিগের শরীর লেহন করিতে চেষ্টা পাইতেছে!

সেই দৃশ্য-দর্শনে তাপসের জগজ্জননীর কৃপা মনে পড়িল। "হায় মাতঃ, তুমি পশুর চিত্তেও সিংহাসন পাতিয়া আছ; এখানেও তুমি আত্মকষ্টবিস্মৃত; সন্তান-পালনের উৎকণ্ঠায় মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছ! মাতঃ, তুমি নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ব্যাঘ্রীর চক্ষেও স্বর্গের করুণা আনিয়াছ! তোমার সুধাভাণ্ড জীব-পালনের জন্য এই ভাবে নির্ব্বিচারে সর্ব্বস্থানে রক্ষিত! হায় ব্যাঘ্রী, তোমার পশুত্ব আমি দেখিতে পাইতেছি না, তোমার উৎকণ্ঠিত চক্ষে—তোমার কর্কশ জিহ্বায় আমি জগন্মাতাকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। মা, আজ তোমার কি আমি কোনরূপে সাহায্য করিতে পারি না?"

ক্ষণেক এই চিন্তা করিয়া তাপস তাঁহার শির হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন; অঙ্গরক্ষা ও বহির্ব্বাস ছুড়িয়া ফেলিয়া কাষ্ঠপাদুকা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্যাঘ্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা, এইখানে তোমার খাদ্য তুমি আহার করিয়া পুষ্ট হও এবং তোমার স্তন্য পর্য্যাপ্ত হউক, এই শাবকত্রয়ের জীবনরক্ষা হইবে।"

ব্যাঘ্রী তাঁহার কথা বুঝিল বা না বুঝিল, কিন্তু তাহার খাদ্য চিনিল। সে আসন্ন মৃত্যুকে পরাভব করিয়া এক উৎকট লম্ফে তাপসকে আক্রমণ করিল। তাহার চিরক্ষুধায় বিকাশমান দন্তরাজি শাণিত খড়্গের ন্যায়

তাপসের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। তাপস অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে ব্যাঘ্রীর স্তন্যসঞ্চারের সম্ভাবনায় করুণা-বিগলিতচিত্তে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, এবং এই অবস্থাতেই দেহ-ত্যাগ করিলেন।

এই অপত্যভাবের পুরস্কার-স্বরূপ, আর-একজন্ম আরাধনার পরে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার পুত্র হইয়া বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন।"

কুশধ্বজ

১

"বাবা নিশ্চয়ই কিছু খাবার পাইয়াছেন, তাই ডাকিতেছেন।" আজন্ম-ভিখারী সিদ্ধান্তের তিনপুত্র এই বলাবলি করিয়া খেলুড়েদের নিকট বিদায় লইল। জনার্দ্দন বলিল, "দেখিস্ ভাই, দেরি করিস্ না, বিশেটা পাথরের উপর পড়িয়া গিয়া আজকার মত খোঁড়া হইয়াছে। তোরা তিনভাই চলিয়া গেলে আর খেলা হইবে না।" জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ বলিল—"আধ-দণ্ডের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি। এই সময়টা লখা সীতার অগ্নি-পরীক্ষার পালাটা অভিনয় করিয়া দেখাক, তারপর আমরা আসিয়া আবার হাডু-ডু-ডু খেলিব।"

তিন ভাই দৌড়াইয়া চলিল; সর্ব্বকনিষ্ঠ কুশধ্বজ সকলের অগ্রবর্ত্তী; সে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তিশালী। আকাশে একটা বড় পাখী উড়িয়া যাইতেছিল, কুশধ্বজ তাহার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। পক্ষীটা হঠাৎ খুব উপরে উড়িয়া যাওয়াতে, ছায়াটাও অন্তর্হিত হইল। কুশধ্বজ কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল; একটা ইটের উপর পা পড়াতে সে বেদনা পাইয়াছিল। মধ্যম বল্লভ আসিয়া বলিল,— "দেখি কোন্ জায়গাটায় লাগিয়াছে? যা'—কিছু হয় নাই, এতে কাঁদিতেছিস কেন রে পাগলা? সে দিন তপ্ত-মুড়ির খোলায় হাত দিয়া আমার হাত পুড়িয়া এত বড় একটা ফোস্কা পড়েছিল, তাতে আমি কাঁদি নাই, তোর হ'লে ত তুই কি কর্‌তিস!" কুশধ্বজ উঠিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। দুই এক ফোঁটা জল তখনও চক্ষে ছিল, অধরে হাসিটুকু অনেকক্ষণ রহিল, একখানা জলভরা মেঘের পার্শ্বে ইন্দ্রধনুর মত সেই হাসিতে তাহার শ্রীমুখ উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

তখন অপরাহ্ণ। আবার কুশধ্বজ দৌড়াইয়া চলিল। বল্লভ বলিল —"কুশে, আবার তুই পড়িয়া গিয়া পা কাটবি, আমার কথা যদি ঠিক না হয়, তবে কি বলিব।"

এই ভাবে তিন ভাই বাড়ীতে আসিল। "বাবা আজ কি খাবার আনিয়াছেন?" তিন জনই পরস্পরকে আবার এই প্রশ্ন করিল, ও সানন্দচিত্তে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তিনটি আনন্দের পুতুল কোলাহল করিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

একখানা ছেঁড়া মাদুরে বৃদ্ধ সিদ্ধান্ত বসিয়া আছে। তাঁহার সম্মুখে প্রৌঢ়বয়স্ক রাজবেশ পরিহিত একটী ভদ্রলোক। সিদ্ধান্ত শিশুত্রয়কে দেখিয়া যেন লজ্জা ও ক্ষোভে চক্ষু অবনত করিল। বালকেরা পিতার এই ভাব দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; স্ফুর্ত্তিমান্ কুশধ্বজও যেন স্ফুর্ত্তিহীন হইল। তাহারা তিনজনে নতচক্ষে পিতার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এক মুহূর্ত্ত পরে সিদ্ধান্ত মুখ তুলিয়া কুশধ্বজের দিকে চাহিলেন; মৃদুস্বরে ভীতকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"কুশধ্বজ, দেখ না খাইয়া আমি অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছি, তোমার মাতাও সেইরূপ। সারাদিন ভিক্ষা করিয়াও উদরান্ন জোটে না, পরিবার ধূতিখানিও শতগ্রন্থি। আমি এত কষ্ট আর সহিতে পারি না। তুমি মনে করিলে আমি এই কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।"

কুশধ্বজের সুমিষ্ট-স্বর বীণার ন্যায় বাজিয়া উঠিল। আর্দ্রস্বরে বালক উত্তর করিল,—"বাবা, আপনার কথা শুনিয়া আমার বিস্ময় হইতেছে। আমার এই আট বৎসর বয়স, আমার বড় দুই ভাই এখানে উপস্থিত। এই বয়সেই যদি দাদাদের চেয়ে আমার এইরূপ যোগ্যতা হইয়া থাকে

যে, আপনাদের দুঃখ দূর করিতে পারি, তবে আমার সৌভাগ্যের শেষ নাই। যদি আমাকে বিক্রয় করিয়া আপনাদের বিপদ্ ঘোচে তবে তাহাই করুন।"

সিদ্ধান্ত বলিলেন,—"কুশধ্বজ, আমি তাহাই করিয়াছি। এককোটী স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া আমি তোমাকে যযাতি রাজার মন্ত্রী সুমন্ত্রের নিকট বিক্রয় করিয়াছি। রাজা তাঁহার পিতা নহুষের স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করিতেছেন, অষ্টমবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ-বালককে আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞানল নির্ব্বাণ করিতে হইবে। কুশধ্বজ, তোমার মাতাপিতা ও ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে তোমাকে প্রাণ দিতে হইবে।"

অপর দুই ভাই সমস্বরে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাদিগের তিনজনকেই লইয়া যান্; আমরা প্রাণের ভাই কুশধ্বজকে ছাড়িয়া বাঁচিতে চাহি না। পিতার দারিদ্র্যের জন্য আমরা তিনজনেই সমভাবে দায়ী! একা কুশধ্বজ কেন? তিন ভাই একত্রে আগুনে জীবন আহুতি দিয়া পিতার দায় উদ্ধার করিব।" রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র অতি বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "অষ্টমবর্ষবয়স্ক একটী মাত্র ব্রাহ্মণশিশুর প্রয়োজন।"

২

জননীর ক্রোড় হইতে কুশধ্বজকে সিদ্ধান্ত সবলে কাড়িয়া লইল। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। নিরীহ গাভী এবং মেষও বৎসের বিপদে শিং নাড়িয়া মারিতে আসে!

কুশধ্বজের মাতা বালককে ধরিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

কুশধ্বজ দূর হইতে মাতাকে প্রণাম করিয়া জোড়হস্তে বলিল—"মা, আমায় চিরদিনের জন্য বিদায় দাও, তোমার অপর দুই ছেলে রহিল, তাদের মুখে 'মা' ডাক শুনিয়া জুড়াইও। নিদারুণ দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া বাবা আজ আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাকে কটুকথা বলিও না, তিনি তোমার গুরু। আমরা যেরূপ কাজ করিয়া থাকি, জন্মে জন্মে তাহারই ফলভোগ করি।"

পিতার সঙ্গে বালক চলিল। জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে সংজ্ঞাহীনা মাতার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখে জলসেচন করিতে লাগিল,—কিন্তু বল্লভ ধীরভাবে কুশধ্বজের পশ্চাদ্গামী হইল।

সিদ্ধান্ত সুমন্ত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই নিন্ আমার অষ্টম বৎসরের পুত্র কুশধ্বজকে।"

দয়ার্দ্রচক্ষে মন্ত্রী বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন অনিন্দ্য কমলের ন্যায় তাহার মুখখানি ঢল ঢল করিতেছে; মাতৃদুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। তাহাকে করুণার একখানি জীবন্ত প্রতিচ্ছবির ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। সারথী বালককে লইয়া রথে উঠিল। সুমন্ত্র ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিয়া বালকের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। সারথী অশ্বচতুষ্টয়কে কশাঘাত করিল; রথ ঘর্ঘরশব্দে চলিল। সুমন্ত্র চাহিয়া দেখিলেন, রথের চাকার সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মত বল্লভ ছুটিতেছে। উন্মত্ত বালক "কুশে ছাড়িয়া যাস্ না" বলিয়া চীৎকার করিয়া রথের চাকা ধরিয়া ফেলিয়াছে; চক্রের আবর্ত্তনে বালক তখনই প্রাণত্যাগ করিত,—সারথী রথ থামাইয়া তাহাকে

ধরামাত্র সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সুমন্ত্র রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বালককে গৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় রথারূঢ় হইলেন, আবার রথ চলিল।

তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত বিপুল অর্থ সম্মুখে করিয়া কুটীরে বসিয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সেই অর্থ বিষ বলিয়া বোধ হইল,—ভিক্ষালব্ধ ক্ষুদকণা অমৃত বলিয়া মনে হইল,—এই বিনিময় ব্যাপারে সে জিতিয়াছে, এইরূপ ধারণা হইল না।

রথ সেই খেলার মাঠ দিয়া চলিয়াছে। বালকগণ তখনও কুশধ্বজ এবং তাহার অগ্রজদ্বয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। জনার্দ্দন বলিল, "হ্যাঁ, দেখিয়াছিস রাজার রথে কুশে!" তখন অর্জ্জুন চীৎকার করিয়া বলিল, "কি রে কুশে, তুই কোথায় যাইতেছিস, আমরা তোদের আশায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।"

কুশধ্বজ হাতজোড় করিয়া বলিল, "অজুদাদা, আমি তোমায় প্রণাম করিতেছি। তোমরা আমাকে ছোট ভাইটির মত ভালবাসিয়াছ, বিদায়, ভাই সব; আমি আর তোমাদের সঙ্গে খেলিব না, বড়দাদা ও মেজদাদাকে লইয়া খেলিও। মেজদাদা ও মা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, তোমরা যাইয়া তাঁহাদের শুশ্রূষা কর, আমার খেলা-ধূলা শেষ হইয়াছে।"

বালকেরা রথের ঘর্ঘর-শব্দে সেই কথার কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না। রাজরথ বালকের জন্মভূমির বুকের উপর কঠিন চক্রের দাগ রাখিয়া, শ্যামাঞ্চলা বসুধাকে নিপীড়ন করিয়া চলিয়া গেল। কুশধ্বজ দেখিল, অদূরে অশ্বত্থগাছের উপর একটা কুলায়ের পার্শ্বে ডাহুকপক্ষী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে; সে মনে ভাবিল,

পাখীটা নিশ্চয়ই তাহার শাবক হারাইয়াছে, তখন তাহার চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

৩

সরযূর বনরাজি-শোভিত উত্তর তীরে বড় বড় শিবির পড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। গিরিব্রজপুর হইতে নৃপতি জয়সেন আসিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে বিপুল নৌ-সৈন্য, তাহারা সরযূর অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া আছে। মালব-দেশ হইতে পুষ্করদেব উপস্থিত; তাঁহার সঙ্গে পঞ্চশত দেহ-রক্ষক, তাহাদের মহার্ঘ্য শিরোরত্ন নক্ষত্র-পংক্তির ন্যায় জ্বলিতেছে। সিন্ধুকুলবাসী গোকর্ণ নৃপতির তুরঙ্গরাজি তুষারশুভ্র, তাহারা যেদিকে রহিয়াছে, মনে হইতেছে যেন সেদিকে সফেন তরঙ্গ আন্দোলন করিয়া শুভ্র জলপ্রপাত ছুটিয়াছে। গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনের শিবির দিব্য তেজে আলোকিত—সরযূর তীরে তথায় যেন দ্বিতীয় স্বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে! যযাতি রাজচক্রবর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার নিমন্ত্রণে গৌরব অনুভব করিয়া সকল রাজাই অযোধ্যায় আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ভাট ও দরিদ্রগণের ভোজনের জন্য স্থানে স্থানে অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। এক সহস্র ব্যক্তির ভোজন শেষ হইলে এক একবার ঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে, এই প্রকার ঘণ্টা মুহুর্মুহুঃ বাজিয়া উঠিতেছে। রাজধানী লোকারণ্যের মত বোধ হইতেছে। রাজগণের বিচিত্র উপঢৌকনরাশি বানের জলের মত আসিতেছে। মুক্তা, প্রবাল, বহুমূল্য প্রস্তর, কীটজ ও লোমজ বিবিধ প্রকার মহার্ঘ্য বস্ত্রের অবধি নাই। ধনরক্ষকগণ সেইগুলি গ্রহণ

করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। চতুর্দ্দিকে আনন্দ ও কোলাহল। রাজপুরীর নয় দিকে নয়টি বিপুল পুষ্পতোরণ উঠিয়াছে। নহবতের সুশ্রাব্য বাদনে দিগ্‌দেশ মুখরিত হইতেছে। এই বিপুল ব্যাপার, এই দান, ধ্যান ও কর্ম্মকাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। অগ্নিদেব একটি অনাথ অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-বালককে গ্রাস করিবার জন্য যেন জিহ্বা প্রসারিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। যজ্ঞকুণ্ডের নিকট বশিষ্ঠ ও বামদেব আসীন। যযাতি চিন্তাকুল চিত্তে পুনঃ পুনঃ প্রতিহারীর নিকট স্বয়ং যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এখনও সুমন্ত্র ফিরিল না?" প্রতিহারী করজোড়ে নিবেদন করিতেছে, "মহারাজ, মন্ত্রী আসিলে রথের শব্দ শোনা যাইত।"

বামদেব বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-বংশে এমন কে চণ্ডাল আছে, যে অর্থলোভে অষ্টমবর্ষীয় বালককে অগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য বিক্রয় করিবে?"

রাজার দুশ্চিন্তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন সময় কোলাহল-শব্দে চার পাঁচটি প্রতিহারী একত্র ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, মন্ত্রী আসিয়াছেন।"

যযাতি স্বয়ং তোরণপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বহু জনতা ঠেলিয়া কুশধ্বজ-সহ সুমন্ত্র রাজার নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন নহবৎ উচ্চতম তানে বাজিয়া উঠিল, রাজপুরীর কোলাহল দ্বিগুণ হইল। কিন্তু কুশধ্বজ সে সমস্ত কিছুই শুনিতে পাইল না। তাহার কর্ণ একাগ্র হইয়া কল্পনায় তাহার জননীর আর্ত্তনাদ শুনিতেছিল।

৪

রাজা সাদরে ব্রাহ্মণ-শিশুকে স্বীয় সিংহাসনের একপার্শ্বে বসাইলেন; বালকের সুকুমার রূপ দেখিয়া সভার লোকবৃন্দ ব্যথিত হইল। বামদেব তাহার বংশ ও গোত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, বালকের তাহা বলিতে কোনও ভুল হইল না। বশিষ্ঠ বলিলেন, "বালক উত্তম ব্রাহ্মণ বটে।"

যযাতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অষ্টাদশ দিন হোমানল জ্বলিতেছে, এখন আপনাদের আর কি কার্য্য বাকী আছে?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আজ যজ্ঞের শেষ দিন। এই শ্রেষ্ঠ-বলি উৎসর্গ কর। হইলে যজ্ঞ শেষ হইবে। মহারাজ অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করুন।"

বশিষ্ঠের আদেশমত পরিচারকগণ কুশধ্বজকে রাজপুরীর পুষ্করিণীর মর্ম্মর-প্রস্তর-রচিত ঘাটে স্নান করাইতে লইয়া চলিল। তাহারা আমলকী দিয়া বালকের মলিন অঙ্গ পরিষ্কার করিল। কুশধ্বজ জলে নামিয়া স্নান করিল, এবং স্নানমুখে ঘাটের উপর উঠিল। সেই সুকুমার বিষণ্ণ মুখখানি দেখিলে পাষণ্ডের মনেও অপত্য-স্নেহ জন্মিত।

পরিচারকগণ অগুরু ও চন্দন লইয়া তাহার কপালে, নাসিকা ও গণ্ডে অলকা-তিলকা সুচিত্রিত করিয়া দিল, স্বর্ণপাড়যুক্ত মহার্ঘ্য রক্তপট্টবাস তাহাকে পরাইবার জন্য লইয়া আসিল।

বালক ক্ষীণস্বরে বলিল, "এই বহুমূল্য বস্ত্র কেন পোড়াইয়া ফেলিবে? আমাকে এক বিঘৎ-প্রমাণ একখানি কৌপীন দাও।"

পরিচারক সাশ্রুচক্ষে সেই রক্তবাস তাহাকে পরাইয়া দিল এবং

সকলে মিলিয়া তাহাকে রাজসভায় পুনরায় লইয়া আসিল। যখন সে হোমানলের পার্শ্বে আসিল, তখন তাহার সুসজ্জিত সুন্দরমূর্ত্তি অগ্নি-প্রভায় ঝল্মল্ করিতে লাগিল। সেই হোমাগ্নি দেখিয়া কুশধ্বজের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল এবং মুখ শুকাইয়া গেল।

রাজা স্বয়ং তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। স্বর্ণ-থালে বিবিধ মিষ্টান্ন ও সুপক্ক ফল তাহার আহারের জন্য আনীত হইল। কুশধ্বজ রাজাদেশে তাহা খাইতে বসিল, কিন্তু হাত দিয়া শুধু নাড়িতে-চাড়িতে লাগিল; অগ্নি-কুণ্ড দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল।

তৎপরে যযাতি পরিচারকগণ-বেষ্টিত হইয়া বালককে হোমাগ্নির নিকট আনয়ন করিলেন। বামদেব বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-বালক, এইবার ভগবান্‌কে আত্মনিবেদন করিয়া দাও।"

বালকের কর্ণে সেই বাক্য সদ্‌গুরুর উপদেশের মত কার্য্য করিল। সহসা সে সমস্ত মনঃপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, এই সময়ে প্রত্যহ সে মাতার বক্ষোলগ্ন হইয়া নিদ্রিত হয়; মাতৃবক্ষের পরিবর্ত্তে জলন্ত অগ্নি প্রসারিত। সে বলিল, "মহারাজ, আমি কিছুকাল ভগবান্‌কে ডাকিয়া লই, তারপর নিজেই আগুনে ঝাঁপ দিব; আমি শিশু, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।"

এই কথায় যযাতির চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল; তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। যুক্তকরে কুশধ্বজ মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। তাহার ভাষা সুসংবদ্ধ হয় নাই; কিন্তু একাগ্রমনে সরলভাবে সে ডাকিল, "হে বিষ্ণু, শুনিয়াছি তুমি যজ্ঞরাজ, আমাকে আহুতি-স্বরূপ গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ করিয়া ইঁহাদের যজ্ঞ পূর্ণ কর। শিশু ভয় পাইলে, মাতাপিতার আশ্রয় পায়, কিন্তু আমার মাতাপিতা আমাকে

ত্যাগ করিয়াছেন! দুঃখে পড়িলে লোকে আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্য পায়, আমার আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই। উৎপীড়িত ব্যক্তি রাজার নিকট সুবিচার পায়, আমার পক্ষে বিনাদোষে রাজা অগ্নিকুণ্ডে মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন! হে বিষ্ণু, তুমি অগতির গতি, কিন্তু তুমি এই যজ্ঞের কর্ত্তা, আমি আর কার কাছে যাইব? সংসারে আর আমার কেহ নাই।"

অন্তিম-সময় স্মরণ করিয়া সে পুনঃপুনঃ তাহার দুঃখিনী মাতাকে স্মরণ করিল। যে অগ্নিতে সে প্রবেশ করিবে, তাহার মধ্যেও যেন সে মাতাকে খুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল; "সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, মা আজ আমাকে ঘুম পাড়াইলে না? আমাকে ঘুম পাড়াইয়া যাও, আমাকে তোমার কোলে লও মা, আমি তোমার কাছে যাইব। তুমি এ দৃশ্য দেখিলে না! আমার গায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে তোমার কষ্ট হইত; একবার আসিয়া দেখ, তোমার প্রিয়তম ছোট ছেলে আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে।"

তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া তাহার মাতার জন্য আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। বালক নীরবে ভগবানকে স্মরণ করিতেছিল, কিন্তু এবার 'মা' 'মা' বলিয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্ত পরে কুশধ্বজ সংযত হইয়া বলিল, "আমার ভয় চলিয়া গিয়াছে, ঐ হোমাগ্নির মধ্যে স্নিগ্ধ অঞ্চল দোলাইয়া মা বসিয়া আছেন, তোমরা দেখিতে পাইতেছ না? তিনি পাগলিনীর মত হাত বাড়াইয়া আমাকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, তোমরা আমাকে নিক্ষেপ কর, আমি নিজে ঝাঁপ দিতে পারিতেছি না।"

৫

রাজাজ্ঞায় দুইজন পরিচারক তাহাকে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল ; এমন সময় যজ্ঞকুণ্ড হইতে বিষ্ণুকে পশ্চাতে রাখিয়া সপদ্ম দক্ষিণ-কর প্রসারণ-পূর্ব্বক স্বর্গীয় সৌরভে দিক্ আমোদিত করিয়া লক্ষ্মী আবির্ভূ'তা হইলেন ; তাঁহার কুন্তল আলুলায়িত, শোকে চক্ষু আর্দ্র ও অধর স্ফুরিত। সমস্ত করুণাসাগর মন্থন করিয়া তিনি যে পদ্মটি আনিয়াছেন, তাহা বালকের করে প্রদান করিলেন এবং স্বীয় কমনীয় উৎসঙ্গে বালককে তুলিয়া লইয়া তদীয় শিরোপরে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পশ্চাতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু।

রাজসভার সমস্ত লোক মুগ্ধ ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। বিষ্ণু বলিলেন, "এই বালকবধযজ্ঞের ব্যবস্থাদাতা কে?"

করযোড়ে যযাতি বলিলেন, "আমার পিতা নহুষ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত, তাঁহারই আদেশানুসারে এই যজ্ঞ হইতেছে। যজ্ঞ পূর্ণ হইলে তিনি স্বর্গে স্থানলাভ করিবেন।"

বিষ্ণু বলিলেন, "যজ্ঞ পূর্ণ হইয়াছে। আমি ইহা পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তুমি বালককে ইহার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দাও।"

এই বলিয়া বিষ্ণু লক্ষ্মীসহ অন্তর্হিত হইলেন। লক্ষ্মী যাইবার সময় বালকের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন ; সেই দৃষ্টির সঙ্গে একটি অনিন্দ্য পদ্মপুষ্পের মালা দিবচ্যুত হইল, এবং কে অদৃশ্য-করে তাহা বালকের কণ্ঠে পরাইয়া গেল।

যযাতি দেখিলেন, বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে

নহুষ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও কমলার সঙ্গে স্বর্গধামে গমন করিতেছেন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, "কুশধ্বজ, আমরা যোগতপ করিয়া যাঁহার দর্শন পাই না, তুমি সরলভক্তিতে তাঁহাকে লাভ করিয়াছ, তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।"

যযাতি আনন্দে অধীর হইয়া বালককে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্বর্ণাঙ্গদ, হীরকবলয় প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া কুশধ্বজকে রাণীগণের অনুরোধক্রমে রাজ-অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। রাণীগণ নিজেরা তাহাকে উৎকৃষ্ট আহার্য্যদ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং দক্ষিণাস্বরূপ বহুমূল্য বিবিধ বসন-ভূষণ উপহার দিলেন। সেই প্রিয়দর্শন বালককে লইয়া তাঁহারা কত আদর দেখাইলেন ও কতরূপ স্নিগ্ধ কথা দ্বারা তাহার মনোরঞ্জন করিলেন।

উত্তরে কুশধ্বজ বলিলেন, "তোমাদের এত মমতা! আমাকে যখন অগ্নিকুণ্ডের নিকট লইয়া যায়, তখন এ মমতা কোথায় ছিল! মা, তোমাদের দোষ নাই, বুঝিয়াছি জগতের পিতা ও মাতা প্রসন্ন না হইলে পৃথিবীর পিতামাতারাও কোলে লন না! বন্ধুবান্ধবসত্ত্বেও আমি আজ অনাথ হইয়াছিলাম, এবং তাঁহাদের প্রসাদ লাভ করিয়া এখন গৃহ ছাড়িয়াও এখানে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে মাতৃক্রোড় লাভ করিয়াছি।"

রাজসভায় কুশধ্বজ পুনরায় আসিল। যযাতি বলিলেন, "তুমি যদি আমার রাজপ্রাসাদে বাস কর, তবে আমি অপত্যস্নেহে তোমায় পালন করিব। তোমার প্রসাদে আমার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, অথচ ব্রহ্মহত্যার পাতক আমায় স্পর্শ করে নাই।"

কুশধ্বজ বলিল, "আমার জননী পাগলিনী হইয়া আছেন, তাঁকে

যে পর্য্যন্ত পুনরায় না দেখিব, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিব না।"

পুনরায় সুমন্ত্র রাজরথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই রথে রাজ ঐশ্বর্য্যের একাংশ ব্রাহ্মণ-বালকের উপহার স্বরূপ রক্ষিত হইল। বামদেব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের পদ-বন্দনা করিয়া কুশধ্বজ মন্ত্রীর সহিত রথে আরোহণ করিল। চতুরশ্ববাহিত রথ ঘর্ঘর-শব্দে পুনরায় সেই পথেই চলিল। আসিবার সময় কুশধ্বজ দেখে নাই এখন দেখিল, রথ সরযূর দক্ষিণপূর্ব্বে রাজমহেন্দ্রী পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া চলিয়াছে; বিশাল কষ্টি-পাথরের শৃঙ্গ অভ্র-ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। নিম্নে শ্যামায়মান উপত্যকায় হরীতকী, গুবাক ও লোধ্রবৃক্ষের পংক্তি নভোপটে অঙ্কিত সুচারুচিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালকের মনে হইল সেই সুশ্যাম প্রকৃতির মধ্যে বিষ্ণুর দেহপ্রভা ঝল্‌মল্ করিতেছে। রথের ঘর্ঘর-শব্দে তুরঙ্গশাবক উল্লম্ফন করিয়া বনান্তরে ছুটিল। বালক 'ঐ যায়' বলিয়া সুমন্ত্রকে শাবকটা দেখাইল। মন্ত্রী বলিলেন, "ঐ শাবকটি ধরাইয়া দিব? তুমি পাইলে সুখী হইবে?"

স্মিতমুখে কুশধ্বজ বলিল, "আচ্ছা দিন্, আমি ওটি পাইলে সর্ব্বদা উহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইব।" কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাহার সাশ্রুচক্ষু হইল। সে বলিয়া উঠিল, "না মন্ত্রী মহাশয়, থাক্ থাক্, ওকে মায়ের কোল হইতে আনিবেন না।"

রথ তীরে ঘুরিতে ঘুরিতে চলিল। কুশধ্বজ দেখিল, উত্তাল সফেন তরঙ্গে সজোরে তটদেশে আঘাত ও কচিৎ তাহা ভগ্ন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ধবলেশ্বরী ছুটিয়াছে! জলরাশি কর্পূর-স্রোতের ন্যায়, দূর হইতে মনে হইল যেন একখানি সুদীর্ঘ স্ফটিক-শয্যা প্রসারিত রহিয়াছে। উপরে

ডাহুক পক্ষী ঘুরিয়াঁ ঘুরিয়া ডাকিতেছে। তাহার আসিবার সময় সে একটা ডাহুককে কুলায়ের পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়াছিল ; এটিকে দেখিয়া সেইটীকে মনে পড়িল, এবং মাতার জন্য তাহার উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল।

৬

রথ আবার সেই পল্লীতে আসিল। তখন সেইদিনের মত অপরাহ্ন— সেই খেলার মাঠ। জনা, অজু, লখা সেই মাঠের একপ্রান্তে বসিয়া আছে। তাহারা খেলার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু সাথা না পাইয়া খেলিতে পারে নাই। কুশধ্বজের চক্ষু তাহাদের মধ্যে তাহার ভ্রাতৃদ্বয়কে খুঁজিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। রথের ঘর্ঘর-শব্দে চমৎকৃত হইয়া বালকত্রয় উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং জনার্দ্দন গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল, "হারে, ওই ত আমাদের কুশে নয় ?"

রথ আরও নিকটে আসিল, তখন তাহারা সকলেই কুশধ্বজকে দেখিতে পাইল। রথ গ্রাম্যপথে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুলোক সংবাদ পাইয়া সেইখানে জড় হইল। একজন বলিল, বোধ হয় ভয় পাইয়া পালাইয়া আসিয়াছিল, তাই মন্ত্রী পুনরায় ধরিয়া ল য়া চলিয়াছে।" আর একজন বলিল, "ধর্ম্মে সহিবে কেন ? বোধ হয় সেই অপরাধে সিদ্ধান্তেরও কিছু সাজা হইয়া যাইতে পারে।" একজন বলিল, "বোধ হয় রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে, যজ্ঞ পূর্ণ হইতে পারে নাই।" এইরূপে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল ; অথচ কেহ নিশ্চিতরূপে কিছু বুঝিতে পারিল না।

এক বুড়ী বলিল, “বাপু, তোমরা জান না। আমি ঠিক জানি, ভগবান অনাথ দেখিয়া ব্রাহ্মণ-বালককে রক্ষা করিয়াছেন, যার পিতা নাই, তার পিতা তিনি।”

সিদ্ধান্তের বাড়ীতে তিন দিন কেহ পদার্পণ করে নাই। তাহার অরক্ষিত গৃহে বিপুল অর্থ; দস্যুতস্করেরা তাহা জানিয়াছে, কিন্তু ছেলের প্রাণের বিনিময়ে যে টাকা পিতা নিয়াছে, সে অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাদের হস্তও কলঙ্কিত হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারাও সেই বাড়ীর আঙ্গিনায় যায় নাই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই তিন দিন, তিন রাত্রি ঘুমায় নাই। স্বর্ণমুদ্রা সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। এক একবার অনুতাপ হইতেছে, আর বার সেই অর্থ দ্বারা কল্পনায় হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সোপানারোহন করিতেছে; অদূরে মুক্ত আঙ্গিনায় মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা-লাভ করিয়া কুশধ্বজের মাতা আর্ত্তকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন; গভীর অরণ্যে বিদীর্ণ-তন্ত্রী বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় সে ধ্বনি রহিয়া রহিয়া করুণ ভাবে বাজিয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে।

এমন সময় ঘর্ঘর-শব্দে রাজরথ কুটীরের পার্শ্বে আসিয়া থামিয়া গেল। সিদ্ধান্ত চাহিয়া দেখিল রথে কুশধ্বজ ও মন্ত্রী। সে নিশ্চয় বুঝিল, কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে, হয়ত তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, এবং সমস্ত অর্থ বল-পূর্ব্বক মন্ত্রী পুনরায় লইয়া যাইবেন। তখন তিলমাত্র গৌণ না করিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইয়া কুটীরে এক কোণ আশ্রয়পূর্ব্বক লুকাইয়া রহিল।

কিন্তু তিনদিনের উপবাসী জননী যখন সেই ঘর্ঘর-শব্দ শুনিলে তখন উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া কুশধ্বজকে উভয় বাহু প্রসারণপূর্ব্বক

ধরিতে গেলেন; কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

কুশধ্বজ 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া স্বীয় বাহুদ্বারা মাতাকে জড়াইয়া ধরিল; তাহার দুই ভ্রাতা স্নেহসাগরে অভিষিক্ত হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। জননী চৈতন্যলাভ করিয়া যেন হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অঞ্চলে বাঁধিতে গেলেন। স্বীয় ছিন্নবস্ত্রে কুশধ্বজকে ঢাকিয়া রাখিলেন, যেন পুনঃ কেহ না লইয়া যায়।

এই আনন্দ-মিলনে, কুশধ্বজ কেন ফিরিয়া আসিল, কি ভাবে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইল তাহা তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন।

কিন্তু সিদ্ধান্ত এই আনন্দের অংশ-ভাগী হইতে সাহসী হইল না। সে কুটীরের এক কোণ হইতে ভীতনয়নে তাহাদের মিলন-চিত্র দেখিতে লাগিল। এই আনন্দ কোন ভয়ঙ্কর নিরানন্দে পরিণত হইবে, এই বৃথা আশঙ্কায় তাহার অন্তঃকরণ গুর্‌গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু কুশধ্বজ "বাবা কোথায়" বলিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল, এবং "কোন ভয় নাই" পুনঃ পুনঃ এই আশ্বাস দিয়া বেপমান বৃদ্ধকে মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত করিল। সে পিতার চরণধূলি মস্তকে লইয়া বলিল, "বাবা, নিদারুণ দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তুমি কি জন্য লজ্জা ও ভয় পাইতেছ?"

মন্ত্রী সিদ্ধান্তের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তুমি এমন ছেলের পিতা, তুমি সকলের নমস্য, তোমার গুরুতর অপরাধও ক্ষমার্হ।"

তখন গদ্‌গদকণ্ঠে সুমন্ত্র বালক-সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত সকল কথা বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ক্ষুদ্র পরিবারের সকলে বিস্মিত হইল।

এমন সময় জনার্দ্দন ও অর্জ্জুন কুটীরে প্রবেশ করিল। তাহারা শ্রীনাথের নিকট ইহার পূর্ব্বেই সকল কথা শুনিয়াছিল।

জনা বলিল, "আমরা বুড়োর মুখ দেখিব না, মরিয়া গেলেও এ পাপ-আঙ্গিনায় পা দিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম ; কিন্তু তোর ঠাকুর-দর্শন হইয়াছে শুনিয়া তোর পিতার প্রতি রাগ রাখিতে পারিলাম না। উহার নিশ্চয়ই কোনকালে পুণ্যবল ছিল, নতুবা কি ভাগ্যে তোর মত পুত্রলাভ করে ? তুই আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও পূজনীয়। আয় ভাই, তোকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ জুড়াই।"

অর্জ্জুন বলিল, "তোরা টের পাইতেছিস না, উহার গায়ে কি সুন্দর গন্ধ। এমন সুন্দর গন্ধ কোথা হইতে আসিল !"

কুশধ্বজ বলিল, "মা লক্ষ্মী আমায় ছুঁইয়াছিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে স্বর্গ হইতে একটি পদ্মপুষ্পের মালা আমার কণ্ঠে পড়িয়াছিল, এ তারই গন্ধ।"

সিদ্ধান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া রথ হইতে ভারে ভারে বহুমূল্য উপঢৌকন কুটীরে উঠাইল, কিন্তু সুমন্ত্র যখন বিদায় লইলেন তখন বলিল,—"এ সকল রাজ-ঐশ্বর্য্য পাইলাম, কিন্তু আমার কলঙ্ক কে দূর করিবে ? যদি এ সমস্তের বিনিময়ে আমার সেই নিষ্পাপ দারিদ্র্য লাভ করিতে পারি, তবে কৃতার্থ হই। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যলোভেও আর যেন অধর্ম্ম না করি, ভগবান্ আমার সেইরূপ মতি দিও, এই প্রার্থনা।"

কুটীরের স্থলে বিপুল হর্ম্ম্য উঠিল, সেই ক্ষুদ্র তরুমণ্ডপাবৃত দীনধাম, বহু পরিচারক-পরিচারিকাবৃত বিশাল প্রাসাদে পরিণত হইল।

কুশধ্বজের বিবাহের সময় রাজাধিরাজ সূর্য্যবংশাবতংস যযাতি তিন দিন সেই প্রাসাদের এক কক্ষে বাস করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-এর

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কয়েকখানি ভক্তিমূলক আখ্যায়িকা

মুক্তা চুরি	রাগরঙ্গ
শ্যামলীখোঁজা	রাখালের রাজগী
কানুপরিবাদ	সুবল-সখার কাণ্ড

"এই আখ্যায়িকার সুর এত উচ্চপদের ও স্বাভাবিক যে বাঙালী স্ত্রীলোক ও পুরুষমাত্রেরই পাঠ করা উচিত।... ইহা পাঠককে উন্নত ও উজ্জ্বল জগতে লইয়া যায়।"

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

"They are most original in conception, novel in method, charming in style and breathe throughout the deepest sentiments of the Vaishnava poets in their native simplicity and emotional vigour."

Dr. Benimadhab Barua

"এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি নব্য-শিক্ষিত সমাজের সগৌরব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।"

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ